জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা

কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা

মুসলিম সমাজ সংস্কারক
মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্-তামীমী (রহিমাহুমুল্লাহ)

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী

'জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা

কিতাবুত্ তাওহীদ

ও এর ব্যাখ্যা'

[তাহকীক ও তাখরীজসহ]

মূল :

মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্-তামীমী রহিমাহুল্লাহ

ব্যাখ্যাকার :

শায়খ সালেহ্ বিন আব্দুল আযীয বিন
মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়েখ

ভাষান্তর :

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয়, সৌদি আরব

সম্পাদনা :

ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

প্রকাশনায়:

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী

জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা 'কিতাবুত্ তাওহীদ' ও এর ব্যাখ্যা

Interpretation of Kitab At-Tawheed, The Destination of the Seeker of Truth

মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্-তামীমী

ব্যাখ্যাকার (আরবী) : শায়খ সালেহ্ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়েখ

ভাষান্তর (বাংলা) : মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

সম্পাদনা : ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

গ্রন্থ পরিচিতি : মামুনুর রশীদ, ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান, মুহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

প্রকাশক : কাজী মোহাম্মাদ সেলিম
[আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী]
বাড়ী নং : খ-৩৯, শাহজাদপুর (বাঁশতলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২।
বিক্রয় কেন্দ্র : জি-১৩৪, সুবাস্তু নজর ভ্যালী, প্রগতি সরণী,
শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
ফোন: **01817526423**।

পরিবেশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২

প্রকাশকাল : রমাযান ১৪৩০ হিজরী, আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী

গ্রন্থস্বত্ব © : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বিনিময় : ২৪০ (দুইশ' চল্লিশ টাকা মাত্র)।

ISBN : 978-984-8766-02-6

INTERPRETATION OF KITAB AT-TAWHEED
THE DESTINATION OF THE SEEKER OF TRUTH

Written by (in Arabic): Sheikh Sulaiman At-Tameemy ***Explained by (in Arabic):*** Sheikh Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibraheem Aali-Sheikh ***Translated by (into Bengali):*** Muhammad Abdur Rabb Affan ***Editted by :*** Engr. Muhammad Hassan ***Published by:*** **An-Nur Islamic Library**, Kha-39, Shahjadpur (Bashtola), Gulshan, Dhaka-1212. Phone : **+88-01817526423**
Website: www.annurlibrary.com; **E-mail:** an_nur_library@yahoo.com

Price : 200 Taka / US $ 7 / UK 4 Pounds.

প্রকাশকের কথা

তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তি। আর এ ভিত্তি যদি স্বীয় হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে আক্বীদা ও ইবাদতসহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক সার্বিক জীবনব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত হবে। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এ তাওহীদের সূর্য উদয় হয় আরব মরুভূমিতে লাত, মানাত ও হুবলসহ সমস্ত পৌত্তলিকতার অন্তিম সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে। যার ফলে শির্ক, কুফর, গোমরাহী, বিদ'আত, কুসংস্কার ও যাবতীয় পাপাচারের ক্ষেত্রসমূহ বিরানে পরিণত হয়। এ সবের স্থান দখল করে ঈমান-ইয়াকীন ও তাওহীদ। যার ফলে ইসলাম স্বীয় শক্তি বিস্তার করে বিশ্বে জনপ্রিয়তা ও সার্বজনীনতা লাভ করে।

তাওহীদ হল বিশ্বজগতের প্রতি সমস্ত নবী ও রাসূলের ছেড়ে যাওয়া অমূল্য আমানত। যা খতমে নবুওয়্যাতের বরকতে মুসলিম উম্মাহ্‌র হৃদয়ে স্থান দখল করার ফলে উম্মাত ইলম, আমল, ইখলাস ও তাকওয়ার পোশাকে সুশোভিত হয়।

পুনরায় যখন ইউনানী-গ্রীক বাতিল চিন্তা ধারার সাইক্লোন প্রবাহিত হয় এবং উম্মত ধাবিত হয় জাহান্নামের দিকে। আরব জাহানে আরব জাতীয়তাবাদ মাথা জাগালে আল্লাহ তা'আলা চেঙ্গিসের আকৃতিতে আযাব পাঠিয়ে দেন। এমতাবস্থায় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহি.)-এর তাওহীদী কলম গর্জে ওঠে, তাওহীদের নিশান বুলন্দ হয় ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পায়। পুনরায় আরব ও অনারবে শির্ক ও বিদ'আতের সাইক্লোন শুরু হলে ১২শ' হিজরীতে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্-তামীমী (রাহি.)-কে প্রেরণ করেন। যার ইলম ও 'আমলের নিরলস কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টায় নজদ ও হিজাজে তাওহীদী মতবাদ পূর্ণ এক খালেস শরীয়তী জীবন ব্যবস্থা জন্ম নেয়। শিরকের ঘনঘটা তাওহীদের আলোতে রূপান্তরিত হয়। কবর, দরগাহ, আস্তানা পূজারীদের মূর্তি ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। মাখলুক পরাস্তী ও মাজার পরাস্তীদের দম বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্দিকে তাওহীদের ডঙ্কা বেজে ওঠে ও শির্ক বিদ'আত পন্থীরা প্রকম্পিত হয়ে যায়। আর এ বিপ্লবী সংস্কারক শায়খ সুলাইমান আত্-তামীমী (রাহি.)-এর একটি মাত্র গ্রন্থেরই কৃতিত্বে। সে গ্রন্থটিই হল *'কিতাবুত তাওহীদ'*। আর এ *'কিতাবুত তাওহীদ'* হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসেরই খালেস নিচড় ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। এ অমূল্য অসাধারণ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা হল বক্ষমান গ্রন্থ *'গায়াতুল মুরীদ ফী শারহে কিতাবিত্ তাওহীদ'* গ্রন্থটি সংকলন করেন সৌদি আরবের বর্তমান ধর্মমন্ত্রী শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে-শায়েখ।

আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না যে তার সাথে শির্ক করে। আর তিনি এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (সূরা নিসা: ৪৮) কুরআনের এ বিশেষ আয়াতটি আমাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। তা ছাড়া, তাওহীদ মানুষের উপর সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় ফরয। ইহ-পরকালীন মুক্তি তাওহীদের বাস্তবায়নের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাওহীদের জ্ঞান না থাকলে কোন জ্ঞানই পরিপূর্ণ নয়। তাওহীদ বিহীন কোন আমলও গ্রহণীয় নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব।' (সূরা ফুরক্বান: ২৩) অতএব, একজন মানুষের ঈমান, সারা জীবনের 'আমল যদি শির্কী কর্মকাণ্ডের কারণে বিফল হয়, তাহলে আমাদের উচিত আগে শির্ক সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়া। এ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা আমাদের প্রথম প্রকাশনা *'তাওহীদের কিশতী'* বইটি প্রকাশ করি। বইটির

আশাতীত গ্রহণযোগ্যতায় ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হই এবং তাওহীদ ও শির্ক বিষয়ক বইসমূহকে বাংলাভাষায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশ ও প্রচারের কাজে দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা তাওহীদের উপর সবচেয়ে মূল্যবান বই ***'জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা'*** প্রকাশ করলাম। তবে, এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ বইটি প্রথমে *'দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, রিয়াদ, সৌদি আরব'* থেকে বাংলাভাষায় প্রকাশ হয়েছিল। পরবর্তীতে এ বইটির সম্মানিত অনুবাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান-এর নিকট থেকে অনুমতির মাধ্যমে পুনরায় কিছু জরুরী সম্পাদনা ও আরো তথ্য সমৃদ্ধ করে বাংলাদেশ থেকে ছাপানো হল। ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য জগতের সমৃদ্ধিতে এ বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে এমন প্রচুর নামকরা ইসলামী বই প্রকাশনী রয়েছে, যাদের প্রকাশিত অসংখ্য বই মার্কেটে ভরপুর কিন্তু তাওহীদ ও শির্ক-এর মতো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বই প্রকাশে তাদের মধ্যে অবহেলা, অজ্ঞতা, কাপুরুষতা এবং দীনতা উল্লেখ করার মতো। ফলে, এ কাজের মাধ্যমে তারা পাঠকদেরকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করছেন সঠিক ঈমানী জ্ঞানের গ্রন্থসমূহ থেকে। তা ছাড়া, যেসব বই তারা তাদের তথাকথিত প্রকাশনী থেকে একাধারে প্রকাশ করে চলেছেন, সেসব বইগুলোতে কুরআন-হাদীস থেকে সঠিক উদ্ধৃতি, দলীল বা তথ্যসমূহের বিশুদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধটুকু করেন না।

তবে আশার কথা হচ্ছে, হাতেগোনা কয়েকটি প্রকাশনা আছে যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাওহীদ ও শির্ক বিষয়ক গ্রন্থসমূকে সত্যানুসন্ধানী পাঠকদের খুব কাছাকাছি আনার জন্য প্রচেষ্টায় রত রয়েছে। তাওহীদ ও শির্ক বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করতে পাঠক-পাঠিকাদেরকে তথ্য প্রদানের জন্য, ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশনীগুলো যেন একে অপরের বিশুদ্ধ ও ভালো বইসমূহকে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে যেন নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়, সে উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত তাওহীদ ও শির্ক বিষয়ক বইগুলোকে *'বই পরিচিতি'* অংশে সংযোজন করেছি। এর ফলে ইনশাআল্লাহ, পাঠক হবেন বিশেষভাবে উপকৃত আর আমাদের সকলের উদ্দেশ্য থাকবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আল্লাহ আমার জীবনে চমৎকার এক মা দিয়েছেন। আমি যেন সব সময় তার মুখে হাসি ফোটাতে পারি। আর তার ঋণ তো শোধ হবার নয়। আল্লাহ আমার আব্বার প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং কবর ও পরকালের জীবনে সম্মানিত করুন।

মূল লেখক, ব্যাখ্যাকার, অনুবাদক ও সম্পাদক সহ এ প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা আমাদের সকলের সৎশ্রমের বিনিময়ে দুনিয়াতে ও আখিরাতে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং এটাকে নাযাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন!

মহান আল্লাহ তা'আলার নিকটে সকাতরে দু'আ করছি, তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার শির্ক যুক্ত আক্বীদা ও 'আমল থেকে রক্ষা করুন, বিশুদ্ধ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং ইখলাসের সাথে একমাত্র তাঁর ইবাদাত করে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

বিনীত,

কাজী মোহাম্মদ সেলিম

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা সমস্ত জগতের অধিপতি একক-অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবী ও রাসূলের ইমাম, আমাদের নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি এ তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাদের প্রতি, যারা এ তাওহীদকে বাস্তবায়ন ও এর উপর অটল থাকার ক্ষেত্রে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করেছেন।

শায়খ সুলাইমান আত্-তামীমী (রাহি.)-এর বহুল প্রসিদ্ধ তাওহীদের উপর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত *'কিতাবুত্ তাওহীদ'* নামক গ্রন্থটির এ পর্যন্ত অর্ধ ডজনের অধিক শরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ যে ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তা হল, বর্তমান সৌদি সরকারের মাননীয় ধর্মমন্ত্রী 'আল্লামা শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে-শায়েখ প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ *'গায়াতুল মুরীদ ফি শারহে কিতাবিত তাওহীদ'*। যার বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে *'জ্ঞান পিয়াসুর আকাঙ্ক্ষা কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখা'*, যদিও ইতিপূর্বে এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটির অন্যান্য জীবন্ত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় কিছু বিলম্বে হলেও আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নানা প্রতিকুলতার বাঁধ ভেঙ্গে আলোর পরশ পেল, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় পাঠক! তাওহীদ বা আল্লাহকে একক স্বীকৃতি ও যাবতীয় শির্ক থেকে মুক্ত হওয়াই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অথচ বর্তমান সমাজ এ বিষয়টি সম্পর্কে সর্বাধিক উদাসীন। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন মহাগ্রন্থাদী আর তাওহীদপন্থী-একত্ববাদীদের জন্যই তৈরী করেন জান্নাত ও এর পরিপন্থীদের জন্য তৈরি করেন জাহান্নাম। তাই তো প্রত্যেক নবী-রাসূলের জীবন চরিতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁরা অন্য যে কোন ইবাদত, আমল ও কর্মসূচীর পূর্বে তাওহীদকে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জীবন দিয়েছেন ও বিপর্যস্ত হয়েছেন কিন্তু তাওহীদের পরীপন্থী শিরকের সাথে কখনোই আপোস করেননি। তাই আজও প্রত্যেক অরাসাতুল আম্বিয়া-নবীদের উত্তরসূরী আলেম-ইমাম, খতীব, বক্তা, সংস্থা, সংগঠন, জামাত ও দলের অপরিহার্য দায়িত্ব হল প্রচার ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে তাওহীদকে অগ্রাধিকার ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।

শায়খ সুলাইমান আত্-তামীমী (রাহি.) এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিছক কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীনের আকীদার আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর *'কিতাবুত্ তাওহীদ'* এ আলোকপাত করেছেন। আর উক্ত কিতাবের অন্যান্য বহু মনীষীর ন্যায় শায়েখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে শায়েখ (হাফিজাহুল্লাহ) অতিপ্রাঞ্জল, বোধগম্য ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এ সাধারণ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি বাংলায় ভাষায় প্রকাশ লাভ করায় আমি আল্লাহর নিকট জানাই অসংখ্য সিজদায়ে শুকুর। যারা এর পেছনে শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ যেন সবার শ্রমকে কবূল করেন ও এটাকে আমাদের নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিনীত,

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

সম্পাদকের কথা

ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে অনেক সময় 'তাওহীদ' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমুত তাওহীদ' বা 'তাওহীদের জ্ঞান' বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (রাহি.) 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে 'ইলমুল আক্বীদা'-কে 'ইলমুল তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন। মূলত, তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বই ইসলামী ঈমান বা আক্বীদার মূল ভিত্তি। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদের সাথে জড়িত তাওহীদের অংশ। এ জন্যই ইমাম আবু হানীফা (রাহি.) 'ইলমুল আক্বীদা' বুঝাতে 'ইলমুত তাওহীদ' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটি হিজরি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এ নামে আক্বীদা বিষয়ক কিছু গ্রন্থ রচনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি.) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ' এবং অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু রাজাব হাম্বালী (৭৯৫ হি.) রচিত 'কিতাবুত তাওহীদ'।

এ ধারাবাহিকতারই এক বলিষ্ঠ সংযোজন হচ্ছে হিজরী ১২শ' শতাব্দিতে শায়খ সুলায়মান আত্-তামীমী কর্তৃক রচিত *'কিতাবুত তাওহীদ'* নামক এ বইটি। ঈমান ও আক্বীদা একজন মু'মিন বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমান ও আক্বীদার দ্বারাই একজন মু'মিনের আচার-আচরণ, 'আমাল ও আখলাক নিয়ন্ত্রিত হয়। শির্‌ক মিশ্রিত যে-কোন 'আমাল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। তাই বান্দার ওপর সর্বপ্রথম অপরিহার্য বিষয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা এবং নিজের ঈমান, আক্বীদা ও যাবতীয় 'আমালকে শির্‌কমুক্ত রাখা, যাতে তার কোন 'আমাল বরবাদ না হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নাবী!) আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।' [সূরা মুহাম্মাদ (৪৭): ১৯], 'এবং 'আর আমি তাদের আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব।' [সূরা ফুরক্বান (২৫): ২৩] তাই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রতিটি নাবী বা রাসূল সর্বপ্রথম এ তাওহীদের দিকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পর্কে খুব কমই গুরুত্বারোপ করা হয়। এমনকি ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় এ বিষয়ে তেমন লেখালেখিও হয় না। ফলে, তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে তাওহীদ পরিপন্থী বিষয় তথা শির্‌ক আমাদের মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। আর শির্‌ক এমনই ভয়াবহ ও জঘন্যতম পাপ যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য। শিরকের ব্যাপারে মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নাবী!) আপনি যদি শির্‌ক করেন, তবে আপনার 'আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' [সূরা যুমার (৩৯): ৬৫] ও [সূরা আন'আম (৬): ৮৮] আর শির্‌ক থেকে নিজেকে ও অন্যান্য বাঙালি মুসলিম ভাইকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সম্পাদনা, তাহকীক ও পরিমার্জন করার চেষ্টা করেছি এবং বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিসগণের গবেষণাকৃত পুস্তকের সহায়তায় দুর্বল [যঈফ] হাদীসগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এ গ্রন্থটি ইতোপূর্বে তাহকীক করা ছিল না। তদুপরি, সচেতন পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে কোনপ্রকার ভুল পরিলক্ষিত হলে এবং সে সম্পর্কে আমাদেরকে জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশারাখি।

বিনীত,

ইঞ্জি. মুহাম্মাদ হাছান

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
❖	প্রকাশকের কথা	০৩
❖	অনুবাদকের কথা	০৫
❖	সম্পাদকের কথা	০৬
❖	ভূমিকা	১১
❖	তাওহীদ সমস্ত 'ইবাদতের মূল	১৩
১.	তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়	১৯
২.	যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে	২৪
৩.	শির্ক্ সম্পর্কীয় ভীতি	২৯
৪.	*'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহ্বান	৩৩
৫.	তাওহীদ এবং *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*-এর সাক্ষ্য বাণীর ব্যাখ্যা	৩৮
৬.	বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সূতা] ইত্যাদি পরিধান করা শির্ক	৪১
৭.	ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয-কবচ প্রসঙ্গে	৪৬
৮.	যে ব্যক্তি কোন গাছ, পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়	৫০
৯.	আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা	৫৬
১০.	যেখানে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে বা উদ্দেশ্যে [পশু] জবাই করা হয়, সেখানে আল্লাহ্র নামে [পশু] জবাই করা বৈধ নয়	৬২
১১.	আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোর উদ্দেশ্যে মানত করা শির্ক	৬৫
১২.	আল্লাহ ব্যতীত গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শির্ক	৬৭
১৩.	আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া অথবা দু'আ করা শির্ক	৬৯
১৪.	অক্ষমকে আহ্বান করা শির্ক	৭৪

১৫.	ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী অবতরণের ভীতি	৭৮
১৬.	শাফায়াত [সুপারিশ]	৮২
১৭.	হিদায়াত দানকারী একমাত্র আল্লাহ	৮৮
১৮.	নেককার পীর-বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ	৯২
১৯.	নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?	৯৮
২০.	নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে	১০৪
২১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় এবং শিরকের সকল পথ বন্ধ করতে একান্তই তৎপর ছিলেন	১০৭
২২.	মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পূজা করবে	১১০
২৩.	যাদু	১১৬
২৪.	যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়	১২০
২৫.	গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তা	১২৩
২৬.	নুশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা	১২৬
২৭.	অশুভ আলামত সম্পর্কীয় বিবরণ	১২৮
২৮.	জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান	১৩২
২৯.	নক্ষত্রের উসীলায় বৃষ্টি কামনা করা	১৩৪
৩০.	আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা দ্বীনের স্তম্ভ	১৩৭
৩১.	ভয়-ভীতি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য	১৪১
৩২.	একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা	১৪৪
৩৩.	আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়	১৪৭
৩৪.	তাকদীরের [ফায়সালার] উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ	১৪৯
৩৫.	রিয়া [প্রদর্শনেচ্ছা] প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান	১৫২

৩৬.	নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শির্ক	১৫৫
৩৭.	যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করল...রব্ব হিসেবে গ্রহণ করল...	১৫৮
৩৮.	ঈমানের দাবীদার কতিপয় লোকের অবস্থা	১৬১
৩৯.	আল্লাহ্‌র 'আসমা ও সিফাত' অস্বীকারকারীর পরিণাম	১৬৫
৪০.	আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম	১৬৭
৪১.	শিরকের কতিপয় গোপনীয় অবস্থা	১৬৯
৪২.	আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম	১৭২
৪৩.	আল্লাহ্ এবং আপনি যা চেয়েছেন বলার হুকুম	১৭৩
৪৪.	যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়	১৭৬
৪৫.	কাযীউল কুযাত [মহা বিচারক, প্রভৃতি] নামকরণ প্রসঙ্গ	১৭৮
৪৬.	আল্লাহ্‌র নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্মানার্থে [শির্কী] নামের পবির্তন করা	১৮০
৪৭.	আল্লাহ্, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করা	১৮২
৪৮.	আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের নাশোকরী করা অহংকারের আলামতও অনেক বড় অপরাধ	১৮৪
৪৯.	সন্তানাদি পাওয়ার পর আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করা	১৮৯
৫০.	আল্লাহ তা'আলার আসমাউল হুসনা [সুন্দরতম নামসমূহ]	১৯২
৫১.	'আসসালামু আলাল্লাহি' [আল্লাহ্‌র উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলা যাবে না।	১৯৪
৫২.	"হে আল্লাহ্ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ কর।" প্রসঙ্গে	১৯৬
৫৩.	আমার দাস-দাসী বলা যাবে না	১৯৮
৫৪.	আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা	২০০
৫৫.	'বি ওয়াজহিল্লাহ্' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না	২০২

৫৬.	বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা	২০৩
৫৭.	বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ	২০৫
৫৮.	আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা সম্পর্কে খারাপ ধারণার নিষিদ্ধতা	২০৬
৫৯.	তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিচিতি	২০৯
৬০.	ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম	২১৩
৬১.	অধিক কসম খাওয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান	২১৬
৬২.	আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিষয়	২১৯
৬৩.	আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি	২২২
৬৪.	আল্লাহ্র মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির নিকট সুপারিশ কামনা হারাম	২২৪
৬৫.	রাসূল ﷺ কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন	২২৬
৬৬.	আল্লাহ্ তা'আলার মহানত্ব এবং উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা	২২৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

তাওহীদপন্থী আলেমগণ এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, ইসলামে এ কিতাবুত তাওহীদ-এর মতো আর কোন গ্রন্থ এ বিষয়ে রচিত হয়নি। এটি একটি দাওয়াতী (প্রচারের) গ্রন্থ। তাওহীদের পথের আহ্বায়ক। কারণ শায়খ (রহামাতুল্লাহি আলাইহি) এতে তাওহীদের মূল প্রমাণপঞ্জী বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের অর্থ ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের বিপরীতে কী এবং তার ভয়াবহতা কেমন তা বর্ণনা করেছেন। তাওহীদে এবাদত এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ব)-এর মৌলিক নীতিমালা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে বড় শির্ক ও সবচেয়ে ছোট শিরকের বর্ণনা এবং সেগুলোর কিছু চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটির উপায় ও মাধ্যম বর্ণনা করেছেন তাওহীদের সংরক্ষণ এবং কিভাবে তা সম্পন্ন হয় তা বর্ণনা করেছেন। তাওহীদে রুবূবিয়্যার প্রকারও কিছুটা বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি (কিতাবুত তাওহীদ) অত্যন্ত মহান একটি গ্রন্থ। তাই আপনি এটি মুখস্ত, অধ্যায়ন ও অনুধাবন করলে তা হবে একটি মহৎ কাজ। কারণ, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার এটি দরকার হবে।

কিতাবুত্ তাওহীদ: তাওহীদ হচ্ছে কোন জিনিসকে এক বলে সাব্যস্ত করা। মুসলিমগণ আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, উপাস্যকে তারা এক বলে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি হচ্ছেন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ। আল্লাহর গ্রন্থে (কুরআনে) কাঙ্ক্ষিত তাওহীদ তিন প্রকার- তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ, তাওহীদে উলুহিয়্যাহ ও তাওহীদে আস্মা ওয়াসসিফাত।

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহর অর্থ হল, আল্লাহকে তাঁর কার্যাবলীতে এক ও অদ্বিতীয় বলে সাব্যস্ত করা। আল্লাহর কর্মসমূহ অসংখ্য। তন্মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি করা, জীবিকা দেয়া, জীবিত করা, মৃত্যুদান করা। পরিপূর্ণতার সাথে এগুলোর একচ্ছত্র অধিপতি হলেন মহান আল্লাহ। তাওহীদে উলুমিয়্যাহ্ বা ইলাহিয়্যাহ (শব্দ দুটি أَلَهَ يَأْلَهُ) ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল বা মাছদার। এর অর্থ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে ইবাদত বা উপাসনা করা; এটি হল বান্দার কার্যাবলীতে আল্লাহকে এক বলে সাব্যস্ত করা। তৃতীয় প্রকার তাওহীদ হচ্ছে, তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত। এর অর্থ, বান্দার এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহামহিম আল্লাহ্ তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীতে একক সত্তা, এ দু'টিতে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই।

শায়খ সুলায়মান আত্-তামীমী (রাহি.) এ গ্রন্থে তাওহীদের তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন। যে সকল বিষয় মানুষের জন্য অতীব জরুরী এবং যে সকল বিষয়ে তারা কোন বই-পুস্তক পায় না সে সকল বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য যেমন, তাওহীদে উলুহিয়্যাহ এবং ইবাদত; তিনি এর প্রকারসমূহ বর্ণনা করেছেন। যথা- তাওয়াক্কুল বা ভরসা, ভয়-ভীতি, ভালবাসা...। এটির বিশদ বিবরণ দানের সময় তার বিপরীত বিষয় শিরকেরও বর্ণনা দিয়েছেন। শির্ক হচ্ছে, মহাপরাক্রমশালী মহীয়ান আল্লাহর সাথে তাঁর প্রভূত্বে অথবা ইবাদত বন্দেগীতে অথবা নামসমূহ ও গুণাবলীতে অংশীদার সাব্যস্ত করা।[1]

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণীত হয়েছে, এক বিবেচনায় শির্ক দু'ভাগে বিভক্ত: শিরকে আকবার বা সবচেয়ে বড় শির্ক ও শিরকে আসগার বা সবচেয়ে ছোট শির্ক। আবার এক বিবেচনায় শির্ক তিন প্রকার: (১) শিরকে আকবার (২) শিরকে আসগার ও (৩) শিরকে খাফী বা গুপ্ত শির্ক। শিরকে আকবার ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়। এটি হচ্ছে, আল্লাহ্র সাথে অন্য কারো ইবাদত করা অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য ইবাদতের কিছুটা হলেও সম্পন্ন করা, অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করা। শিরকে আসগার সেটিই যেটা শরীয়তদাতার বিচারে শির্ক বলে গণ্য, তবে এটি শিরকে আকবারের একটি হচ্ছে প্রকাশ্যে, যেমন- মূর্তিপূজকদের শির্ক, কবর ও মৃতদের পূজাকারীদের শির্ক। অপরটি হচ্ছে গোপন যেমন, মুনাফিকদের (কপটদের) অথবা গুরু, পীর, ফকীরদের অথবা মৃতদের অথবা বিভিন্ন উপাস্যের উপর নির্ভরকারীদের শির্ক। এদের শির্কটি গুপ্ত কিন্তু বড়। তবে এটি দৃশ্যত বড় নয়, গোপনেই বড়। শিরকে আসগার যেমন- বালা, সুতা ও তাবীয ব্যবহার করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা। শিরকে খাফী বা গুপ্ত শির্ক হচ্ছে সুক্ষ্ম রিয়াকারী বা দর্শনের ইচ্ছা প্রভৃতি।

---

[1] এ গ্রন্থে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে তাঁর ইবাদত বন্দেগীতে অংশীদার স্থাপন করতে নিষেধ করা এবং তাঁর একত্বের নির্দেশ দেয়া।

তাওহীদ সমস্ত ইবাদতের মূল

মহান আল্লাহ্‌র বাণী,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦)

'আর আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[1]

(সূরা আয্‌যারিয়াত: ৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ٣٦)

'আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ মর্মে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং 'তাগুত' থেকে দূরে থাক।"[2]

(সূরা আন্-নাহ্‌ল: ৩৬)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء: ٢٣)

'আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।"[1] [সূরা আল-ইসরা: ২৩]

---

[1] আল্লাহ্‌র এ বাণীর মর্ম হল: আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। তা হচ্ছে, তারা আমার ইবাদত উপাসনা করবে এ আয়াতে তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে। এর যুক্তি হল: আমাদের পূর্বসূরীগণ (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ তারা কেবল আমার একত্ববাদে বিশ্বাস করবে। এ ব্যাখ্যার প্রমাণ হল: রাসূলগণ কেবল তাওহীদ ইবাদতের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। ইবাদতের উৎপত্তিগত অর্থ হল, বিনয়-নম্রতা। এর সাথে ভালবাসা ও আনুগত্য যুক্ত হলে তা হবে শারয়ী ইবাদত। শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের অর্থ হল: ভালোবাসা, আশা ও ভীতির সমন্বয়ে আদেশ ও নিষেধ মেনে চল। শায়খুল ইসলাম বলেছেন, ইবাদত এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকার ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ। অতএব এ আয়াতের মর্ম হবে সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হওয়া ওয়াজিব; অন্য কারো জন্য নয়।

[2] এ আয়াতটি ইবাদত ও তাওহীদের অর্থের ব্যাখ্যা করছে। আরো ব্যাখ্যা করছে রাসূলগণ তাঁর দু'টি বাণীসহ প্রেরিত হয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং 'তাগুত' থেকে দূরে থাক। এটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মার্থ। اعبدوا الله এ আয়াতাংশে রয়েছে তাওহীদের স্বীকৃতি। واجتنبوا الطاغوت শিরকের অস্বীকৃতি। الطاغوت শব্দটি الطغيان-এর ওজন فعلوت থেকে উৎপন্ন। বান্দা তাঁর উপাসনা ও আনুগত্যের সীমা অতিক্রম করে যারই ধর্ণা দেয় তাকেই 'তাগুত' বলা হয়।

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (الأنعام: ١٥١-١٥٣)

'বলুন, [হে আহলে কিতাব] তোমরা এসো, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। (তা হচ্ছে) তোমরা কোন কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না।'[2] (সূরা আনআম: ১৫১-১৫৩)

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: ٣٦)

'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।'[3] (সূরা আন্-নিসা: ৩৬)

ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মোহরাঙ্কিত অসিয়ত দেখতে করতে চায়, সে যেন মহান আল্লাহর এ বাণী পড়ে নেয়,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (الأنعام: ١٥٣)

"(হে মুহাম্মদ) বলো, 'তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হচ্ছে, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না . . . আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ। অতএব, তোমরা এটি অনুসরণ কর; অন্য সকল পথের অনুসরণ কর না।"[4] (সূরা আন্-'আম: ১৫৩)

---

[1] وقضى ربك-এর অর্থ হল আদেশ করা ও উপদেশ দেয়া। ألا تعبدوا إلا إياه -এর অর্থ হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ কর, অন্যের মধ্যে নয়। এটির নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এটিই হচ্ছে (لا إله إلا الله)-এর অর্থ। আয়াতে এটি স্পষ্ট যে, তাওহীদের অর্থ হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইবাদতকে একীভূত করা অথবা (لا إله إلا الله) বাণীটি বাস্তবায়িত করা।

[2] উক্ত বাক্যটি এরূপ, 'বলুন তোমরা এসো, তোমাদের প্রভূ তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শোনাই। তিনি তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। অর্থাৎ নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে উপদেশ হল শরীয়তের দৃষ্টিতে, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শরীয়তী উপদেশ হল অপরিহার্য নির্দেশ। পূর্বের আয়াতসমূহের মতো এ আয়াতটিও তাওহীদের অর্থ বহন করে।

[3] এ আয়াতে শিরকে আকবার, শিরকে আসগার ও শিরকে খাফী-সকল শিরকের নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া কোন ফেরেশ্‌তা, নবী, নেক্‌কার, পাথর, গাছ জ্বিন প্রভৃতির সাথে আল্লাহ্‌র শরীক করার অনুমতি নেই। কারণ ওগুলি সবই ক্ষুদ্র বস্তু।

[4] ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মোহরাঙ্কিত উপদেশ প্রত্যক্ষ করতে চায় এর তাৎপর্য হল, যদি নেয়া যায় যে, তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন, এ উপদেশ নামায় সীল মোহর লাগানো হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর সেটি খোলা হয়েছে, তাহলে তা হবে এসব আয়াত যাতে দশটি উপদেশ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)-এর বর্ণনাটি শিরকের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে শুরু হওয়া এ সকল আয়াতের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত করছে। হাদীসে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার যোগ্য দাবী, প্রথম ও সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

মুয়ায বিন জাবাল (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِيْ : يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ : اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ؟ قَالَ : حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا" قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا. (صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، ح:٦٢٦٧، ٢٨٥٦ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ح:٣٠)

"আমি একটি গাধার পিঠে মহানবী (ﷺ) পেছনে (আরোহী হয়ে) বসেছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে মুয়ায! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর কি হক আছে? আর আল্লাহর উপর বান্দার কি হক আছে?' আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি (ﷺ) বললেন, 'বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, তাঁরা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই অংশীদার[1] সাব্যস্ত করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, যারা তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দেব না? তিনি (ﷺ) বললেন, 'তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে তারা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে [আল্লাহর উপর ভরসা করে] হাত গুটিয়ে বসে থাকবে [অর্থাৎ আমল বিমুখ হয়ে পড়বে]।"[2]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৬৭, ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০)

---

[1] শায়খ বলেন, মুয়ায বিন জাবাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একটি গাধার পিঠে মহানবী (ﷺ)-এর পেছনে বসেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে মুয়ায, তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর কি হক এবং আল্লাহর ওপর বান্দার কি হক? তিনি বলেন, 'বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হক হচ্ছে তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।' এ হকটি মহান আল্লাহর জন্য একটি ওয়াজিব হক। কারণ, কিতাব ও সুন্নাত (মহানবীর অনুপম জীবনলেখ্য) বরং সকল রাসূলের আগমন ঘটেছে এ হকের দাবী ও বিবরণ নিয়ে এবং এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, বান্দার ওপর সকল ওয়াজিবের মধ্যে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হল এটি।

[2] এরপর মহানবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক হল, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করে না তাকে শাস্তি না দেয়া। 'আল্লাহ্‌র ওপর বান্দার হক' হচ্ছে এমন একটি হক আলিমগণের ঐক্যমত্যে যেটি আল্লাহ্ নিজের জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা চান নিজের জন্য হারাম করেন এবং ওয়াজিব করেন। হাদীসে কুদসীতে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর যুলুম অবিচারকে হারাম করেছি।'

এ অধ্যায় থেকে যে বিষয়গুলো জানা যায়:

১. জ্বিন ও মানবজাতি সৃষ্টির রহস্য।

২. ইবাদতের মূলতত্ত্বই হচ্ছে তাওহীদ। কারণ, এটা নিয়েই (সৃষ্টির সূচনা হতে) যতসব দন্দ ও মতভেদ।

৩. যে ব্যক্তি তাওহীদপন্থী নয় তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করল না, সে ইবাদতই করল না [যার তাওহীদ ঠিক নেই, তার ইবাদতও ঠিক নেই]। এতে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র এ বাণীর তাৎপর্য- ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ (আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদত কর না।)

৪. নাবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করার অন্তর্নিহিত হিকমত বা রহস্য।

৫. প্রত্যেক জাতির নিকট নাবী-রাসূল প্রেরণের রীতি ব্যাপকভাবে জারি ছিল [অর্থাৎ সকল উম্মাতই রিসালতের আওতাধীন ছিল]।

৬. সকল নবী-রাসূলের দ্বীন-জীবন ব্যবস্থা মূলত এক ও অভিন্ন।

৭. মূল কথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত সিদ্ধ হয় না। এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা- ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ﴾ (অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনল সে দৃঢ় বন্ধনকে আঁকড়ে ধরল)।

৮. আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, সে-সব কিছুই সার্বিকভাবে তাগুত হিসেবে গণ্য।

৯. সালাফে সালেহীনদের কাছে সূরা আন্'আমের উল্লেখিত তিনটি সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াতের উচ্চ মর্যাদার কথা জানা যায়। এতে দশটি বিষয়ের কথা রয়েছে। এর প্রথমটিই হচ্ছে, শির্ক নিষিদ্ধকরণ।

১০. সূরা ইসরায় কতগুলো সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াত রয়েছে এবং এতে আঠারোটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। আর আল্লাহ বিষয়গুলোর সূচনা করেছেন তাঁর বাণী- ﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ (আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত কর না, নইলে তুমি নিন্দিত লাঞ্ছিত হয়ে বসে থাকবে।)-এর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণী- ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত

হবে।)-এর মাধ্যমে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টির সুমহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর বাণী- ﴿ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ (এটি এমন হিকমতের অন্তর্ভূক্ত যা আপনার প্রভূ আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করেছেন।)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন।

১১. সূরায়ে নিসার 'আল-হুকুকুল আশারা' [বা দশটি হক বা অধিকারের আয়াত] নামক আয়াতের কথা জানা গেল, যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন কর না।)-এর মাধ্যমে।

১২. আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)-এর অন্তিমকালের [শির্ক হতে বিরত থাকার] যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে সতর্কতা ও গুরুত্ব অবলম্বন।

১৩. আমাদের ওপর আল্লাহ্র হক সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৪. বান্দা আল্লাহ্র হক আদায় করলে সে কী হক বা অধিকার লাভ করবে তা জানা।

১৫. [মু'আয বিন জাবাল (رضي الله عنه)-এর নিকট বর্ণিত] এ বিষয়টি অধিকাংশ সাহাবীই জানাতেন না।

১৬. কোন বিশেষ কল্যাণের স্বার্থে ইল্ম (নির্দিষ্টজ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা।

১৭. মুসলমানকে আনন্দদায়ক সুসংবাদ দেয়া মুস্তাহাব।

১৮. আল্লাহ্র অপরিসীম রহমতের উপর ভরসা করে আমল বিমুখ (নিষ্ক্রিয়) হয়ে পড়ার আশংকা।

১৯. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যে বিষয়ে না জানে সে বিষয়ে اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন।) বলা।

২০. ঢালাওভাবে সকলকে ইল্ম না শিখিয়ে বিশেষভাবে কতিপয় লোককে শেখানোর বৈধতা।

২১. একই গাধার পিঠে পিছনে আরোহণকারী হিসেবে সফর সঙ্গী করার মাধ্যমে মহানবী (ﷺ)-এর দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন।

২২. একই পশুর পিঠে একাধিক ব্যক্তি আরোহণের বৈধতা।

২৩. মু'আয বিন জাবাল (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা।

২৪. আলোচিত বিষয়টি (তাওহীদের) উচ্চ মর্যাদা ও মহত্ব।

অধ্যায়-১

তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদের ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়।[1]

মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ (الأنعام: ٨٢)

'যারা ঈমান আনবে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম-এর সাথে মিশ্রিত করবে না তাঁদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।"[2] (সূরা আন্'আম : ৮২)

সাহাবী উবাদা বিন সামিত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ (صحيح البخاري،أحاديث الأنبياء، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ح:٢٨)

---

[1] 'তাওহীদের মর্যাদা এবং এর ফলে যে সকল পাপ মোচন হয়' অধ্যায় অর্থাৎ তাওহীদের দ্বারা পাপ মোচন হওয়া। বান্দা যত বেশি পরিমাণে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, ততই তার আমালের গুণে সে জান্নাতের পথে ধাবিত হবে তার আমল যাই হোক না কেন। এই কারণে ইমাম সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূরায়ে আন্-আমের আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন।

[2] আল্লাহ্র বাণী- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ 'যুলম এর অর্থ শির্ক, ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে সহীহাইনের হাদীসে এমনই রয়েছে। সাহাবীগণ এখানে এ আয়াতটিকে বিরাট বিষয় ভেবে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল আমাদের মধ্যে কে নিজের প্রতি যুলুম করেনি?' তিনি বললেন, 'তোমরা যা বুঝেছ তা নয়; যুলুম হল শির্ক। তোমরা কি নেক্কার বান্দার (লোকমানের) কথা শুনো নি ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ এক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ হবে, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের সাথে কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এটিই হচ্ছে তার ফযীলত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। এটিই হচ্ছে তার ফযীলত বা মর্যাদা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যতটুকু শিরকের মাধ্যমে তাওহীদকে কলুষিত করবে তার নিকট থেকে সে হারেই নিরাপত্তা ও হেদায়াত দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তবায়ন করল এবং শিরকের সাথে তার ঈমানকে কলুষিত করে নি অর্থাৎ তার তাওহীদকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে নি তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও হেদায়েত।* হাদীসের বর্ণিত মর্মার্থ হল, তার অন্য সব পাপ থাকলেও এবং আমলে ত্রুটি করলেও তাওহীদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। এটিই হল তাওহীদের অনুসারীদের মর্যাদা।

'যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দান করল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঈসা (عليه السلام) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর এমন এক কালিমা যা তিনি মরিয়াম (عليها السلام)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন, তার আমল যাই হোক না কেন।[1] *(বুখারী, হাদীস নং ২৮; মুসলিম)*

ইমাম বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক সংকলিত এবং সাহাবী ইতবান বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,

فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ (صحيح البخاري، الصلاة، باب المساجد في البيوت، ح:٤٢٥، الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، ح:٦٤٢٣ وصحيح مسلم، المساجد، الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، ح: ٣٣/٢٦٣)

'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।'

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩, ২৬৩)[2]

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ مُوْسٰى عليه السلام : يَا رَبِّ، عَلِّمْنِيْ شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوْكَ بِهِ. قَالَ : قُلْ يَا مُوْسٰى! لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ : كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا، قَالَ : يَا مُوْسٰى!

---

[1] উবাদাহ বিন সামিত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। উক্ত হাদীসের শেষ পর্যন্ত, তাঁর অন্য বাণী, ما كان على অর্থাৎ 'সে যে আমলের উপরই হোক না কেন' অর্থাৎ যদিও সে স্বল্প আমলকারী ও অনেক গুনাহ-খাতা করেছে। আর এটিই হল তাওহীদবাদীর প্রতি তাওহীদের অবদান। ইতবানের বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম আরো এসেছে, فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ .....

[2] হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে, এটি হল কালেমায়ে তাওহীদ-তাওহীদের বাণী, আর তাওহীদপন্থী ব্যক্তি যখন তাওহীদের বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, এর শর্তাবলী ও দাবী সমূহ পূরণ করে তখন আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ এবং সাথে কৃত ওয়াদা অনুযায়ী তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন। এটি একটি বড় অনুগ্রহ।

কিন্তু যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও অন্যান্য পাপ করে তাওবা না করে মারা যাবে তার বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন এরপর তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন। অর্থাৎ শাস্তি ভোগ করার পর আবার ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। তার জন্য প্রথমেই জাহান্নামকে হারাম করে দিতে পারেন।

لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ، وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِيْ كِفَّةٍ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِيْ كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح: ٢٣٢٤ والمستدرك للحاكم : ١/٥٢٨ ومسند أبي يعلي الموصلي، ح: ١٣٩٣)

"মূসা (عليه السلام) বলেছিলেন, 'হে আমার রব, আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব।' আল্লাহ বললেন, 'হে মুসা, তুমি *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলো।' মুসা (عليه السلام) বললেন, 'আপনার সব বান্দাই তো এটা বলে।' তিনি বললেন, 'হে মুসা, আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত তবক জমিন যদি এক পাল্লায় থাকে আরেক পাল্লায় যদি শুধু *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* থাকে, তাহলে *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*-এর পাল্লাই বেশি ভারী হবে।'

(ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৩২৪; মুসতাদরাক হাকিম, ১ম খণ্ড ৫২৭; মুসনাদ আবী ইয়া'লা, হাদীস নং ১৩৯৩; ইমাম হাকিম এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

বিখ্যাত সাহাবী আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ! لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (جامع الترمذي، الدعوات، باب يا ابن آدم إنك ما دعوتني، ح: ٣٥٤٠)

'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে আদম সন্তান, তুমি যদি আমার নিকট কোন শির্ক না করে পৃথিবী ভর্তি পাপ নিয়ে উপস্থিত হও, তাহলে আমি তোমার নিকট পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে আসব। *(জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৩; ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন।)*[1]

---

[1] হাদীসের তাৎপর্য হল, বান্দার পাপ যতি সাত আকাশ, আকাশে অবস্থিত বান্দা ও ফেরেশতা এবং সাত জমিন পরিমাণও হয় তাহলেও সেগুলোর চেয়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর পাল্লাটি ভারি হবে। আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীসেও এটি আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে। কালিমায়ে তাওহীদের এ বিরাট ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য যে একনিষ্ঠভাবে নিখাদচিত্তে সত্যিকার অর্থে এটি গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে, এটিকে ভালোবাসে অন্তরে কালেমার ছাপ ও চিহ্ন এবং তার আলো প্রভাবিত করে। যে তাওহীদের স্বরূপ এমন হবে, সেটি তাওহীদ বিরোধী সকল পাপকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্‌র অসীম করুণা।
২. আল্লাহ্‌র নিকট তাওহীদের পুরস্কারের আধিক্য।
৩. তাওহীদের বদৌলতে পাপরাশি মোচন হয়।
৪. সূরা আন'আমের [পূর্বোল্লিখিত ৮২নং] আয়াতের তাফসীর [অর্থাৎ শির্‌কই প্রকৃত যুল্‌ম]।
৫. উবাদা বিন সামিত (رضي الله عنه)-এর হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবন করা।
৬. উবাদা বিন সামিত (رضي الله عنه) এবং ইতবান (رضي الله عنه)-এর হাদিসকে একত্র করলে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*-এর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোঁকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।
৭. ইতবান (رضي الله عنه)-এর হাদীসে যে শর্ত রয়েছে [শর্তটি হল, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাওহীদের কালিমা পাঠ করবে।], সে সম্পর্কে সতর্কীকরণ।
৮. নবী-রাসূলগণও [যেমন, মুসা (عليه السلام)] *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*-এর ফযীলত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মুখাপেক্ষী ছিলেন।
৯. সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কালিমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ, যদিও এ কলেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে [অন্তর হতে] পাঠ না করার কারণে নেকীর পাল্লা হালকা হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।
১০. সপ্তাকাশের মতো সপ্ত জমিনও বিদ্যমান থাকার প্রমাণ।
১১. জমিনের মতো আকাশেও বসবাসকারীর অস্তিত্ব আছে।
১২. আশ'আরীদের মতবাদকে খণ্ডন করে আল্লাহর গুণাবলীকে ইতিবাচক বলে সাব্যস্ত করা [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্গুণ নন, তিনি বহু গুণে ভূষিত]।
১৩. সাহাবী আনাস (رضي الله عنه)-এর হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইতবান (رضي الله عنه)-এর হাদীসে বর্ণিত রাসূল (ﷺ)-এর বাণী, *'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।'*-এর মর্মার্থ হৃদয়াঙ্গম করা সহজ হয়। আর তা হচ্ছে, শির্‌ক বর্জন করা। মূল কথা

হচ্ছে, *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই শির্ক পরিত্যাগ করা হয় না।

১৪. ঈসা (عليه السلام) ও মুহাম্মাদ ﷺ উভয়েই আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা।

১৫. ঈসা (عليه السلام)-কে *'কালিমাতুল্লাহ্'* উপাধীতে ভূষিত করার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১৬. ঈসা (عليه السلام) আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ (পবিত্র আত্মা)-এর কথা জানা।

১৭. জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখার মর্যাদা।

১৮. রাসূল ﷺ-এর বাণী, (যে ব্যক্তি অন্তর হতে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলবে, সে যে 'আমলই করুক না কেন জান্নাতে যাবে)-এ কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করা।

১৯. মীযানের দুটি পাল্লা আছে, এ কথা জানা।

২০. হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য وجه (ওয়াজহ) বা 'চেহারা-মুখমণ্ডল' আছে, আল্লাহ্‌র এ গুণ- চেহারার প্রতি ঈমান রাখতে হবে, তবে তাঁর কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যাবে না।

অধ্যায়-২

যে ব্যক্তি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।[1]

আল্লাহ্‌র বাণী-

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (النحل:١٢٠)

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী একটি উম্মত বিশেষ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"[2] (সূরা আন-নাহ্‌ল: ১২০)

আল্লাহ্ বলেছেন-

﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ (ابراهيم : ٥٩)

'আর যারা তাদের প্রভুর সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত করে না।"[3]

(সূরা আল-মুমিনূন: ৫৯)

---

[1] তাওহীদের বর্ণনার ক্ষেত্রে এ অধ্যায়টি সর্বোচ্চ স্তরের। কারণ, তাওহীদের ফযীলতে তাওহীদপন্থীরাও জড়িত। এ উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাওহীদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়।

[2] আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। তার প্রমাণ হল, আল্লাহ্ তাকে কয়েকটি গুণে ভূষিত করেছেন। **প্রথমত:** তিনি এক (أمة জাতি) ছিলেন। উম্মাত হচ্ছেন সেই ইমাম যিনি কল্যাণ ও মানবিক পরিপূর্ণতার সকল গুণে গুণান্বিত। এর অর্থ হল তার মধ্যে কোন কল্যাণের ঘাটতি ছিল না। এটাই হল তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থ। **দ্বিতীয়ত:** এতে আনুগত্য ও তাওহীদপন্থীদের বরণ করা সাব্যস্ত। ﴿قَانِتًا لِلَّهِ﴾ এতে মুশরিকদের পথ এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া প্রমাণিত হয়। সেই পথ হল শির্ক, বিদ'আত ও অবাধ্যতার পথ।* এই তিনটি হচ্ছে মুশরিকদের চরিত্র। তারা আনুগত্য করে না, তাওবা করে না।

[3] ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে, তারা কোন অবস্থাতেই বড় ছোট ও গুপ্ত শিরকে লিপ্ত হয় না এবং মুশরিকদের থেকে দূরে থাকে। শায়খ (রাহেমাহুল্লাহ) এ সমস্ত অর্থ আয়াত থেকেই উত্থাপিত করেছেন। আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা এসব বর্জন করে। আর আল্লাহ্‌র বাণী, ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ শিরকের অস্বীকৃতি বুঝায়। কেননা নিয়ম হল فعل مضارع-এর উপর যদি حرف نفى আসে তবে তাতে উক্ত فعل ক্রিয়ার মাসদারের علم نفى এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ তিনি যেন বলেন, না তারা মহা শির্ক করে, না ছোট শির্ক, না গুপ্ত শির্ক অর্থাৎ তারা কোন প্রকার শির্ক কওে না। আর যে শির্ক করে না সেই হল তাওহীদপন্থী। আর সে ব্যক্তি এ জন্যই শির্ক করে না, কেননা সে তাওহীদপন্থী।

উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর বাণীতে بربهم-কে পূর্বে আনার কারণ হল, তাওহীদে রুবুবিয়াত ও তাওহীদে উলুহিয়্যাত পরস্পর জড়িত। আর এটি ঐ লোকদেরই বৈশিষ্ট্য যাঁরা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করে। কেননা শির্ক না করাতে এটাও জরুরী হয়ে পড়ে যে, সে তার প্রবৃত্তির সাথেও শির্ক করবে না, যখন কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির সাথে শির্ক করে তখন সে বিদআতে পতিত হয় বা পাপে লিপ্ত হয়। সুতরাং শির্ক পরিত্যাগের ফলে সমস্ত প্রকার শির্ক, বিদ'আত ও পাপ পরিত্যাগ হয়ে থাকে। আর একেই বলা হয় আল্লাহ তা'আলার জন্য তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।

হুসাইন বিন আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার আমি সাঈদ বিন জুবাইরের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, গতকাল রাত্রে যে নক্ষত্রটি ছিটকে পড়েছে তা তোমাদের মধ্যে কে দেখতে পেয়েছে? তখন বললাম, 'আমি'। তারপর বললাম, 'বিষাক্ত প্রাণী কর্তৃক দংশিত হওয়ার কারণে আমি নামাজে উপস্থিত থাকতে পারিনি'। তিনি বললেন, 'তখন তুমি কি চিকিৎসা করেছ? বললাম, 'ঝাড় ফুঁক করেছি'। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? [অর্থাৎ তুমি কেন এ কাজ করলে?] বললাম, 'একটি হাদিস' [এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে] যা শা'বী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি বর্ণনা করেছেন? বললাম 'তিনি বুরাইদা বিন আল হুসাইব থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, চোখের দৃষ্টি বা চোখ লাগা এবং জ্বর ব্যতীত অন্য কোন রোগে ঝাড়-ফুঁক নেই।' তিনি বললেন, 'সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত জিনিস শেষ পর্যন্ত আমল করতে পেরেছে'। কিন্তু ইবনে আব্বাস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ

مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

(صحيح البخاري، الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ح:٥٧٠٥، ٥٧٥٢ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف واللفظ له)

'আমার সম্মুখে সমস্ত জাতিকে উপস্থাপন করা হলো। তখন আমি এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। এরপর আরো একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে মাত্র দু'জন লোক রয়েছে। আবার এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে কোন লোকই নেই। ঠিক এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট জনগোষ্ঠী পেশ করা হলো। তখন আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো এরা হচ্ছে মুসা (عليه السلام) এবং তাঁর জাতি। এরপর আরো একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর দিকে আমি তাকালাম। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসেবে এবং বিনা আজাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি দরবার থেকে উঠে বাড়ির অভ্যন্তরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা ঐ সব ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করে দিলো। কেউ বলল, তারা বোধ হয় রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহচার্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গ। আবার কেউ বলল, তারা বোধ হয় ইসলাম পরিবেশে অথবা মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে তারা কাউকে শরিক করেনি। তারা এ ধরনের আরো অনেক কথা বলাবলী করল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে উপস্থিত হলে বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন, 'তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঝাড়-ফুক করে না। পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে না। শরীরে সেক বা দাগ দেয় না। আর তাদের রবের উপর তারা ভরসা করে।' এ কথা শুনে ওয়াকাশা বিন মুহসিন দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করে নেন।' তিনি বললেন, আমি দু'আ করলাম, 'তুমি তাদের দলভুক্ত'। অতঃপর অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্যও দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, 'তোমার পূর্বেই ওয়াকাশা এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।'

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৫২, ৫৭০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২০)[1]

---

[1] হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, যারা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে তারা মোটেও কোন চিকিৎসা গ্রহণ করে না। কারণ, মহানবীকে ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে, তিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান।

২. তাওহীদ বাস্তবায়নের মর্মার্থ কি তা জানা।

৩. আল্লাহ তা'আলা নাবী ইবরাহীম (ﷺ)-এর [বিশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা] এ কথা বলে প্রশংসা করেছেন যে, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

৪. শির্ক থেকে মুক্ত থাকার কারণে বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তিগণের প্রশংসা।

৫. তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ও চর্ম দগ্ধ (আগুনের দাগ) বর্জন করা তাওহীদপন্থী হওয়ার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

৬. আল্লাহর উপর ভরসা বা তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ নির্ভরতাই বান্দার মধ্যে উল্লেখিত গুণ ও স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়।

৭. বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবান লোকেরা কোন আমল ব্যতীত উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেননি, এটা জানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞানের গভীরতা।

৮. কল্যাণের প্রতি তাঁদের অপরিসীম আগ্রহ।

৯. সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর সার্বিক ফযীলত বা মর্যাদা।

১০. মূসা (আ:)-এর অনুসারীদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) মর্যদা।

১১. সব উম্মতকে রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

১২. প্রত্যেক উম্মতই নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথকভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১৩. নবীগণের আহ্বানে সাড়া দেয়ার মতো লোকের স্বল্পতা।

১৪. যে নবীর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করেনি, তিনি একাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত।

একজন সাহাবীকে শরীরে দাগ দেয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে এ ধারণা করা যায় না যে তাঁরা চিকিৎসা ও ঔষধকে আরোগ্য লাভের একেবারে কারণ হিসেবে গ্রহণ করেননি। হাদীসে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর ফলে আল্লাহর উপর ভরসা কমে যায় এবং তাতে হৃদয়ের সম্পর্কে ও আকর্ষণ ঝাড়-ফুঁককারী, সেকদাতা ও গণকের দিকে ধাবিত হয়। যাতে আল্লাহ্র প্রতি ভরসায় কমতি হয়। পক্ষান্তরে, কিচিৎসা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব। কোন কোন অবস্থায় মুবাহ। মহানবী ﷺ বলেছেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দারা চিকিৎসা কর; হারামের মাধ্যমে চিকিৎসা করো না।'

১৫. এ জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোঁকা না খাওয়া আবার সংখ্যাল্পতার কারণে অবহেলা না করা।

১৬. চোখ-লাগা (বদনজর লাগা), বিষাক্ত জীবের দংশনজনিত বিষে ও জ্বরের চিকিৎসার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি রয়েছে। [তবে, শর্ত হচ্ছে, সে ঝাড়-ফুঁকে শিরকের লেশমাত্রও যেন না থাকে।]

১৭. সালফে সালেহীনের জ্ঞানের গভীরতা। (قد أحسن من انتهى إلى ما سمع) 'সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে নাবী ﷺ থেকে যা শুনেছে তাই 'আমল করেছে'। কিন্তু এ সব কাজ [ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, তাবীয-কবচ ইত্যাদির আশ্রয় না নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করা] আরো বেশী কল্যানদায়ক, এ কথাই এর প্রমাণ বহন করে। অতএব, প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী নয়।

১৮. সালফে সালেহীনদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি ছিল এরূপ যে, মানুষের মধ্যে যে গুণ নেই তার প্রশংসা থেকে বিরত থাকতেন।

১৯. أنت منهم (তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত) বলে রাসূল ﷺ ওয়াকাশা ﷺ-এর ব্যাপারে যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তা নবুওয়তেরই প্রমাণ পেশ করে। [এটি মহানবী ﷺ-এর অন্যতম একটি মুজিযা, কারণ এটি কোন ভবিষ্যদ্বাণী নয়।]

২০. ওয়াকাশা ﷺ-এর মর্যাদা ও ফযীলত।

২১. কোন কথা সরাসরি না বলে হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করা। [অর্থাৎ ইঙ্গিত ও চাতুর্যের প্রয়োগ, যেমন- রাসূল ﷺ দ্বিতীয় বার দু'আর আবেদনকারীকে সরাসরি বলেননি যে, আমি তোমার জন্য দু'আ করব না, বরং তিনি কথাটি অন্যভাবে বললেন যে, 'তোমার পূর্বেই ওয়াকাশা এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।']

২২. মহানবী ﷺ-এর অনুপম চরিত্র।

অধ্যায়-৩

শির্ক সম্পর্কীয় ভীতি[1]

মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"[2] (সূরা নিসা : ৪৮)

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) বলেছিলেন,

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (ابراهيم : ٣٥)

'আমাকে ও আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ।"[3] (সূরা ইবরাহীম: ৩৫)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

[1] তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকারীগণ তাওহীদের পথে চলার সাথে সাথে শির্ককে ভয় করেন। যে ব্যক্তি শিরকে ভয় করে সে শিরকের অর্থ ও তার প্রকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে যাতে এগুলোয় পতিত না হয়।

[2] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ কতিপয় বিদ্বান বলেন, এখানে ছোট, বড় ও গোপন সকল শির্ক উদ্দেশ্য। শির্ক এতই ভয়াবহ যে, তাওবা ছাড়া আল্লাহ্ এগুলো ক্ষমা করেন না। কারণ তিনি সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা দিয়েছেন দান ও অনুগ্রহ করেছেন। অতএব কিভাবে মন অন্য দিকে ধাবিত হতে পারে? এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও অধিকাংশ বিদ্বান। অতএব যখন কোন শির্ককই ক্ষমা করা হবে না সুতরাং তা থেকে ভয় করা অপরিহার্য। আর শির্ক হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আর যেহেতু রিয়া-লৌকিকতা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ, তাবীজ-কবজ ঝুলানো, বালা অথবা সুতা পরা অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের কোন অংশ অন্যের প্রতি সম্পর্কিত করা ইত্যাদি যখন শির্ক, আর তা ক্ষমা করা হবে না। সুতরাং তা থেকে এবং মহা শির্ক থেকেও সবচেয়ে বড় ভয় করা অপরিহার্য। শির্ক যেহেতু মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে অতএব, মানুষের উচিত শিরকের যাবতীয় প্রকার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা, যেন তাতে পতিত না হয়। অতঃপর শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহি.) ঐ আয়াত বর্ণনা করেন যাতে ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ রয়েছে-﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

[3] এটি হচ্ছে মর্দে কামালের অবস্থা। তারা শুধু তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন না, বরং শির্ক ও তার মাধ্যমকেও ভয় করেন। أصنام শব্দটি صنم -এর বহু বচন। আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত-পূজা করা হয় তার ছবি ও প্রতিকৃতিকে صنم বলে। তাই সেটি মানুষের চেহারার আকারে হোক প্রাণীর শরীর বা মাথা ইত্যাদির আকারে হোক, চাঁদ, সূর্য, কবর অথবা অন্য যে কোন আকারেই হোক। الوثن 'অসান' হল, আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়, চাই তা ছবির আকৃতিতে হোক যা আসনামের-মূর্তির অন্তর্ভূক্ত, অথবা ছবির আকৃতির না হোক যেমন- কবর, মাজার।

أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : الرِّيَاءُ (مسند أحمد:٥/٤٢٨، ٤٢٩ ومجمع الزوائد :١/١٠٢ والمعجم الكبير للطبراني، ح: ٤٣٠١ بزيادة إن في أوله)

'আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তা হচ্ছে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শির্ক। তাকে শিরকে আসগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, (ছোট শির্ক হচ্ছে) রিয়া বা প্রদর্শনেছা।'[1] *(আহমদ, ৫ম খণ্ড ৪২৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড ১০২; মু'জামুল কাবীর ত্বাবরানী, হাদীস নং ৪৩০১)*

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ (صحيح البخاري، التفسير، باب قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ ح:٤٤٩٧)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[2] *(বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭)*

সাহাবী জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

---

[1] রিয়া সম্পর্কে মানুষ অসচেতন এবং আল্লাহ্ এটি ক্ষমা করেন না, তাই মহানবী এ বিষয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। রিয়া দুই প্রকার, যেমন: (ক) মুনাফিকদের রিয়া। অর্থাৎ মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে থাকে কুফরী। ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ অর্থাৎ 'তারা লোকদেরকে দেখায় আর তারা অতি অল্পই আল্লাহ্কে স্মরণ করে।' (খ) তাওহীদপন্থী মুসলমানের রিয়া। যেমন: খুব সুন্দর করে সলাত পড়ে যাতে মানুষ তা দেখে প্রশংসা করে। এটি ছোট শির্ক।

[2] আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ডাকা বড় শিরক। সহীহ্ হাদীসে আছে, 'দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত'। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য ইবাদতের কিছু অংশ সাব্যস্ত করল সে নিজের জন্য জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নিল। নবীর বাণী, دخل النار অর্থাৎ যেমন কাফেরদের অবস্থান জাহান্নামে চিরস্থায়ী অনুরূপ তার অবস্থায়ও। কেননা মুসলমান যদি মহা শিরকে পতিত হয় তবে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে, যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'আর তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে নিশ্চয়ই তোমার কৃতকর্ম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।' (সূরা যুমারঃ ৬৫)

হাদীসে বর্ণিত শব্দ من دون الله -এর তাফসীরকারক ও দ্বীনি গবেষকদের মতে তাফসীর হল, যে আল্লাহকে ডাকে ও আল্লাহ্র সাথে অন্যকে ডাকে এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকে ও আল্লাহ্ বাদ দিয়ে তার দিকেই মুক্ত হয়ে ধাবিত হয়।

مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ (صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركا دخل النار، ح:٩٣)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩)*[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. শির্ক-ভীতি, শির্ককে ভয় করে চলতে হবে।

২. 'রিয়া' বা 'প্রদর্শনেচ্ছা' বা লোক দেখানো 'আমল শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

৩. 'রিয়া' ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

৪. নেক্কার লোকদের জন্য সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হচ্ছে 'শিরকে আসগর' (ছোট শির্ক)।

৫. জান্নাত ও জাহান্নামের নৈকট্য। [অর্থাৎ উভয়েই নিকটে রয়েছে, দূরে নয়।]

৬. জান্নাত ও জাহান্নাম নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি একই হাদিসে বর্ণিত হওয়া।

৭. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতকারী হওয়া সত্ত্বেও সে জাহান্নামে যাবে।

৮. ইবরাহীম খলিল ﷺ এর দোয়ার প্রধান বিষয় হচ্ছে, তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা তথা শির্ক থেকে রক্ষা করা।

---

[1] হাদীসের অর্থ হল, যে ব্যক্তি কোন ধরণের শির্ক করল না এবং (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) কারো মুখাপেক্ষী হল না, না কোন ফেরেশ্তা আর না কোন নবী, না কোন ওলী ও না কোন জ্বিনের, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শির্ক করা অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এখানে মহা শির্ক, ছোট শির্ক গোপন শির্ক সবই অন্তর্ভূক্ত। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কি সাময়িকভাবে না স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে? (ক) বড় শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। সেখান থেকে বের হবে না। (খ) আর ছোট ও গোপন শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নামে থাকার পর বের হয়ে আসবে; কারণ সে তাওহীদবাদী।

৯. ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ 'হে আমার রব, এ মূর্তিগুলো বহু লোককে গুমরাহ করেছে'- এ কথা দ্বারা ইবরাহীম (عليه السلام) বহু লোকের অবস্থা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন।

১০. এতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর তাফসীর রয়েছে, যা ইমাম বুখারী (রাহি.) বর্ণনা করেছেন।

১১. শির্ক থেকে মুক্ত ব্যক্তির মর্যাদা।

অধ্যায়-৪

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহ্বান[1]

আল্লাহ্ তা'আলার মহাপবিত্র বাণী-

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ (يوسف : ١٠٨)

'বলুন, এটি আমার পথ। আমি জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে আহবান করি।"[2] (ইউসুফ: ১০৮)

সাহাবী ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, সাহাবী মুআ'য বিন জাবাল (رضي الله عنه)-কে রাসূল (ﷺ) যখন ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন তখন [রাসূল সাহাবী মুআ'যকে লক্ষ্য করে] বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وفي رواية : إلى أَنْ يُوَحِّدُوْا اللهَ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، (صحيح البخاري، الزكاة، باب لا توخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ح:١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٤٣٤٧، وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ح:١٩)

---

[1] মানুষকে তাওহীদকে দাওয়াত দিলে, শির্কভীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তাওহীদও পরিপূর্ণতা লাভ করে। এটিই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রকৃত স্বরূপ। কেননা এর অর্থ হল, তার আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তার দাবী সম্পর্কে অন্যকে জানান। তাওহীদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হল তার সঠিক দিক ও প্রকারের প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং শির্ক ও শিরকের প্রকারসমূহ থেকে নিষেধ করা। আর এটিই হল সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[2] একমাত্র আল্লাহ্র দিকে অন্য কারো দিকে নয়। আল্লাহ্র এ বাণীতে দুটি উপকারিতা রয়েছে, (ক) তাওহীদের প্রতি আহ্বান। (খ) খুলুসিয়াত সম্পর্কে সচেতনতা। কেননা, যদিও অনেকে হকের পথে আহ্বান করে কিন্তু বাস্তবে সে নিজের দিকেই আহ্বান করে থাকে। على بصيرة অর্থাৎ তাওহীদের দিকে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস, জ্ঞান ও বুঝের মাধ্যমে আহ্বান করেন বরং আল্লাহ্র পথে না জেনে না বুঝে দাওয়াত দেন না। أنا ومن اتبعني-এর অর্থ হল আমি আল্লাহ্র পথে জেনে বুঝে আহ্বান করি এবং আমার যারা অনুসারী ও যারা আমার দাওয়াত কবুল করেছে তারাও সে পথে জেনে বুঝে দাওয়াত দেয়। সুতরাং নবীগণের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা শুধু শির্ককে ভয় এবং তাওহীদকে বাস্তবায়ন করেই ক্ষান্ত হন না বরং তাওহীদের প্রতি আহ্বানও করেন।

'তুমি এমন এক কাওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। [যারা কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী] কাজেই সর্ব প্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দান"। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর জাকাত ফরজ করে দিয়েছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরিবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধানে থাকবে। আর মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তাআলার মাঝখানে কোনই পর্দা নেই।"[1]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯)

বুখারী ও মুসলিমে সাহাল বিন সাআদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) খায়বারের [যুদ্ধের] দিন বললেন,

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ح:٣٧٠١ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب علي بن أبي طالب رضى الله عنه ح:٢٤٠٦)

---

[1] হাদীসটি থেকে দলীল গ্রহণের কারণ হল, নবী (ﷺ) মুয়ায (رضي الله عنه)-কে দাওয়াতের জন্য পাঠিয়ে নির্দেশ দেন যে, তাঁর দাওয়াত যেন সর্বপ্রথম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাক্ষ্যর প্রতি হয়। এর ব্যাখ্যা রয়েছে অন্য বর্ণনায় যা ইমাম বুখারী (রাহি.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এনেছেন। নবী (ﷺ) বলেন, 'তুমি সর্বপ্রথম তাদেরকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে।'

'আগামীকাল এমন ব্যক্তির কাছে আমি ঝান্ডা প্রদান করব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালোবাসে। তার হাতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। কাকে ঝান্ডা প্রদান করা হবে এ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্যে লোকজন রাত্রি যাপন করল। যখন সকাল হয়ে গেল তখন লোকজন রাসূল সাহাবী এর নিকট গেল, তাদের প্রত্যেকেই আশা পোষণ করছিল যে, ঝাণ্ডা তাকেই দেয়া হবে [অর্থাৎ যদি আমি ঝাণ্ডা পেতাম!- এ রকম একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেকের অন্তরে।], তখন তিনি ﷺ বললেন, আলী বিন আবি তালিব কোথায়? বলা হল, তিনি চক্ষুর পীড়ায় ভুগছেন। তাদেরকে আলী (রাঃ)-এর কাছে পাঠানো হল। অতঃপর তাকে রাসূল ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হল। তিনি আলী (রাঃ)-এর চোখে নিজের মুখের পবিত্র থু থু দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। তখন তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন যেন তার চোখে কোন ব্যথাই ছিল না। রাসূল ﷺ আলী (রাঃ)-এর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি বীর পদক্ষেপে [ভয়হীন চিত্তে] ভিতরে ঢুকে পড়। এমনকি তাদের [দুশমনদের] নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হও। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও এবং তাদের উপরে আল্লাহ তাআলার যে সব হক রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের যা করণীয় তা জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ তাআলা একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৬)[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. রাসূল ﷺ-কে অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

---

[1] হাদীসে বর্ণিত, ثم ادعهم إلى الإسلام (তারপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও)-এর উদ্দেশ্য হল, ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে তাওহীদের দাওয়াত। কারণ, ইসলামের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হল, এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন যে, তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে তাদের উপর আল্লাহ্র কি অধিকার রয়েছে তা জানিয়ে দেয়া। চায় সে অধিকার তাওহীদ সম্পর্কিত হোক বা ফরয ও ওয়াজিব সম্পর্কিত বা হারাম থেকে সতর্ক থাকা সম্পর্কিত। এ জন্য যখন কোন ব্যক্তি কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে সে যেন প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেয় এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করে দেয়। তারপর তাকে হারাম ও ফরয ও ওয়াজিব সম্পর্কেও অভিহিত করে, কেননা মৌলিক বিষয়ই প্রথম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও অপরিহার্য হয়ে থাকে।

২. ইখলাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক লোক হকের পথে মানুষকে আহ্বান জানালেও মূলতঃ তারা নিজের নফ্স বা স্বার্থের দিকেই আহ্বান জানায়।
৩. তাওহীদের দাওয়াতের জন্য অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন দূরদর্শিতার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একান্ত অপরিহার্য।
৪. উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সব ধরণের দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আরোপ করা থেকে পবিত্র থাকা।
৫. আল্লাহ তাআলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা নিকৃষ্ট এবং জঘন্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
৬. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতের মধ্যে রয়েছে, মুসলমানকে মুশরিকদের প্রভাব হতে দূরে রাখা। শির্ক না করা সত্ত্বেও কোন মুসলমান যেন মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে না পড়ে।
৭. [অমুসলমানকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের] প্রথম ওয়াজিব বা অপরিহার্য কাজই হতে হবে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব।
৮. সবকিছুর আগে এমনকি সলাতেরও আগে তাওহীদ দিয়ে দাওয়াত শুরু করতে হবে।
৯. আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই'-এ ঘোষণা দেয়া।
১০. একজন মানুষ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে কিংবা তাওহীদের জ্ঞান থাকলেও তা দ্বারা আমল নাও করতে পারে।
১১. পর্যায়ক্রমিকভাবে শিক্ষা দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ।
১২. বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদান শুরু করা, তারপর গুরুত্বের পর্যায় অনুসারে শিক্ষাদানে অগ্রাধিকার প্রদান।
১৩. যাকাত প্রদানের খাত সম্পর্কিত জ্ঞান।
১৪. শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর মনে উদ্ভূত সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উন্মোচন করা বা নিরসন করা।
১৫. যাকাত আদায়ের সময় বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।
১৬. মজলুমের [অত্যাচারিত] বদ্ দু'আ থেকে বেঁচে থাকা।
১৭. মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকার সংবাদ।

১৮. সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ﷺ-এর বড় বড় বজুর্গানে দ্বীনের উপর যে সব দুঃখ-কষ্ট, ক্ষুধার যন্ত্রণা, সংকট এবং কঠিন বিপদাপদ আপতিত হয়েছে, তা তাওহীদেরই প্রমাণ পেশ করে।

১৯. 'আমি আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।' রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি নবুয়তেরই একটি নিদর্শন।

২০. আলী (رضي الله عنه)-এর চোখে থুথু প্রদানে চোখ আরোগ্য হয়ে যাওয়াও নবুয়তের একটি নিদর্শন।

২১. আলী (رضي الله عنه)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২২. আলী (رضي الله عنه)-এর হাতে পতাকা তুলে দেয়ার পূর্বরাতে পতাকা পাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে রাত্রি যাপন এবং বিজয়ের সুসংবাদে আশ্বস্ত থাকার মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত আছে।

২৩. বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের পতাকা তথা নেতৃত্বদানের সম্মান লাভে ধন্য হওয়া আর চেষ্টা করেও [অর্থাৎ বিজয়ের জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও] তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থায়ই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা।

২৪. 'বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও' রাসূল ﷺ-এর এ উক্তির মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দানের ইঙ্গিত রয়েছে।

২৫. যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা।

২৬. ইতিপূর্বে যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

২৭. أخبرهم بما يجب عليهم রাসূল ﷺ-এর এ বাণী [তাদের উপরে আল্লাহ তাআলার যে সব হক রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের যা করণীয় তা জানিয়ে দাও।] হিকমত ও কৌশলের সাথে দাওয়াত পেশ করার ইঙ্গিত বহন করে।

২৮. দীন ইসলামে আল্লাহর হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

২৯. যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার তার সওয়াব।

৩০. ফতোয়ার প্রদান প্রসঙ্গে শপথ করে বলা। [এতে ফতোয়ার গুরুত্ব বেড়ে যায়।]

অধ্যায়-৫

তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সাক্ষ্য বাণীর ব্যাখ্যা[1]

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ﴾ (الاسراء: ٥٧)

'এসব লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় অসীলার অনুসন্ধান করে (আর ভাবে) কোনটি সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী।'[2] (সূরা বনী ইসমাইল: ৫৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (الزخرف: ٢٦-٢٧)

---

[1] সাক্ষ্যবাণীতে কয়েকটি বিষয় রয়েছে, (১) সাক্ষ্যবাণী মুখে উচ্চারণ করা। (২) যা উচ্চারণ করেছে এবং যেটির সাক্ষ্য দিয়েছে তা বিশ্বাস করা। এতে থাকতে হবে জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাস। (৩) খবর দেয়া যা সাক্ষ্যবাণী সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করা। সাক্ষ্য বাণী মুখে উচ্চারণ করা অপরিহার্য। আর সাক্ষ্য দেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুখে উচ্চারণ করে অন্যকে অবহিত না করে। সুতরাং أشهد (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) এর অর্থ দাঁড়াবে, 'আমি বিশ্বাস রাখি', আমি মৌখিক স্বীকৃতি দিচ্ছি (মুখে বলি) এবং অন্যকেও অবহিত করি। আর এ তিন অর্থই এর মধ্যে এক সাথে হওয়া জরুরী। لا إله إلا الله-এর لا হল, نفي جنس যার ফলে এর অর্থ হল, আল্লাহ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুই ইবাদতের উপযুক্ত নয়। نفي-এর পর (হরফে ইস্তিসনা) حصر -এর ফায়দা দেয় অর্থাৎ প্রকৃত মা'বূদ একমাত্র আল্লাহ্ই তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই।

إله শব্দটির অর্থ হল মা'বূদ। লায়ে নাফী জিনসের উক্ত খবর موجود নয়, কেননা আল্লাহ্র সাতে যে সব উপাসকের ইবাদত করা হয় তারাও মওজুদ। সুতরাং এক্ষেত্রে উহ্য খবর হল بحق বা حق অতএব বাক্যটির অর্থ হবে لا إله بحق অর্থাৎ প্রকৃত কোন মা'বূদ-উপাস্য নেই। কেননা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যা কিছুরই ইবাদত করা হয় তারাও তো মা'বূদ-উপাস্য যদিও তাদের ইবাদত করা ভ্রান্ত, বাতিল, যুলুম ও সীমলংঘন। আর একজন আরবী ভাষী لا إله إلا الله শুনে এ অর্থই বুঝবে।

[2] এ আয়াত يدعون এর অর্থ হল يعبدون 'ওয়াসীলাহ' অর্থ ইচ্ছা ও প্রয়োজন। অর্থাৎ তারা নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্মুখী হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই এর জন্য নির্ধারিত, অতএব তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যমুখী হয় না বরং তাদের প্রবণতা আল্লাহ্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ আয়াতে আল্লাহ্ إلى ربهم বলে রুবূবিয়াতের বর্ণনা দেন, কেননা দু'আ কবুল ও সওয়াব দেয়াই হল রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এ আয়াতে তাওহীদের তাফসীর প্রস্ফুটিত হয়েছে, আর তা হল, সব ধরণের প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহ্রই নিকট পুরা হতে পারে। ويرجون رحمته ويخافون عذابه অর্থাৎ 'তারা তাঁর রহমতের আশাধারী এবং তাঁর আযাব থেকে ভয়কারী' আর এ হল আল্লাহ্র বান্দাদের বিশেষ অবস্থা যে তারা ইবাদতের মধ্যে মুহাব্বত, ভয় ও আকাঙ্ক্ষাকে একত্রিত কওে; আর এটিই তো হল তাওহীদের তাফসীর।

'সে সময়ের কথা স্মরণ করো যখন ইবরাহীম তার পিতা ও কওমের লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যার ইবাদত করো তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমার সম্পর্ক হচ্ছে কেবল মাত্র তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।'[1]

(সূরা যুখরুফ: ২৬)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন-

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١)

'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে।'[2] (সূরা তাওবাহ্: ৩১)

আল্লাহ্র বাণী-

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (الزخرف: ٢٦-٢٧)

'মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমনিভাবে একমাত্র আল্লাহকেই ভালোবাসা উচিত।'[3]

(সূরা বাকারা: ২৬৫)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (صحيح مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله الله....، ح : ٢٣)

---

[1] এ আয়াতে রয়েছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক। এ দু'টি না হলে তাওহীদের মর্ম পূর্ণ হবে না। এটি ব্যতীত কারো ইসলামও সঠিক হবে না।

[2] 'রুবূবিয়্যাহ' অর্থ: ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকেও মেনে চলে। অথচ অনুসরণ ও মেনে চলা তাওহীদেরই অন্তর্ভূক্ত।

[3] আয়াতের তাৎপর্য হল, তারা ঐ সকল পভূর ভালোবাসাকে আল্লাহ্র ভালোবাসার সাথে একীভূত করে ফেলেছে। ভালোবাসায় একীভূত করে ফেলা- এটিই হচ্ছে শির্ক। আর এটিই তাদেরকে জাহান্নামী করেছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদের সংবাদ দিয়ে সূরা শূরা ৯৭ ও ৯৮ নং আয়াতে বলেন,

﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে জগত সমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করতাম।' ভালোবাসাও এক প্রকার ইবাদত। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভালোবাসাকে একক সাব্যস্ত না করল, সে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নিল আর এটিই হল তাওহীদ ও لا إله إلا الله এর অর্থ।

'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই] বলবে, আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে[1] তার জান ও মাল হারাম [অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ] গোপন তৎপরতা ও অন্তরের কুটিলতা বা মুনাফিকীর জন্য] তার শাস্তি আল্লাহর উপরই ন্যস্ত।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩)[2] পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাওহীদ-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[3]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

এ অধ্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, তাওহীদ এবং এর সাক্ষ্য বাণীর ব্যাখ্যা। উভয়ের মাঝে কয়েকটি স্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যেমন:

১. সূরা ইসরার আয়াত, এ আয়াতে সে সব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা বুজুর্গ ও নেক বান্দাদেরকে (আল্লাহকে ডাকার মত] ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

২. সূরা তাওবার আয়াত। এতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় ও পাপ কাজে আলেম ও আবিদদের আনুগত্য করা যাবে না। তাদের কাছে দু'আও করা যাবে না।

৩. কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল (عليه السلام)-এর কথা দ্বারা তাঁর রবকে যাবতীয় মা'বুদ থেকে আলাদা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এখানে এটাই বর্ণনা করেছেন যে [বাতিল মা'বুদ থেকে] পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মাবুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الزخرف:٢٨)

'আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে রেখে গেলো, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে।' (সূরা যুখরুফ: ২৮)

---

[1] শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র স্বীকৃতি দিলেই যথেষ্ট হবে না, বরং আল্লাহ্ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

[2] যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করবে সেই মুসলমান। তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানদের প্রাণ সম্পদ গ্রহণ করা হালাল হবে না।

[3] সম্পূর্ণ গ্রন্থটি তাওহীদের ব্যাখ্যা। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর ব্যাখ্যা। তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়ের বিবরণ। ছোট বড় ও গুপ্ত শিরকের বিবরণ এক কথায় তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কিত সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ।

৪. সূরা বাকারার কাফেরদের বিষয় সম্পর্কিত আয়াত। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, ﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (البقرة:١٦٧) 'তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"
এখানে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরিকদেরকে [যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে] আল্লাহকে ভালোবাসার মতই ভালোবাসে।
এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করতে পারেনি। তাহলে আল্লাহর শরিককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে কীভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরিককেই ভালোবাসে। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভালোবাসা নেই তার অবস্থাই বা কি হবে?

৫. রাসূল ﷺ-এর বাণী, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে, তার ধন-সম্পদ ও রক্ত পবিত্র।' [অর্থাৎ জান, মাল, মুসলমানের কাছে নিরাপদ] এ বাণী হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণ, শব্দসহ এর অর্থ জানা, এর স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেই জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদত তথা মিথ্যা মা'বুদগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি সংযুক্ত না হবে। এতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা সংকোচ পরিলক্ষিত হয় তাহলে জান-মাল ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব, এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও অকাট্য দলিল।

অধ্যায়-৬

বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সূতা] ইত্যাদি পরিধান করা শির্ক[1]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (الزمر: ٣٨)

'[হে রাসূল] আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো,[2] তারা কি তাঁর

---

[1] এ অধ্যায়ে তাওহীদের বর্ণনা শুরু হচ্ছে তার পরিপন্থী শিরকের বর্ণনার মাধ্যমে। সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু সম্পর্কে জানার দু'টি দিক রয়েছে, তার বাস্তবতাকে উপলব্ধি ও তার বিপরীত বিষয়কে জানা। ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এখানে তাওহীদের বিপরীত বিষয় অর্থাৎ শিরকে আকাবারের বর্ণনা করেন। আর তাওহীদের পরিপন্থী যা অর্থাৎ মহা শির্ক-শিরকে আকবার তাওহীদকে স্বমূলে বিনাশ করে দেয় এবং যে এ মহা শিরকে পতিত হয় সে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আর দ্বিতীয়ত: কতিপয় শির্ক এমন রয়েছে যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী। কেননা পরিপূর্ণ তাওহীদ হল, সব ধরণের শির্ক থেকে মুক্ত থাকা। শায়খ-রাহিমাহুল্লাহ শিরকের বিশদ বর্ণনা কতিপয় এমন ছোট শিরকের মাধ্যমে শুরু করেন যাতে মানুষ সাধারণত বেশি বেশি পতিত হয় এবং তিনি নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে ধাবিত হওয়ার ভিত্তিতে ছোট শির্ক মহা শিরকের পূর্বে বর্ণনা করেন।

বিশেষ আকীদা বিশ্বাস নিয়ে যা কিছুই ঝুলানো হবে অথবা পরা হবে সেটিই এর (বালা সূতা প্রভৃতি) অন্তর্ভূক্ত হবে, চাই সেটি বাড়িতে ব্যবহার করা হোক অথবা গাড়িতে অথবা ছোটদের শরীরে লাগানো হোক এসব কিছু শিরকের অন্তর্ভূক্ত। আরবদের বিশ্বাস ছিল এগুলিতে উপকার হয়। হয়তো বা বালা-মসীবতে পতিত হওয়ার পর তা দূর করার ক্ষেত্রে বা তাতে পতিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে। আর এ বিশ্বাস হল মারাত্মক। কেননা এতে বিশ্বাস করা হয় যে, এ নগণ্য বস্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত তাকদীরকেও প্রতিহত করে, এ ধরনের বিশ্বাস ছোট শির্ক কিভাবে হতে পারে? (বরং তা বড় শির্ক) কেননা এ বিশ্বাসীর অন্তর সেগুলির সাথে সম্পৃক্ত এবং সেগুলিকে বিপদ-আপদ উদ্ধার ও তা প্রতিহত করার কারণ বলে মনে করে। এ ক্ষেত্রে এর সূত্র হল, শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত ক্রিয়াকারী কোন কারণই সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। অথবা এমন কোন বাস্তব প্রয়োগ কৃত স্পষ্ট কারণ হতে হবে যার মধ্যে কোনরূপ অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা নেই। যেমন, ডাক্তারী ঐষধ এমন কোন মাধ্যম যার উপকার বা ক্রিয়া প্রকাশ্য; যেমন: আগুন দ্বারা তাপ গ্রহণ, পানির দ্বারা ঠাণ্ডা বা অনুরূপ কিছু। এসব মাধ্যম প্রকাশ্য যার প্রভাবই স্পষ্ট। কখনো কখনো ব্যক্তির নিয়েতের ভিত্তিতে সব ধরণেরই ছোট শির্ক মহা শিরকে পরিণত হতে পারে। যেমন, বালা ও সূতা পরার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি সেটিকে মাধ্যম মনে না করে সরাসরি তাকেই ক্রিয়াকারী বিশ্বাস করে। অতএব এ অধ্যায় অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

[2] অর্থাৎ তোমরা স্বীকার করছ যে, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ্ এরপর আবার অন্য কিছুর ইবাদতে লিপ্ত হচ্ছো? কুরআন মাজীদের এরূপই নীতি যে, মুশরিকরা যে তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ

[নির্ধারিত] ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে, তারা কি তাঁর অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে?[1] (সূরা যুমার: ৩৮)

সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ "مَا هَذِهِ"؟ قَالَ مِنْ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ : انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا (مسند أحمد : ٤/٤٤٥ ومن ابن ماجة، الطب، باب تعليق التمائم، ح: ٣٥٣١)

"মহানবী (ﷺ) এক ব্যক্তির হাতে একটি পিতলের বালা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'এটা কি?' লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেলো। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না।" (*আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৩১; তবে, হাদীসটি যঈফ সনদে বর্ণিত। শায়খ আলবানী প্রমুখ এ হাদীসটিকে যঈফ প্রমাণ করেছেন। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীস আয্যঈফাহ, হা/১০২৯*)[2]

স্বীকৃতি দেয় কুরআন তাদের ঐ স্বীকৃতিকেই তাদের বিরুদ্ধে পেশ করে ইবাদতের তাওহীদকে সাব্যস্ত করে। যে তাওহীদকে তারা অস্বীকার করে থাকে। تدعون শব্দটিতে দু'আ দুই অর্থে ব্যবহৃত, প্রার্থনা মূলক ও ইবাদত মূলক। আর মুশরিকদের দু'আতে এ দু'প্রকারই বিদ্যমান। আল্লাহ্ ব্যতীত যাকে ডাকা হয় তারা বিভিন্ন ধরণের। তাদের মধ্যে কেউ নবী, রাসূল ও সৎ লোকদেরকে আহ্বান করে, কেউবা আল্লাহ্র ফেরেশ্তাকে, আবার কেউ তারকামণ্ডলীর দিকে ধাবিত হয়, কেউবা গাছ বা পাথরের প্রতি এবং অন্যরা মূর্তির প্রতি ধাবিত হয়।

[1] উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সব ধরণের বাতিল মা'বূদদের ক্ষতি ও উপকার সাধনের ক্ষমতাকে বাতিল সাব্যস্ত করেন। অতএব উক্ত ভ্রান্ত মা'বূদগুলী সম্পর্কে মুশরিকগণের বিশ্বাস যে আল্লাহ্র নিকট তাদের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, যার ফলে তারা তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে, তা বাতিল ও ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয়। সালফে সালেহীন ছোট শিরকের বিলোপ সাধনের জন্য বড় শিরকের ক্ষেত্রে বর্ণিত আয়াত পেশ করেন। কারণ উভয় শির্কই হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্কে স্থাপন করা। বড়টির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই যখন বাতিল বলে গণ্য হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো এ ক্ষমতা নেই যে, সে কারো কোন ক্ষতি করতে পারবে বা কোন উপকার সাধন করতে পারবে। অনুরূপ আল্লাহ্ কারো ক্ষতি করলে তার বিনা হুকুমে তা থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে উপকার করার ও ক্ষতি করার উপযুক্ত মনে করার এটিই অর্থ। যার কারণেই মুশরিকগণ বালা ও সূতা ব্যবহার করে থাকে।

[2] হাদীসে বর্ণিত ما هذا শব্দটি রাসূল (ﷺ)-এর দৃঢ় প্রতিবাদমূলক তাঁর (ﷺ)-এর বাণী, الواهنة এক ধরণের রোগ যা শরীরকে দুর্বল করে দেয়। অতপর নবী (ﷺ) বলেন, সেটিকে খুলে ফেল। এ ছিল তাঁর

উকবা বিন আমের (رضي الله عنه) থেকে একটি 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তাবীয় ঝুলানো সম্পর্কে বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ. (مسند أحمد : ١٥٤/٤)

'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।' *(মুসনাদ আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪; তবে, হাদীসটি যঈফ সনদে বর্ণিত। শায়খ আলবানী প্রমুখ এ হাদীসটিকে যঈফ প্রমাণ করেছেন। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীস আয্যঈফাহ, ১/৮১০)*[1]

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে-

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، (مسند أحمد ١٥٦/٤)

'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলাল সে শির্ক করল।' *(মুসনাদ আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬)*

ইবনে আবি হাতেম হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِيْ يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ (ذكره ابن كثير في التفسير : ٣٤٢/٤)

নির্দেশ, যদি এমন ব্যক্তি হয় যে তাকে নির্দেশ দিলে সে মেনে নিবে তবে তাকে মুখ দ্বারা নির্দেশ দেয়াই যথেষ্ট, হাত দ্বারা বারণ করার প্রয়োজন নেই। فإنك لا تزيدك إلا وهنا

'এ তোমার অসুস্থতা আরো বৃদ্ধিই করবে।' অর্থাৎ যদি তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী তার কোন প্রভাব থাকে তবে তা শুধু তোমার শরীরেই ক্ষতি সাধন করবে না বরং তার সাথে অন্তর-আত্মারও ক্ষতি সাধন করবে যার ফলে তোমার অন্তর ও আত্মা দুর্বল ও ব্যধিগ্রস্তই হয়ে পড়বে। এ হল প্রত্যেক মুশরিকের অবস্থা যে, (না বুঝার কারণে) ছোট ক্ষতি থেকে বড় ক্ষতিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে যদিও (তার নির্বুদ্ধিতার কারণে তা উপকার জ্ঞান করে থাকে। তাঁর বাণী, ﴿فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا﴾ অর্থ: 'যদি তোমার এ অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে কোনক্রমেই মুক্তি-পরিত্রাণ পাবে না।' যে পরিত্রাণকে অস্বীকার করা হয়েছে তা দুই প্রকারের হতে পারে, (ক) পূর্ণ পরিত্রাণ। আর তা হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। আর এ পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যারা মহা শির্ক করবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এ বিশ্বাস করবে যে, পিতলের বালা সূতা যা ঝুলানো হয় তা নিজে নিজেই উপকার সাধন করতে পারে। (খ) আংশিক পরিত্রাণ যখন মানুষ ছোট শিরকে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ ঐ বস্তুকে মুক্তির কারণ গ্রহণ করা আল্লাহ্ যা কারণ সাব্যস্ত করেননি। এ জন্য তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

[1] আরবী ভাষায় 'তামীমাহ' শব্দ এসেছে। চোখ লাগা অথবা ক্ষতি, হিংসা প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য যা কিছু বুকে ঝুলানো হয় তাই তামীমাহ বা তাবীয। **তামীমা-তাবীয এর নামকরণ:** এজন্য তামীমা বলা হয় যে, এর দ্বারা বিশ্বাস করা যে, তা কৃতকার্য পূর্ণ করবে। সুতরাং নবী (ﷺ) বদদু'আ করেন যেন তার দ্বারা কিছু পূর্ণ না হয়। 'ওয়াদ'আহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে এক প্রকারের ঝিনুক যা লোকেরা বুকে অথবা হাতে ঝুলায় অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য। এমন কর্মকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বদদু'আ করেন, যেন আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে আরাম, শান্তি ও স্থিরতায় থাকতে না দেন, কেননা সে আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে।

'জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সূতা বা তাগা পরিহিত অবস্থায় তিনি একজন লোককে দেখতে পেয়ে তিনি সে সূতা কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (يوسف: ١٠٦)

'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সত্ত্বেও মুশরিক।'[1]

(সূরা ইউসুফ: ১০৬) *(তাফসীর ইবনু কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. রিং (বালা) ও সূতা ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পরিধান করার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা।

২. স্বয়ং সাহাবীও যদি এসব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন তাহলে তিনিও সফলকাম হতে পারবেন না। এতে সাহাবায়ে কেরামের এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছোট শির্ক কবিরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক।

৩. এক্ষেত্রে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. 'ইহা তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না।'- এ কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রিং বা সূতা পরিধান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং অকল্যাণ আছে।

৫. যে ব্যক্তি উপরোক্ত কাজ করে তার কাজকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬. এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি (রোগ নিরাময়ের জন্য কোন কিছু [রিং সূতা] শরীরে লটকাবে তার কুফল তার উপরই বর্তাবে।

৭. এ কথাও সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করল সে মূলতঃ শির্ক করল।

৮. জ্বর নিরাময়ের জন্য সূতা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

---

[1] হাদীসে বর্ণিত من الحمى অর্থাৎ সে ব্যক্তি জ্বর দূর করার জন্য সূতা ঝুলিয়ে ছিল অথবা তা প্রতিহত করার জন্য। অতপর তিনি তা কেটে দেন তাঁর কেটে দেয়া প্রমাণ করে যে তা বড় অন্যায়। অতএব তা থেকে বাঁধা দেয়া ও কেটে ফেলা জরুরী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু তাওহীদে রুবূবিয়্যার স্বীকৃতি দিলেই মুক্তি পাওয়া যাবে না বরং ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রেও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ আয়াতটি হল মহা শিরকের দলীল। লেখক বলেন, সাহাবা (رضي الله عنهم) মহা শিরকের ব্যাপার অবতীর্ণ আয়াত সমূহের দ্বারা ছোট শির্কও উদ্দেশ্য করে থাকেন।

৯. সাহাবী হুযাইফা (رضي الله عنه) কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম শিরকে আসগরের দলিল হিসেবে ঐ আয়াতকেই পেশ করেছেন যে আয়াতে শিরকে আকবার বা বড় শিরকের কথা রয়েছে। যেমনটি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

১০. নজর বা চোখ লাগা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য শামুক, কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো বা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১১. যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করে তার উপর বদ দু'আ করা হয়েছে, 'আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন।' আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ (গলায় বা হাতে) লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।

অধ্যায়-৭

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয-কবজ প্রসঙ্গে[1]

আবু বাসীর আনসারী (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত,

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولاً أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلاَ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ (صحيح البخاري، الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ح:٣٠٠٥ وصحيح مسلم، اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ح:٢١١٥)

তিনি একবার রাসূল (ﷺ)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এ সফরে রাসূল (ﷺ) একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একজন দূত পাঠালেন। এর উদ্দেশ্য ছিল কোন উটের গলায় যেন ধনুকের কোন রজ্জু লটকানো না থাকে অথবা এ জাতীয় রুজ্জু যেন কেটে ফেলা হয়। *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১৫)*[2]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি,

---

[1] এ অধ্যায়ে ঝাড় ফুঁকের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ঝাড়ফুঁক হচ্ছে এমন সব দু'আ যা পড়ে ফুঁক দেয়া হয়। কোনটি শরীরে ক্রিয়া করে আবার কোনটি রূহে ক্রিয়া করে। কোনটি জায়েয আবার কোনটি শির্ক। শির্ক মুক্ত ঝাড়ফুঁক জায়েয। নবী (ﷺ) বলেন, 'যে ঝাড়ফুঁকে শির্ক নেই তাতে কোন দোষ নেই'। শির্কযুক্ত ঝাড়ফুঁকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নিকট আশ্রয় চাওয়া হয় অথবা ফরিয়াদ করা হয়। অথবা তাতে থাকে কোন শয়তানের নাম অথবা এ বিশ্বাস রাখা হয় যে, খোদ ঝাড়ফুঁকই ক্রিয়া করবে, তখন এ ধরনের ঝাড়ফুঁক নাজায়েয হবে ও তা শির্কী ঝাড়ফুঁকের অন্তর্ভূক্ত। আর তামীমা অর্থাৎ তাবীয থেকে উদ্দেশ্য হল, চামড়া, পুঁতি, লিখিত কিছু শব্দাবলী যা বিভিন্ন ধরণের বস্তু যেমনঃ ভালুকের অথবা হরিণের মাথা, ঘোড়ার ঘাড়, কাল কাপড়, চোখের আকৃতি বা তসবীর নির্ধারিত আকৃতির কিছু ঝুলানো ইত্যাদি। এসব তাবীযের অন্তর্ভূক্ত। মোটকথা, প্রত্যেক ঐ বস্তু যার ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, এটি কল্যাণও ভাল কাজের মাধ্যম-কারণ এবং অনিষ্ঠের প্রতিরোধক তাই হল তামীমা-তাবীয। আর শরীয়ত এরই অনুমতি দেয়নি। কতিপয় লোক বলে, এগুলি এমনি এমনি ঝুলাই তাতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই বা বলে থাকে তা গাড়িতে বা বাড়িতে শোভা-সৌন্দয্যের জন্য ঝুলান হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জেনে রাখা উচিত, তাবীয যদি কোন কিছু প্রতিরোধ বা দূর করার জন্য ঝুলান হয় আর বিশ্বাস করা হয় যে, তাবীয এ ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম বা কারণ তবে তা নিশ্চয়ই ছোট শির্ক। আর যদি তা শোভার জন্য ঝুলান হয় তবে হবে হারাম, কেননা যে এর মাধ্যম ছোট শির্ক করে তারই সাথে তার সদৃশ্য হয়ে যায়। আর নবী (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাতির সদৃশ্য ধারণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।'

[2] আরবের বিশ্বাস ছিল এ ধরণের হার জীব-জন্তুকে চোখ লাগানো থেকে রক্ষা করে তাই ওটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ (مسند أحمد :٣١٨/١ وسنن أبي داود، الطب، باب تعليق التمائم، ح:٣٨٨٣)

'নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও পরস্পর প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কিছু তৈরি করা শির্ক।" *(মুসনাদ আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮; সুনান আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৩৮৮৩)*[1]

আবদুল্লাহ বিন উকাইম (ﷺ) থেকে মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে,

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (مسند أحمد :٣١٠/٤، ٣١١ وجامع الترمذي، الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، ح:٢٠٧٢)

'যে ব্যক্তি কোন জিনিস [অর্থাৎ তাবিজ- কবজ] লটকায় সে উক্ত জিনিসের দিকেই সমর্পিত হয়'। [অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়][2]

(আহমদ, ৪/৩১০; জামি তিরমিযী, হাদীস নং ২০৭৬)

تمائم (তামায়েম) বা তাবীয হচ্ছে এমন জিনিস যা চোখ লাগা বা দৃষ্টি লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো হয়[3] ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের অংশ হয় তাহলে সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন।
আবার কেউ কেউ অনুমতি দেননি বরং এটাকে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য করতেন। ইবনে মাসউদ (রা.) এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন।[4]

---

[1] হাদীসে সকল প্রকার ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কিছু তৈরি শির্ক বলে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে শির্কমুক্ত ঝাড়ফুঁক জায়েয। কেননা হাদীসে আছে, 'শির্ক না হওয়া পর্যন্ত ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই।' এ ছাড়া মহানবী (ﷺ) ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁকেও ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে। অতএব দলীলে প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক প্রকার ঝাড়ফুঁক শির্ক নয় এবং কতক ধরণের, আর তা হল যেগুলি শির্কমুক্ত। অপরদিকে সকল প্রকার তাবীয তাগা ও যাদু নিষিদ্ধ। التولة শায়খ তেওয়ালার ব্যাখ্যা দেন যে, নিশ্চয়ই এটি এমন জিনিস যা তারা তৈরি করে এবং ধারণা করে থাকে যে, এটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের ভালবাসা সৃষ্টি করে। অতএব এটি যাদুর এক প্রকার। সাধারণ লোকে একে মন ফিরান ও মন গলিয়ে দেয়া নামে অভিহিত করে। প্রকৃতপক্ষে তা তাবীয-কবজের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তা বিশেষ পন্থায় তৈরি করে যাদুকরই তাতে শিরকি মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয়। যার ফলে তাদের ধারণা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসতে থাকে। তাই এটি এক ধরণের যাদু, আর যাদু হল আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক ও কুফরী।

[2] সকল প্রকার তাবীয নিষিদ্ধ, যে ব্যক্তি তাবীযকে হালাল করার জন্য কোন ফুঁক ফোকর খুঁজবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বান্দা যদি স্বীয় অন্তর থেকে সমস্ত কিছুর ভরসাকে বের করে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে তবে তার আনন্দ, মুক্তি ও সফলতা রয়েছে।

[3] কল্যাণ আনার জন্য এবং তা অকল্যাণ দূর করার জন্য যা কিছুই ঝুলানো হবে তাই তাবীযের অন্তর্ভূক্ত।

[4] দলীল দ্বারা প্রমাণও রয়েছে যে, সকল প্রকার তাবীযই নিষিদ্ধ, তবে যে ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশ ঝুলাল সে শিরকে লিপ্ত নয়। কেননা সে আল্লাহ্‌রই গুণের-সিফতের অংশ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম ঝুলিয়েছে, সুতরাং সে তার অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য কোন মাখলুককে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেনি।

আর رقى বা ঝাড়-ফুঁককে عزائم নামে অভিহিত করা হয়। যে সব ঝাড়-ফুঁক শির্ক মুক্ত তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

تولة এমন জিনিস যা কবিরাজদের বানানো। তারা দাবি করে যে, এ জিনিস [কবজ] দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ভালোবাসা আর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর ভালোবাসার উদ্রেক হয়। সাহাবী রুআইফি (رضي الله عنه) থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি [রুআইফি] বলেছেন,

يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَ الْحَيَاةَ تَطُوْلُ بِكَ، فَأَخْبِرَ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجِىْ بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيْءٌ مِنْهُ، (مسند أحمد : ٤/١٠٩،١٠٨ وسنن أبي داود، الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ح:٣٦)

'রাসূল (ﷺ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে রুআইফি, তোমার হায়াত সম্ভবত দীর্ঘ হবে। তুমি লোকজনকে জানিয়ে দিও, 'যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দেবে, অথবা গলায় তাবিজ- কবজ ঝুলাবে অথবা পশুর মল কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জিম্মাদারী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।' *(মুসনাদ আহমাদ, ৪/১০৭, ১০৯; সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৬)*[1]

সাঈদ বিন জুবাইর (رحمه الله) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِّنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ . (المصنف لابن أبي شيبة ح :٣٥٢٤)

'যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ- কবজ ছিড়ে ফেলবে বা কেটে ফেলবে সে ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করার মত কাজ করল।'

(ওয়াকী এটি বর্ণনা করেছেন; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৫২৪)[2]

---

[1] নিছক হার ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়, বরং যে হার অনিষ্টতা দূর করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয় সেটি শির্ক বিধায় নিষিদ্ধ। 'মুহাম্মদ (ﷺ) তার থেকে মুক্ত' বাক্যটি প্রমাণ করছে যে, উক্ত কাজটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

[2] এতে তাবীয কাটার ফযীলত বর্ণনা হয়েছে কেননা তাবীয ঝুলানো বা বাঁধা আল্লাহ্‌র সাথে ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত। আর ছোট শিরকের ব্যাপারে হুশিয়ারী এসেছে যে, সে জাহান্নামে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের গলা থেকে তাবিজ কাটল সে যেন তার গলাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করল। কেননা এ

ইব্রাহীম ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন,

كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ . (المصنف لابن أبي شيبة ح ٣٥١٨)

'সাহাবায়ে কিরাম সব ধরনের তাবীজ-কবজ অপছন্দ করতেন, চাই তার উৎস কুরআন হোক বা অন্য কিছু হোক। (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৫১৮)[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের ব্যাখ্যা।
২. (تولة) 'তাওলাহ' এর ব্যাখ্যা।
৩. কোন পার্থক্য ছাড়াই শরীয়ত সম্মত নয় এমন ঝাড়ফুঁক, তাবীয ও তাগা উপরোক্ত তিনটিই শিরকের অন্তর্ভূক্ত।
৪. সত্যবাণী তথা কুরআনের সাহায্যে [চোখের] দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়–ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।
৫. তাবীয-কবজ কুরআন থেকে হলে তা শির্ক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।
৬. চোখ লাগা (খারাপ দৃষ্টি) থেকে জীব-জন্তুকে রক্ষা করার জন্য রশি বা অন্য কিছু ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভূক্ত।
৭. যে ব্যক্তি ধনুকের রজ্জু গলায় ঝুলায় তার উপর কঠিন অভিসম্পাত।
৮. কোন মানুষের তাবিজ- কবজ ছিড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফজিলত।
৯. ইব্রাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এখানে আসহাব বলতে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (رضي الله عنه)-এর সহচরবৃন্দ উদ্দেশ্য।

জঘন্য কাজের জন্য সে জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সে তাবীয কেটে তার গলাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিল, অতএব তাকেও অনুরূপ প্রতিদান দিবে, তার গলাকেও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করা হবে। আমল যে ধরনের সওয়াবও সে ধরণেরই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানের গলাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবে, সে একটি গোলাম আযাদের সওয়াব পাবে।

[1] অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه)-এর সঙ্গীগণ সকর প্রকার তাবীযকে অপছন্দ করতেন।

অধ্যায়-৮

যে ব্যক্তি কোন গাছ, পাথর প্রভৃতির দ্বারা বরকত অর্জন করতে চায়[1]

---

[1] এমন ধরণের কাজের বিধান কি? উত্তরঃ বরকত হচ্ছে কল্যাণের আধিক্য, স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্ন হওয়া। কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত হল একমাত্র আল্লাহ্ই বরকত দিয়ে থাকেন। আর সৃষ্টির মধ্যে একে অপরকে বরকত দিতে পারে না। আল্লাহ্র বাণী : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ অর্থ: 'বরকতময় ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেন।' (সূরা ফুরকানঃ ১) অর্থাৎ ঐ সত্তার কল্যাণসমূহ সুমহান প্রচুর ও স্থায়ী যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেন। তিনি আরো বলেন, ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ অর্থ: 'আমি ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করেছি।' (সূরা সফ্ফাতঃ ১১৩) তিনি আরো বলেন. ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ (ঈসা ﷺ বলেন :) ('আর আল্লাহ্ আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন।' (সূরা মারইয়ামঃ ৩১) সুতরাং বরকত দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ই। অতএব কোন সৃষ্টির জন্য এ কথা বলা বৈধ হবে না যে, আমি অমুক বস্তুতে বরকত দিয়েছি। অথবা আমি তোমাদের কাজকে বরকতময় করব অথবা তোমাদের আগমন বরকতময়; যেহেতু কল্যাণের আধিক্য, স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্ন হওয়া তাঁরই পক্ষ থেকে যাঁর হাতে সমস্ত কিছুর ইখতিয়ার। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ বস্তুর মধ্যে যে বরকত দিয়েছেন তা হয় স্থান অথবা সময়ের মধ্যে বা মানুষের মধ্যে।

প্রথম প্রকারঃ যেমন- বায়তুল্লাহ্ শরীফ, বায়তুল মুকাদ্দাস ইত্যাদি। এ সকল স্থানে অফুরন্ত ও স্থায়ী কল্যাণ আছে। এর অর্থ এই নয় যে, এগুলোর মাটি ও দেয়াল অর্জন করতে হবে। এমনিভাবে হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথরও একটি বরকতমণ্ডিত পাথর। যে ব্যক্তি এটি ইবাদতমূলক এবং অনুসরণ মূলক চুম্বন করবে সে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের বরকত লাভ করবে। ওমর (رضي الله عنه) কালো পাথর চুম্বন দেয়ার সময় বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর উপকারও করতে পারবে না, অনিষ্টও করতে পারবে না। তাঁর বাণী 'তুমি উপকার করতে পারবে না অনিষ্টও না।' অর্থাৎ না তুমি কারো উপকার বয়ে আনতে পার আর না কারো অনিষ্টের কোন কিছু প্রতিহত করতে পার। অপরদিকে স্থানের বরকতের উদাহরণ হল রামযান মাস ও আল্লাহ্র মহিমান্বিত কতগুলি দিবস। এ সকল দিন ও স্থানের নিজস্ব কোন বরকত নেই; রবং বরকত রয়েছে এগুলোর ইবাদত ও বন্দেগীতে ও ফযীলত, যা অন্য সময়ে নেই।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মানুষের মধ্যে বরকত। আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও রাসূলগণের ব্যক্তি সত্তায় বরকত নিহিত করেছেন। অর্থাৎ তাদের দেহ বরকতমণ্ডিত। হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম মহানবীর থুথু ও চুল থেকে বরকত নিতেন। এটি শুধু নবীদের জন্য নির্দিষ্ট। সাহাবীদের ক্ষেত্রে এমন কোন দলীল পাওয়া যায়নি যে, তাদের থেকে মুসলমানেরা বরকত নিতেন। সাহাবী ও তাবেঈগণ খলীফা থেকে এ ধরণের কোন বরকত নিতেন না, এমন কি নবীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর থেকেও অন্য সাহাবীরা বরকত নিতেন না। অতএব তাদের থেকে বরকতের ধরণ হল আমলের বরকত সত্তার বরকত নয়, যে বরকত নবী ﷺ থেকে নেয়া হত। অতএব আমরা বলব প্রত্যেক মুসলমানেরই বরকত রয়েছে কিন্তু তা সত্তার বরকত নয় বরং তাদের আমলের বরকত, তাদের ইসলাম, ঈমান, ইয়াকীন ও নবীর অনুসরণের বরকত ও সৎব্যক্তিদের অনুসরণ, আলেমদের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ ও তাদের ইলম থেকে উপকৃত হওয়া ইত্যাদি। তবে তাদের স্পর্শ করে তাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে বরকত না জায়েয। মুশরিকগণ তাদের ভ্রান্ত মা'বূদদের সাথে সম্পর্কে গড়ে বহু কল্যাণ ও তার স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছন্নতা কামনা করে। তাদের রয়েছে বরকত গ্রহণের বহুমুখী পন্থা,

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾

'তোমরা কি লাত ও উয্যা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? আর তৃতীয় আরেকটি মানাৎ সম্পর্কে? (এ সব অক্ষম, বাকশক্তিহীন, হটা-নড়ার শক্তিহীন মূর্তিগুলোর পূজা করা কতটা যুক্তিযুক্ত)"[1] (সূরা নাজমঃ ১৯)

আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে হুনাইনের [যুদ্ধের] উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি [নও মুসলিম]। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি

যার সবগুলিই শির্কী বরকত গ্রহণ পন্থা। অনুরূপ গাছ-পালা, পাথর, বিভিন্ন স্থান, নির্ধারিত গুহা, কবর, পানির ঝর্ণা অথবা অন্য যে সব বস্তুতে অজ্ঞ লোকের বরকতের বিশ্বাস রাখে ও বরকতময় মনে করে তা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। গাছ-পালা, পাথর কবর অথবা বিভিন্ন স্থান থেকে বরকত গ্রহণ মহা শিরকের অন্তর্ভূক্ত, যদি স্পর্শ বা সেখানে গড়াগড়ি দেয়া বা সেগুলির সাথে জড়াজড়ি করা হয়, তবে তা আল্লাহ্র নিকট তার জন্য মধ্যস্থতা করবে। আর যদি তাতে এও বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, তা আল্লাহ্র নৈকট্যের উসীলা তবেও তা আল্লাহ্র সাথে শরীক বানিয়ে নেয়া এবং মহা শির্ক। জাহেলী যুগের লোকেরা যে সব বৃক্ষ ও পাথরের তারা ইবাদত করত সেগুলির এবং যে সব কবর থেকে তারা বরকত নিত সেক্ষেত্রে এ ধরণেরই ধারণা রাখত। তারা বিশ্বাস করত যে, নিশ্চয়ই তারা যদি সেখানে আস্তানা গাড়ে অবস্থান নেয় ও তার সাথে জড়াজড়ি করে বা তার উপর ধূলা-বালি ছিটিয়ে দেয়, তবে নিশ্চয়ই এ স্থান বা এ স্থানে যে রয়েছে বা যার আত্মা সেখানে সন্নিবেশিত সে তার জন্য মধ্যস্থতা করবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

অর্থাৎ 'যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে (তারা বলে) আমরা তাদের ইবাদত শুধু এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট করে দিবে।' (সূরা যুমারঃ ৩) আর উক্ত বরকত গ্রহণ ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত, মনে করুন যদি কেউ কবরের মাটি এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে বা ছিটায় যে নিশ্চয়ই তা বরকতময়; অতএব যদি তা শরীলে মাখে তবে তার শরীরও নিশ্চয়ই তার কারণে বরকতময় হবে। তবে তা ছোট শির্ক হবে। কেননা শরীয়ত যাকে বরকতের কারণ সাব্যস্ত করেনি সে তা কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছে। গাছ, পাথর, কবর অথবা কোন স্থানের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা বড় শির্ক।

[1] 'লাত' হচ্ছে একটি সাদা পাথর যা তায়েফবাসীর নিকট ছিল। মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে ওটি ধ্বংস করে দেয়া হয়। 'ওয্যা' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানের একটি গাছ যেখানে সৌধ নির্মাণ করা হয়। মক্কা বিজয়ের পর এটি কেটে ফেলা হয়। এখানে ছিল একজন মহিলা জ্যোতিষী যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য জ্বিন হাযির করত। তাকেও হত্যা করা হয়। ﴿وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ অর্থঃ 'এবং তোমরা কি তৃতীয় অন্য একটি জঘন্য দেবীর প্রতি লক্ষ্য করেছ।' (সূরা নাজমঃ ২০) 'মানাত' এটিও মুশরিকদের একটি দেবী। তাকে মানাত নামে অভিহিত করার কারণ হল, তার সম্মানে সেখানে বেশি বেশি পশু জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করা হত। যার জন্য মানাত বলা হয়। আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে উক্ত আয়াতের সামঞ্জস্য লাভ ও মানাত হল দু'টি পাথর ও ওয্যা হল একটি বৃক্ষ। মুশরিকগণ এ তিনটির নিকট যা কিছু করত ঠিক ঐ ধরণের কর্মকাণ্ড তার পরবর্তী যুগের মুশরিকগণও পাথর, বৃক্ষ, গুহার নিকট যেয়ে থাকে। আর এর মধ্যে আরো মারাত্মক হল, কবরকে মা'বূদ বানিয়ে সেখানে ইবাদত ও তার অভিমূখী হওয়া।

কুলগাছ[1] ছিল যার চারপাশে তারা বসত এবং তাদের সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা ذات أنواط [যাত আনওয়াত] বলত। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ 'যাতু আনওয়াত' [অর্থাৎ একটি গাছ] নির্ধারণ করে দিন।[2] তখন আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন,

---

[1] নির্দিষ্ট গাছটি সম্পর্কে মুশরিকদের তিনটি আকিদা-বিশ্বাস ছিল, (ক) তারা এটিকে সম্মান করত। (খ) তারা এখানে ভক্তির সাথে নৈকট্য লাভের আশায় অবস্থান করত। (গ) ঐ গাছ তাদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। এ আশা পোষণ করত যে, গাছটি থেকে অস্ত্রে বরকত চলে আসবে, যার ফলে তা অতি ধারাল হবে ও তার ব্যবহার কারীর জন্য অতি কল্যাণময় হবে তাদের এ কাজ ছিল মহা শির্ক, কেননা তাদের মধ্যে উক্ত তিনটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল।

[2] সাহাবাদের মধ্যে যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিল তারা বলেছিল, يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط তারা ধারণা করেছিল যে, নিশ্চয়ই এটি শিরকের অন্তর্ভূক্ত হবে না এবং কালেমায়ে তাওহীদের দ্বারা ঐ কর্মের নাকচ হয় না, এ জন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, কখনো কখনো কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকটও কিছু কিছু শিরকের বিষয় গোপন থেকে যায়। যেমন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতিপয় আরবী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলামে দীক্ষিত হন তাদের নিকটও ইবাদতের তাওহীদের এসব প্রকার অস্পষ্ট ছিল। হাদীসে বর্ণিত সাহাবাদের উক্ত আকাঙ্ক্ষার জবাবে বলেন, আল্লাহু আকবার! নিশ্চয়ই এটিই ভ্রান্ত পথ। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ঐ ধরণের কথাই বললে যা বনী ইসরাঈল মূসা (আঃ)-কে বলেছিল, (হে মূসা) যেমন তাদের মা'বূদ রয়েছে আমাদের জন্যও অনুরূপ মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন।' নবী ﷺ সতর্কতা স্বরূপ তাদের আকাঙ্খাকে মূসা (আঃ)-এর জাতির আকাঙ্খার সাথে তুলনা করেন যে আকাঙ্খা তারা মূর্তিপূজারীদেরকে দেখে তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট করেছিল যে, তাদের মত আমাদেরও এক মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন। উক্ত সাহাবীগণ তাঁদের আকাঙ্খাকে বাস্তবায়ন করেন নি বরং যখন নবী ﷺ তাঁদেরকে এ থেকে বাধা দেন তাঁরা বিরত হয়ে যান, পক্ষান্তরে তাঁরা তা বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই তা বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত হত। কিন্তু তাঁরা যেহেতু শুধু মৌখিকভাবে চেয়েছিলেন, কার্যে বাস্তবায়ন করেননি, তাই তাঁদের এ কথা ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কেননা তাদের এ চাওয়াতে গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্কের বহিপ্রকাশ ঘটে। এ কারণে নবী ﷺ তাদেরকে নতুন করে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেননি। এর মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে মহা শিরকে মুশরিকগণ নিমজ্জিত ছিল তা শুধু জাতে আনওয়াত থেকে বরকত নেয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সেখানে সম্মান প্রদর্শন, সেখানে অবস্থান ও ইতিকাফ এবং অস্ত্র ঝুলিয়ে বরকত গ্রহণও অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে যখন কোন বৃক্ষ অথবা পাথর অথবা অন্যান্য বস্তু থেকে বরকত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি এ বিশ্বাস অন্তর্ভূক্ত থাকে যে, এ বস্তু আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম এবং তার নিকট তার অভাব তুলে ধরে অথবা সেখানে থেকে বরকত গ্রহণ করলে অভাব প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার আরো বেশি আশা থাকে তবে এটি হবে মহা শির্ক। এ ধরণের কাজ করে থাকত জাহেলী যুগের লোকেরা।

বর্তমান যুগের কবর-মাজার পূজারী ও নানা কুসংস্কারবাদীদের কৃতকর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পূর্বের যুগের কাফের ও মুশরিকগণ লা'ত, উয্যা ও যাতে আনওয়াতে যা যা করত এবং তাদের ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস রাখত বর্তমানের এরা কবর-মাজারেও ঠিক ঐ ধরণের কর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে এবং ঐ ধরণেরই বিশ্বাস রাখে। বরং কবর-মাজারের লোহার গ্রিলগুলোর প্রতিও অনুরূপ বিশ্বাস রাখে। যে সব দেশে শির্ক ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানের বিভিন্ন আস্তানায় দেখা যায় যে, লোকেরা মাজারের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলোকে

"اللهُ أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السُّنَنُ ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ : ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف : ١٣٨] لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" (جامع الترمذي، الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، ح:٢١٨٠ ومسند أحمد :٥/٢١٨)

'আল্লাহু আকবার, তোমাদের এ দাবীটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথাই বলেছ যা বনী ইসরাইল মুসা ﷺ কে বলেছিল। তারা বলেছিল,

﴿اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾

অর্থ: 'হে মুসা, মুশরিকদের যেমন মা'বুদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা'বুদ বানিয়ে দাও। মুসা (ﷺ) বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথা বার্তা বলছ।'

(সূরা আ'রাফ : ১২৮)

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছ। *(জামি' তিরমিযী, হাদীস নং ২১৮; মুসনাদ আহমাদ, ৫/২১৮; তিরমিযী এ হাদীসটিকে বর্ণনা করে এটাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।)*

যখন স্পর্শ করে তখন তারা মনে করে যে, তারা যেন দাফনকৃত ব্যক্তিকেই স্পর্শ করছে। অতএব তারা যেহেতু তার সম্মান করেছে তাই সে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করবে। আর এ ধরণের বিশ্বাস হল আল্লাহ্‌র সাথে মহা শিরক। কেননা, সে উপকার গ্রহণ ও অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়েছে এবং তাকে সে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছে। যেমন, পূর্বের লোকেরা করেছিল যারা বলেছিল : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾

'আমরা তো তাদের ইবাদত শুধু এই জন্যই করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট করে দিবে।' (সূরা যুমার: ৩)

আরো একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ব্যাপারে ইতোপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে, কতিপয় লোক কোন কোন জায়গায় স্পর্শ করা নৈকট্য অর্জনের কারণ জ্ঞান করে থাকে, যেমন, কতিপয় অজ্ঞ লোককে দেখা যায়, সে হারাম শরীফ আসে এবং হারামের বাইরের দরজাগুলো বা দেয়ালের কোন অংশ বা কোন পিলার (স্তম্ভ) বরকতের জন্য স্পর্শ করছে, তার বিশ্বাস যদি হয় যে, এ খুঁটির আত্মা রয়েছে অথবা সেখানে কোন লোক দাফনকৃত রয়েছে অথবা কোন পবিত্র আত্মা এ সবের খেদমত করে থাকে এজন্য সে তা স্পর্শ করে তবে তা মহা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। পক্ষান্তরে সে যদি এ বিশ্বাসে স্পর্শ করে যে, এ জায়গা হল বরকতময়, আর তা রোগ মুক্তির কারণ হতে পারে তবে তা ছোট শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরায়ে নাজমের আয়াত ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾-এর তাফসীর।

২. সাহাবায়ে কেরামের কাংখিত বিষয়টির পরিচয়।

৩. প্রকৃত প্রস্তাবে তারা [সাহাবায়ে কিরাম] এ কাজ [শির্ক] করেন নি।

৪. তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা [কাংখিত বিষয়টি] পছন্দ করেন।

৫. সাহাবায়ে কেরামই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশি অজ্ঞ থাকবে।

৬. সাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক সওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭. মহানবী ﷺ তাঁদের ওযর গ্রহণ করেননি বরং তাদের উক্তির প্রতিবাদ করেছেন, 'আল্লাহু আকবার, নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছ।'-এ কথার মাধ্যমে। উপরোক্ত তিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'উদ্দেশ্য'। এখানে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের দাবি মূলতঃ মুসা عليه السلام এর কাছে বনী ইসরাইলের মা'বুদ বানিয়ে দেয়ার দাবীরই অনুরূপ ছিল।

৯. রাসূল ﷺ কর্তৃক না সূচক জবাবের মধ্যেই তাঁদের জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মর্মার্থ অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

১০. রাসূল ﷺ বিষয়টির ওপর কসম করে এটার অধিক গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন, আর তিনি কোন বিশেষ কল্যাণ ব্যতীত কসম করতেন না।

১১. শিরকের স্তরের মধ্যে রয়েছে বড় (আকবার) ও ছোট (আসগার), কারণ তারা এর ফলে মুরতাদ হয়ে যায় নি। [ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যান নি]

১২. 'আমরা কুফরি যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম' [অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি] এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩. আশ্চর্যজনক ব্যাপারে যারা 'আল্লাহু আকবার' বলা পছন্দ করে না, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটা দলিল।

১৪. ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কাজের পথ রুদ্ধ করে দেয়া।

১৫. জাহেলী যুগের লোকদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যশীল করার নিষেধাজ্ঞা।
১৬. শিক্ষা দেয়ার সময় প্রয়োজন বোধে রাগান্বিত হওয়া।
১৭. 'এটা পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি'-এ বাণী একটা চিরন্তন নীতি।
১৮. মহানবী ﷺ-এর একটা অন্যতম মুজিযা [নবুয়তের নিদর্শন]। কারণ, তিনি যেমনটি বলেছিলেন তেমনটিই ঘটেছিল।
১৯. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি ও খৃষ্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যে দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন। [অর্থাৎ তারা যে দোষে দোষী, তা আমাদের মধ্যে বিরাজ করলে আমরাও দোষী বলে গণ্য হব।]
২০. তাদের [আহলে কিতাবের] কাছে এ কথা স্বীকৃত যে, ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে [আল্লাহ কিংবা রাসুলের] নির্দেশ। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। من ربك [তোমার রব কে?] দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। [অর্থাৎ আল্লাহ শির্ক করার নির্দেশ না দেয়া সত্বেও তুমি শির্ক করেছ। তাহলে তোমার রব কে যার হুকুমে শির্ক করেছ?]। من نبيك [তোমার নবী কে] এটা নবী কর্তৃক গায়েবের খবর [অর্থাৎ কবরে কি প্রশ্ন করা হবে এ কথা নবী ছাড়া কেউ বলতে পারে না। এখানে এ কথার দ্বারা বুঝানো হচ্ছে, কে তোমার নবী? তিনি তো শির্ক করার কথা বলেননি। তারপর ও তুমি শির্ক করেছ। তাহলে তোমার শির্ক করার নির্দেশ দাতা নবী কে?] ما دينك [তোমার দীন কি] এ কথা তাদের اجعل لنا آلهة [আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন] এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। [অর্থাৎ তোমার দ্বীন তো শির্ক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে শিরকের নির্দেশ দান কারী দ্বীন কি?]
২১. মুশরিকদের রীতি-নীতির মত আহলে কিতাবের [অর্থাৎ আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের] রীতি-নীতিও দোষনীয়।
২২. যে বাতিল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তা পরিবর্তনকারী একজন নওমুসলিমের অন্তর পূর্বের সে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ونحن حدثاء عهد بكفر [আমরা কুফরি যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম] সাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

অধ্যায়-৯

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা[1]

---

[1] আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী এসেছে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা। জবাই করার অর্থ হল, 'রক্ত প্রবাহিত করা।' জবাই করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ: কার নামে জবাই করা হচ্ছে এবং কি উদ্দেশ্যে জবাই করা হচ্ছে। জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে তার অর্থ হয়, আমি আল্লাহ্র নামে, সাহায্যে ও তাঁর বরকত কামনা করে জবাই করছি। জবাই করার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল ইবাদতধর্মী দিক। এ সকল বিবেচনার এর চারটি অবস্থা হল,

প্রথমত: কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই নামে জবেহ করা। এটিই হচ্ছে তাওহীদ, এটিই হচ্ছে ইবাদত। অতএব জবাইয়ের সময় দু'টি শর্ত জরুরী, (১) আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করবে, (২) আল্লাহ্র নাম নিয়ে জবাই করবে। যেমন: কুরবানীর পশু, হজ্জে জবাইকৃত পশু, আকীকা ইত্যাদি। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জবাইয়ের সময় আল্লাহ্র নাম না নেয়, তবে তা হালাল হবে না। আর যদি জবাইকৃত পশু দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য উদ্দেশ্য না থাকে এবং অন্য কারো উদ্দেশ্যও না থাকে বরং তা মেহমানদারী বা তা নিজে খাবে এজন্য যদি জবাই করে থাকে, তবে জায়েয হবে, এতে শরীয়তের অনুমতির রয়েছে। কেননা সে আল্লাহ্র নাম নিয়ে জবাই করেছে ও অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করেনি। অতএব তা আল্লাহ্র হুঁশিয়ারী ও নিষেধের আওতাভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্র নামে জবাই করা এবং কবরবাসীর নৈকট্য লাভের আশা করা। এটি শিরক যেমন, সে বলে 'বিসমিল্লাহ' আমি আল্লাহ্র নামে জবাই করছি। এবং সে জবাই করে রক্ত প্রবাহিত করে; কিন্তু এর দ্বারা তার নিয়ত হল দাফনকৃত কোন নবী বা সৎব্যক্তির নৈকট্য অর্জন করা। সুতরাং যদিও সে আল্লাহ্র নামে জবাই করেছে, তবুও এক দিক দিয়ে তা শিরকের পর্যায়ে পৌছে গেছে। কেননা সে দাফনকৃত ব্যক্তির সম্মানেই রক্ত প্রবাহিত করেছে আল্লাহ্র জন্য নয়। কোন কোন গ্রাম বা শহরে দেখা যায় যে, তারা যদি কোন আগন্তুকের সম্মান প্রদর্শন করতে চায় তবে তার চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উট বা অন্য কোন প্রাণীর দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার সন্তুষ্টির জন্য তা জবাই করে ও তার আগমনের সময় রক্ত প্রবাহিত করে। এ জবাইতে যদিও আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয়; কিন্তু যেহেতু তার দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য থাকে, এজন্য উলামায়ে কেরাম উক্ত কাজকে হারাম ফতোয়া দিয়েছেন। কেননা তাতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং তা খাওয়াও জায়েয নয়। যেহেতু জীবিত কারো সম্মানে জবাই করা ও রক্ত প্রবাহিত করা জায়েয নেই অতএব, কোন মৃত (নবী-ওলী) ব্যক্তির সম্মানে জাবাই করা তো অবশ্যই হারাম হবে। কেননা রক্ত প্রবাহিত করে শুধু এক আল্লাহ্রই সম্মান করা যেতে পারে। কেননা তিনিই রগ-শিরা-উপশিয়ায় রক্ত চলাচল করান। অতএব এর মাধ্যমে ইবাদত ও সম্মান তাঁরই প্রাপ্য।

তৃতীয়ত: আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করা এবং অন্যের নৈকট্যের আশা করে। এটি উভয় দিক থেকেই শিরক। যেমন: কেউ বলে, 'মসীহের নামে' আর এ কথা বলে সে তার হাত জবাইয়ের জন্য চালিয়ে দিল এবং তার দ্বারা মসীহের নৈকট্য ও উদ্দেশ্য করল। এটি দুই দিক দিয়েই মহা শিরক, সাহায্য প্রার্থনার ও ইবাদতের শিরক। অনুরূপ কেউ যদি জিলানী, বাদভী, হুসাইন, যয়নব, খাজা ইত্যাদীর নামে জবাই করে। সাধারণত যাদের দিকে কতিপয় মানুষ ধাবিত হয় তারও বিধান একই। কেননা তাদের নামে জবাই করার সময় তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য তাদের নৈকট্য অর্জন হয়ে থাকে। এজন্য উক্ত দুভাবেই এক্ষেত্রে শিরক হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (الأنعام: ١٦٢-١٦٣)

"আপনি বলুন, 'আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ [সবই] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরিক নেই'[1] (সূরা আন'আম: ১৬২)

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেন-

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر:٢)

'অতএব, আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।'[2] (সূরা কাউসার: ২)

আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'রাসূল (ﷺ) চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ (صحيح مسلم، الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالي ولعن فاعله، ح:١٩٧٨)

চতুর্থত: আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করে তা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য উৎসর্গ করা যা অতি বিরল। তবে কখনো এরূপ হয় যে, কোন ওলির নামে জবাই করে তার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করা হয়। এ ধরণের কার্যকলাপই প্রকৃত পক্ষে সাহায্য প্রার্থনা ও ইবাদতের শির্ক হয়ে থাকে। ফলকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই ইবাদতের শির্ক এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে পশু জবাই সাহায্য প্রার্থনায় শির্ক হয়ে থাকে। আর এ জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾

অর্থ: 'আর যে জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা তোমারা ভক্ষণ করো না, কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শয়তানেররা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে থাকে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে, যদি তোমরা তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে আনুগত্য কর, তবে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।' (সূরা আন'আমঃ ১২১)

[1] আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, জবাই করা ও সলাত পড়া দু'টি ইবাদত। আর তা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই।

[2] আল্লাহ্র যে কোন নির্দেশই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ইবাদত এমন একটি ব্যাপক নাম যাতে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয় সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত। অতএব আল্লাহ্ যেহেতু সলাতের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তা তাঁর নিকট প্রিয়। অনুরূপ জবাই করার যেহেতু নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং তা প্রিয় ও ইবাদত।

(ক) لعن الله من ذبح لغير الله

'যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত।'

(খ) لعن الله من لعن والديه

'যে ব্যক্তি নিজ পিতা- মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত।'

(গ) لعن الله من آوى محدثا

'যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত।'

(ঘ) لعن الله من غير منار الأرض

'যে ব্যক্তি জমির সীমানা [চিহ্ন] পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত।'[1]

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮)

তারিক বিন শিহাব কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِيْ ذُبَابٍ، قَالُوْا : وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوْزُهُ أَحَدٌ حَتّٰى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوْا لأَحَدِهِمَا : قَرِّبْ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِيْ شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوْا لَهُ : قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوْا لِلآخَرِ : قَرِّبْ، قَالَ : مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ،

(أخرجه أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية : ٢٠٣/١ كلاهما موقوفا على سلمان الفارسي)

"এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনটি কিভাবে হলো?' তিনি বললেন, 'দু'জন লোক এমন একটি

---

[1] উক্ত হাদীসটি আলোকপাতের উদ্দেশ্য হল, (রাসূল ﷺ-এর বাণী) 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নামে জবাই করে আল্লাহ্ তাকে অভিশাপ দেন।' অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন ও অন্যের নৈকট্য অর্জনের জন্য তার প্রতি অভিশাপ। লা'নতের অর্থঃ আল্লাহ্র রহমত থেকে বিতাড়িত করা। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর স্বয়ং আল্লাহ্ লা'নত-অভিশাপ করেন, তাকে তিনি স্বীয় বিশেষ রহমত থেকে বিতাড়িত করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র আ'ম-ব্যাপক রহমত মুসলমান, কাফের সবার মধ্যে পরিব্যপ্ত। জেনে রাখা উচিত, যে পাপের সাথে অভিশাপের হুঁশিয়ারী জড়িত তা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নৈকট্য অর্জন ও সম্মানের উদ্দেশ্যে যেহেতু জবাই করা শির্ক এ জন্য শিরকে পতিত ব্যক্তি আল্লাহ্র অভিশাপ ও হুঁশিয়ারী ও তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ারই উপযুক্ত।

কওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল যার জন্য একটি মূর্তি নির্ধারিত ছিল। উক্ত মূর্তিকে কোন কিছু নযরানা বা উপহার না দিয়ে কেউ সে স্থান অতিক্রম করত না। উক্ত কওমের লোকেরা দু'জনের একজনকে বলল, 'মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ করো'। সে বলল, 'নযরানা দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই' তারা বলল, 'অন্তত একটা মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও'। অতঃপর সে একটা মাছি মূর্তিকে উপহার দিল। তারাও লোকটির পথ ছেড়ে দিল। এর ফলে মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেল। অপর ব্যক্তিকে তারা বলল, 'মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও। সে বলল, 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেই না' এর ফলে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। [শির্ক থেকে বিরত থাকার কারণে] মৃত্যুর পর সে জান্নাতে প্রবেশ করল।"

(মুসনাদ আহমাদ, ১/২০৩)[1]

---

[1] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিশ্চয়ই জবাই করে দেবতার নৈকট্য অর্জন জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যা বুঝা যায়, যে ঐ কাজ করেছে সে মুসলমান ছিল। কিন্তু সে যা করেছে তার ফলে জাহান্নামে গেছে। অতএব এটা প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহা শির্ক। কেননা তাঁর বাণী, 'সে জাহান্নামে প্রবেশ করে' প্রমাণ করে যে, অর্থাৎ তা তার জন্য স্থায়ীভাবে অপরিহার্য হয়ে যায়। উক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নৈকট্যের জন্য মাছির মত নগণ্য প্রাণী মানসিক-নজরানা পেশ করায় যখন ঐ ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার কারণে পরিণত হয়েছে। তবে যা কিছু তার চেয়ে উপকারী ও বড় তা নজরানা পেশ করাতে জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

উক্ত হাদীস তাঁর বাণী, قرب 'নজরানা পেশ কর' অর্থাৎ নৈকট্য অর্জনের জন্য জবাই কর। এ থেকে বুঝা যায় যে, ঐ জাতির লোকেরা উক্ত পথিকদেরকে সে কাজের জন্য বাধ্য করেনি, কেননা তার পূর্বে এরও বর্ণনা রয়েছে যে, তারা কাউকে নজরানা পেশ করা ব্যতীত ঐ রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে দিত না। তাতে কোন বাধ্য-বাধ্যকতা ছিল না। অতএব সে যদি চাইত তবে বলতে পারত যেখান থেকে আমি এসেছি ফিরে যাব। তবে যদি বলা হয়, তারা নজরানা পেশ না করার জন্য হত্যার হুমকি দিয়েছিল, এজন্য সে ঐ কাজ করার জন্য বাধ্য ছিল আর বাধ্য করা অবস্থায় কোন কিছু ধর্তব্য নয়। এর উত্তর হল, এ ঘটনা ছিল আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের। বাধ্য করা অবস্থায় কুফরী কালাম বা কুফরীকর্ম ঈমানের স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তার সাথে জায়েয হওয়া এ উম্মতের জন্য খাস। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য এর বৈধতা ছিল না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾- এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾- এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩. প্রথম অভিশপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহকারী।

৪. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। এর মধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে, তুমি কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেবে।

৫. যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। বিদআতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিস্কার বা উদ্ভাবন করে, যাতে আল্লাহর হক ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে উক্ত বিষয়ের দোষ ত্রুটি বা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৬. যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭. নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লা'নত এবং সাধারণভাবে পাপীদের উপর লা'নতের মধ্যে পার্থক্য।

৮. এ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি মাছির কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

৯. তার জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হচ্ছে ঐ মাছি, যা নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দেয়ার কোন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কওমের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে [মাছিটি নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দিয়ে শির্কী] কাজটি করেছে।

১০. মুমিনের অন্তরে শিরকের [মারাত্মক ও ক্ষতিকর] অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নিহত [জান্নাতী] ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবির কাছে সে মাথা নত করেনি। অথচ তারা তার কাছে কেলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবি করেনি।

১১. যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে একজন মুসলমান। কারণ সে যদি কাফের হতো তাহলে এ কথা বলা হতোনা دخل النار فى ذباب একটি মাছির ব্যাপারে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। [অর্থাৎ মাছি সংক্রান্ত শির্কী ঘটনার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল]

১২. এতে সেই সহীহ হাদিসের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك অর্থাৎ, 'জান্নাত তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রুপ নিকটবর্তী।'

১৩. এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তিপূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত।

অধ্যায়-১০

যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে [পশু] যবেহ করা হয় সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা শরীয়ত সম্মত নয়[1]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ (التوبة: ١٠٨)

'হে নবী, আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না।'[2] (সূরা তাওবা: ১০৮)

সাহাবী সাবিত বিন আদ-দাহ্হাক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ

---

[1] এ অধ্যায়ে বর্ণিত مكان (মাকান) দ্বারা নির্দ্ধারিত স্থান ও তার পার্শ্ববর্তী স্থান বুঝানো হয়েছে। আর এ দুটি অর্থই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে স্থানে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয় সে-স্থানের পার্শ্বে জবাই করা যাবে না। এমনকি সে-স্থানেও জবাই করা যাবে না যেখানে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই হয়। কেননা তাতে উভয় অবস্থাতেই যারা গায়রুল্লাহ্র জন্য জবাই করে তাদরে সাথে মিল ও সাদৃশ্য হয়ে যায়। উক্ত মাসআলার উদাহরণ হল, মনে করুন, যদি কোন স্থান, মাজার বা আস্তানায় গায়রুল্লাহ্র নামে জবাই করে মুশরিক ও কুসংস্কারপন্থী ও বিদ'আতীরা কবরবাসীর বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তবে সেখানে নিশ্চয়ই তাওহীদবাদী মুসলমানের জন্য জবাই করা জায়েয হবে না, যদি উক্ত জবাই একমাত্র আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে হয়। কেননা এভাবে ঐ স্থানের মর্যাদা দেয়াতে ঐ সমস্ত মুশরিকদের সদৃশ হয়ে যায়, যারা ঐ সব স্থানে গায়রুল্লাহ্র জন্য বিভিন্ন ইবাদত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। সুতরাং যেখানে গায়রুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হয় সেখানেই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেও জবাই করা শুধু হারামও নাজায়েয নয় বরং তা শিরকের বাহন, যাতে সে স্থানের তা'জীম সম্মান প্রদর্শিত হয়। যার হুকুম হল হারাম ও শিরকের মাধ্যম।

[2] মুনাফিকদের তৈরি করা মসজিদে যিরার ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কারণ, এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি চ্যালেঞ্জ করে। অতএব, যদি সেখানে সলাত আদায় করা হত তবে তার দ্বারা সলাতে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হতো, যা না জায়েয। কেননা সেখানে সলাত আদায়ে তাদেরকে সমর্থন করা, তাদের দল বৃদ্ধি এবং সাধারণ লোকদের জন্য জায়েয সাব্যস্ত হয়ে যেত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (ﷺ) ও মুমিনদেরকে মসজিদে যিরারে সলাত আদায়ে নিষেধ করেন। অথচ নিশ্চয়ই তিনি (ﷺ) ও মুমিনগণ যদি সেখানে সলাত আদায় করতেন তবে তা একমাত্র আল্লাহরই জন্য করতেন এবং সেখানে সলাত আদায় করার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য দ্বীনের ক্ষতি সাধন বা বিভেদ সৃষ্টি বা আল্লাহ্র বিরোধিতা কোনক্রমে থাকত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদেরকে এ জন্য সেখানে সলাত আদায়ে নিষেধ করা হয়েছে, যেন তাতে মোনফেকদের সাথে অংশগ্রহণ ও সদৃশ না হয়ে যায়। অনুরূপ যে স্থানে গায়রুল্লাহ্র জন্য পশু জবাই করা হয় সেখানে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যও পশু জবাই জায়েয নয় যদিও তার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত স্থানের সম্মান ও মুশরিকদের সাথে সদৃশ হয়ে যায়।

أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا لاَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ (سنن أبي داود، الأيمان، باب ما نؤمر به من وفاء النذر، ح:٣٣١٣ والسنن الكبرى للبيهقي، ح:١٠/٨٣)

'এক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'সে স্থানে এমন কোন মূর্তি ছিল কি, জাহেলি যুগে যার পূজা করা হতো।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো?'[1] 'তাঁরা বললেন, 'না।' [অর্থাৎ এমন কিছু হতো না] তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো।'[2] তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মান্নতও পূরা করা যাবে না।' *(সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩৩১৩; সুনান কাবীরুল বায়হাক্বী, হাদীস নং ১/৮৩; হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।)*

---

[1] মহানবী ﷺ তার নিকট বিষয়টির ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। কারণ, এটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। পূর্বে এখানে কোন জাহেলী যুগের মূর্তি থেকে থাকলেও সেখানে জবাই করা জায়েয হবে না- এ কথা বলার উদ্দেশ্যেই হাদীসটি এখানে আনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী, فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا : لا
ঈদ: এমন একটি স্থান বা সময়কে বলা হয় যার দিকে বার বার ফিরে আসা হয়, যা বার বার ফিরে আসে। সুতরাং কোন জায়গাকে ঈদ এ জন্য বলা হয় যে, সেখানে লোকদের বার বার আগমন ঘটে এবং একটি নির্ধারিত সময়ে তার দিকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে। অতএব তাঁর বাণী 'সেখানে কি তাদের কোন ঈদ হত?' অর্থাৎ স্থানের ঈদ ও কালের ঈদ। আর মুশরিকদের ঈদসমূহ চাই স্থান সূচক ঈদ হোক বা কাল সূচক। তাদের শির্কী ধর্মের উপরেই তার ভিত্তি হবে। অর্থাৎ তারা তাদের ঈদ সমূহে শির্কী ইবাদতসমূহই পালন করে থাকবে এবং ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে তারা অন্যান্য অনেক কাজ করে থাকে সেখানকার সবচেয়ে বড় কাজ হল গায়রুল্লাহ্র নৈকট্যের জন্য জবাই করা ও রক্ত প্রবাহিত করা। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, মুশরিকরা যেখানে গায়রুল্লাহ্র নৈকট্যের জন্য জবাই করে সেখানে তাদের সাথে শরীক হয়ে তাদের প্রকাশ্যে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কোনক্রমেই জায়েয হবে না। যদিও সেখানে একমাত্র আল্লাহ্রই নৈকট্যের জন্য হয়ে থাকে অথবা একমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টির জন্যেই সলাত আদায় হোক না কেন?

[2] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে বলেন, 'তোমার মানত পূর্ণ কর কেননা আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোন মানত পূর্ণ করা যাবে না...' উলামায়ে কেরাম বলেন, হাদীসের فإنه এর (ফা) فا এই কথাই প্রমাণ করে যে এ মানত পূর্ণ করার বৈধতার কারণ হল, এ মানতে আল্লাহ্র নাফরমানী নেই। আর নবী ﷺ-এর ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যাখ্যা দাবী ঐ কথার প্রমাণ বহন করে যে, যেখানে কোন মূর্তি পূজা হয় অথবা মুশরিকদের কোন ঈদ-উৎসব হয়, সেখানে আল্লাহ্র জন্য জবাই করাও আল্লাহ্র নাফরমানীর অন্তর্ভূক্ত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾-এ আয়াতের তাফসীর।

২. দুনিয়াতে যেমনি ভাবে পাপের [ক্ষতিকর] প্রভাব পড়তে পারে, তেমনিভাবে [আল্লাহর] আনুগত্যের [কল্যাণময়] প্রভাবও পড়তে পারে।

৩. দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

৪. প্রয়োজন বোধে 'মুফতী' জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ [প্রশ্ন কারীর কাছে] চাইতে পারেন।

৫. মান্নতের মাধ্যমে কোন স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরিয়তের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে।

৬. জাহেলি যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মান্নত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. মুশরিকদের কোন উৎসব বা মেলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে, তা বন্ধ হওয়ার পরও সেখানে মান্নত করা নিষিদ্ধ।

৮. মুশরিকদের উৎসব স্থলে মানত করলে তা পূর্ণ করতে হবে না। কারণ, তা অবাধ্যতার মানত।

৯. মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাথে কোন কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

১০. পাপের কাজে কোন মানত নেই।

১১. যে বিষয়ের উপর আদম সন্তানের কোন হাত নেই সে বিষয়ে মান্নত পূরা করা যাবে না।

অধ্যায়-১১

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারোর উদ্দেশ্যে মানত করা শির্ক

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ (الإنسان: ٧)

'তারা মানত পূর্ণ করে।'[1] (সূরা দাহর: ৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (البقرة: ٢٧٠)

'আর তোমরা যা কিছুই খরচ কর আর যে কোন মানতই কর, আল্লাহ তা জানেন।' (সূরা বাকারাহ: ২৭০)

সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه (صحيح البخاري، الأيمان والنذور، باب في الطاعة. الخ، ح:٦٦٩٦، ٦٧٠٠ وسنن أبي داود، الأيمان والنذور، باب النذر في المعصية، ح:٣٢٨٩)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মান্নত করে সে যেন তা পূরা করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত করে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।" [অথাৎ মান্নত যেন পূরা না করে।' *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৯৬, ৬৭০০; সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩২৮৯)*[2]

---

[1] এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানত পূর্ণকারীদের প্রশংসা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানত শরীয়তসম্মত ও আল্লাহ্র প্রিয় ও ইবাদত। আর যেহেতু এটি ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত, ফলে তা গায়রুল্লাহ্র জন্য পালন করা মহা শির্ক।

[2] এ হাদীসে জায়েয মানত পূর্ণ করার নির্দেশ রয়েছে, এ থেকে বুঝা যায়, এটি আল্লাহ্র প্রিয় ইবাদত কেননা যা কিছু ওয়াজিব তাই ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত এবং যা কিছু তার মাধ্যম সেগুলিও ইবাদত; অতএব করার মাধ্যমও মানতেরই অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যদি মানতই না মানা হয় তবে পূর্ণইবা কি হবে? এ জন্য মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব, মানুষ যে মানতের ইবাদতকে নিজেই নিজের উপর অপরিহার্য করেছে। রাসূল

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. নেক কাজে মান্নত পূরা করা ওয়াজিব।

২. মান্নত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা শির্ক।

৩. আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূরণ করা জায়েয নয়।

ﷺ-এর বাণী : ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানীর মানত করবে সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে।' তা হবে মানুষের নিজের উপরে নিজে আল্লাহ্র নাফরমানীকে অপরিহার্য করে নেয়া; কেননা তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ পাপাচারের সাথে সাংঘর্ষিক, বরং এ ধরণের লোকের জন্য শপথের কাফ্ফরা অপরিহার্য হয়ে যায়। যার বিস্তারিত বর্ণনা ফিকাহ্ কিতাবসমূহে রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মানত করা মহা ইবাদত এবং গায়রুল্লাহ্র নামেও মানত করা ইবাদত। অতএব গায়রুল্লাহ্র জন্য মানতকারী যখন স্বীয় মানত পূর্ণ করে তখন সে গায়রুল্লাহ্রই ইবাদত করল (যা মহা শির্ক) পক্ষান্তরে আল্লাহ্র জন্য মানতকারী যখন স্বীয় মানতপূর্ণ করে তখন সে আল্লাহ্রই ইবাদত করে।

অধ্যায়-১২

আল্লাহ্ ব্যতীত গাইরুল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়া শির্ক[1]

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (الجن:٦)

'মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বিনের কাছে আশ্রয় চাইতেছিল, এর ফলে তাদের [জ্বিনদের] গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল।'[1] (সূরা জ্বিনঃ ৬)

---

[1] আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা হল মহা শির্ক। আরবী ভাষায় 'ইস্তিআযাহ' শব্দ এসেছে। এর অর্থ: আশ্রয় প্রার্থনা করা অর্থাৎ এমন কিছু কামনা করা যা অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দেয়। তলব-চাওয়া হল, অভিমুখী হওয়া ও দু'আর একপ্রকার; কেননা এর দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং যার থেকে কিছু চাওয়া হয় সে অবশ্য প্রার্থনাকারীর চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে উঁচু হয়ে থাকেন। এজন্য তার দিকে ক্রিয়া সম্পন্ন করাকে দু'আ বলা হয়। এ জন্য প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আশ্রয় চাওয়ার দু'আ করা। আর যখন তা দু'আ অতএব ইবাদতেরও অন্তর্ভূক্ত। আর প্রত্যেক প্রকার ইবাদত আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত যার উপর সবারই ঐক্যমত এবং কুরআনের আয়াতসমূহ ও ঐ কথারই প্রমাণ বহন করে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সমস্ত মসজিদ আল্লাহরই, অতএব তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে আহবান করো না।' (সূরা জ্বিনঃ ১৮) তিনি আরো বলেন : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ অর্থাৎ 'আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দেন যে, তাঁকে ব্যতীত কারো ইবাদত করো না।' (সূরা ইসরাঃ ২৩) বরং প্রত্যেক ঐ সমস্ত দলীল যাতে একমাত্র আল্লাহ্রই নিকট দু'আ করার কথা বা তাঁরই ইবাদত করার কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলি বিশেষ করে আলোচ্য মাসআলারই দলীল।

যে আশ্রয় প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য উপযোগী তার তাৎপর্য হল, তার মধ্যে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় আমল অন্তর্ভূক্ত। প্রকাশ্য আমল বলতে বুঝায়: আন্তরিক আকর্ষণ, প্রশান্তি, অস্থিরতা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তার নিকটেই তুলে ধরা এবং স্বীয় হেফাযত ও মুক্তির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার নিকটেই সোপর্দ করা। আর এ ধরণের আশ্রয় প্রার্থনা ঐক্যমতে আল্লাহ্র নিকট ব্যতীত আর কারো নিকট জায়েয নেই।

আর যদি বলা হয় যা কিছু মাখলুক-সৃষ্টির সাধ্যের অন্তর্ভূক্ত তার আশ্রয় প্রার্থনা মাখলুকের নিকট জায়েয। এতো এক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ থাকার ভিত্তিতেই জায়েয। আর এ আশ্রয় প্রার্থনার অর্থ হল যে, মাখলুক থেকে আশ্রয় শুধু মৌখিক হয়; কিন্তু আন্তরিক সম্পর্ক ও স্থিরতা আল্লাহ্রই সাথে হয়ে থাকে এবং তার এরূপ সৎ খেয়াল থাকে যে, উক্ত মাখলুক শুধুমাত্র এক্ষেত্রে একটি কারণস্বরূপ, আল্লাহ্ই প্রকৃত আশ্রয়দাতা। সুতরাং এ আশ্রয় প্রার্থনা হল প্রকাশ্য, আর প্রকৃত ও অপ্রকাশ্য আশ্রয় প্রার্থনা তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয় না। অতএব ব্যাপার যদি এরূপ হয় তবে তা জায়েয, নতুবা নয়। এর মাধ্যমেই কুসংস্কারবাদী বাতিল পন্থীদের ঐ মত বাতিল, তারা যে মনে করে মৃত্যু, জ্বিন ও ওলীদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা যেতে পারে যার মধ্যে তাদের সাধ্য রয়েছে। পক্ষান্তরে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ই তো তাদের চেয়ে সমর্থবান।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা, উদ্ধারকারী হিসেবে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা তাওহীদ পরিপন্থী কাজ। যে সকল অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা শির্ক। পক্ষান্তরে যে সকল সাধারণ মানুষের ক্ষমতা আছে সেগুলি তার নিকট প্রার্থনা করা শির্ক নয়।

খাওলা বিনতে হাকীম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়ে বলবে,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

'আমি আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।' তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ স্থান ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[2] *(মুসলিম)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা জ্বিনের ৬নং আয়াতের তাফসীর।
২. গায়রুল্লাহ্‌র আশ্রয় চাওয়া শিরকের অন্তর্ভূক্ত হওয়া।
৩. হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর [অর্থাৎ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শির্‌ক] দলিল পেশ করা। উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদিস দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ 'আল্লাহর কালাম" মাখলুক [সৃষ্টি] নয়। তাঁরা বলেন 'মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শির্‌ক।'
৪. ছোট হওয়া সত্ত্বেও উক্ত দু'আর ফযীলত।
৫. কোন বস্তু দ্বারা পার্থিক উপকার হাসিল করা অর্থাৎ কোন অনিষ্ট থেকে তা দ্বারা বেঁচে থাকা কিংবা কোন স্বার্থ লাভ, এ কথা প্রমাণ করে না যে, উহা শেরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

---

[1] আয়াতে বর্ণিত رهقا এর অর্থ হল, তাদের অন্তরে এমন ভাবে ভয়-ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে যাতে তারা বিপদগ্রস্ত হয়ে গেছে। আর এ বিপদগস্ত তারা দৈহিকভাবে হয়েছে এবং আত্মীকভাবেও। এ বিপদ তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ ছিল। আর শাস্তি অবতীর্ণ হয় সাধারণত কোন পাপের কারণেই। সুতরাং উক্ত আয়াতে তাদের দোষ প্রমাণিত হয়। আর তাদেরকে এ জন্য দোষারোপ করা হয় যে, তারা এ ইবাদতকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, তাঁকে ব্যতীত আর অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করার। কাতাদাহসহ কতিপয় সালাফী বলেছেন, (رهقا) শব্দের অর্থ হচ্ছে পাপ। এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা পাপের কাজ।

[2] নবী ﷺ আল্লাহ্‌র কথামালা দিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ 'তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'(সূরা ফালাকঃ২) এখানে সৃষ্টজীবের অনিষ্টতা উদ্দেশ্য। কারণ, এমন সৃষ্টজীব ও রয়েছে যাতে কোন অনিষ্টতা নেই। যেমন: ফেরেশ্‌তা, নবী, ওলী প্রমুখ।

অধ্যায়-১৩

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া অথবা দু'আ করা শির্ক[1]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا﴾ (يونس: ١٠٦-١٠٧)

'আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকো না, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কারো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না।'[2]

(সূরা ইউনুস: ১০৬-১০৭)

---

[1] মূলে (ইস্তেগাসা) শব্দ রয়েছে। এর অর্থ ফরিয়াদ বা আর্তনাদ করা। যে বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে অন্যের নিকট আর্তনাদ করা বড় শির্ক। তবে যে বিষয়ে মানুষের ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে তার নিকট আর্তনাদ করা জায়েয, যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ অর্থ: 'যে ব্যক্তি মুসার (ﷺ) গোত্রের ছিল সে তার শত্রুর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করল।' (সূরা আল-কাসাস : ১৫) 'দু'আ দুই প্রকার, (ক) আল্লাহ্র নিকট কোন কিছু ভিক্ষা করা, অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট কিছু চাওয়ার জন্য হাত উঠিয়ে তাঁকে আহ্বান করা। আমরা সাধারণত একে দু'আ বলে জানি। (খ) ইবাদতে দু'আ। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ অর্থ: 'নিশ্চয়ই সমস্ত মসজিদই আল্লাহর জন্য অতএব তোমরা তাঁর সাথে কাউকে ডেকো না।' (সূরা জ্বিন : ১৮) অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে আর অন্য কারো ইবাদত করো না এবং আল্লাহ্র সাথে আর অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করো না। যেমন- নবী ﷺ বলেন, 'দু'আ প্রার্থনাই হল ইবাদত।'
উভয় প্রকার দু'আর মধ্যে প্রার্থক্য রয়েছে। অতএব ইবাদতের দু'আ এমন হবে যেমন কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করে বা যাকাত দেয়, কেননা ইবাদতের যে কোন প্রকারই হোকনা কেন তাকে দু'আই বলা হয় কিন্তু এ দু'আ ইবাদত হিসেবেই হয়ে থাকে। যখন এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অতএব কুরআনী পঙ্কি এবং ইমাম ও আলেমদের পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রমাণাদীকেও বুঝার জন্য উল্লেখিত ব্যাখ্যা ও প্রকারভেদ অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে, কেননা শির্ক ও বিদ'আত বিস্তারকারীগণ চাওয়ামূলক দু'আর ব্যাপারে আগত আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা বা চাওয়ামূলক দু'আ এবং ইবাদতমূলক দু'আ হল ইবাদতের একটি প্রকার এবং ইবাদতমূলক দু'আতেও এ জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ্র নিকট উক্ত ইবাদত কবূলের জন্য প্রার্থনাও করা প্রয়োজন।

[2] উক্ত আয়াতে ولا تدع من دون الله (আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাউকে আহ্বান কর না।) (ولا تدع) দ্বারা নিষেধাজ্ঞা বুঝানো হয়েছে, এখানে প্রার্থনা ও ইবাদতমূলক উভয় দু'আ নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ (فاطر: ١٣)

'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য] ডাকো তারা কোন কিছুরই মালিক নয়।'[1] (সূরা ফাতির: ১৩)

সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة أحد، ح:١٧٩١ ومسند أحمد :٣/٩٩، ١٧٨)

উহুদ যুদ্ধে নবী (ﷺ) আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন নবী (ﷺ) দুঃখ করে বললেন, 'সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়।' তখন ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ এ আয়াত নাজিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, [আল্লাহর] এ [ফয়সালার] ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।' (সূরা আল-ইমরান: ১২৮) *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯১; মুসনাদ আহমাদ ৩/৯৯, ১৭৮)*

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سمعَ الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اللهم العن فلانا وفلانا অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক, অমুক, [নাম উল্লেখ করে] ব্যক্তির উপর তোমার লানত নাজিল করো।' তখন এ আয়াত নাজিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।' অন্য বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদু'আ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।'

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ)-এর উপর যখন ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ নাজিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

---

[1] আয়াতের মূলে قطمير শব্দ এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে 'বীজের আবরণ'। যারা বীজের আবরণেরই মালিক নয় তারা কিভাবে তার চেয়েও বেশি বড় জিনিসের মালিক হবে? অতএব, তাদের নিকট দু'আ করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। এতে ফেরেশ্‌তা, নবী, রাসূল, সৎব্যক্তি, অসৎ ব্যক্তি, জ্বিন সবাই অন্তর্ভূক্ত। অতএব, তাদের উচিত সবাইকে ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকেই আহ্বান করা।

'তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে সত্তা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।'[1]

[সূরা আহকাফ (৪৬): ৫]

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ (النمل: ٦٢)

'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূর করে?'[2]

[সূরা নামল (২৭): ৬২]

ইমাম তাবরানী (রাহি.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে এমন একজন মুনাফেক ছিল, যে মু'মিনদেরকে কষ্ট দিত। তখন মু'মিনরা পরস্পর বলতে লাগল, চলো, আমরা এ মুনাফেকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ-এর সাহায্য চাই।[3] নবী করিম ﷺ তখন বললেন, 'আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।'[4] (এ হাদীসটি যঈফ। হাদীসটির সনদে ইবনে লাহী'আহ্ নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে। দেখুন, আন্নাহজুস্ সাদীদ, পৃ. ১৬১)

---

[1] এ আয়াতে ঐ লোকদের আহ্বান সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এবং কোন জীবিতকে বাদ দিয়ে মৃতদেরকে আহ্বান করে একেবারে নিকৃষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে এবং স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, তারা মৃতদের দিকে ধাবিত, মূর্তি, বৃক্ষ ও পাথরের দিকে নয় তাই إلى يوم القيامة বলে কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এ তো মৃতদের ক্ষেত্রে কেননা মৃতরা তো যখন কিয়ামত হবে পুনরুত্থিত হবে শুনা শুরু করবে। আয়াত من শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা জ্ঞান সম্পন্নের প্রতি প্রয়োগ হয়, আর তারা হল মানুষ যারা কথা বলে ও তাদের সাথেও কথা বলা হয়, তারা জানে (এখানে মৃত ব্যক্তি উদ্দেশ্য।)

[2] এখানে প্রার্থনামূলক দু'আ উদ্দেশ্য। যা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত। কখনো আর্তনাদের পর আবার কখনো আর্তনাদ ছাড়াই আল্লাহ্ সৃষ্টি জীবের অনিহা দূর করেন। উক্ত আয়াতে أإله مع الله 'তবে কি আল্লাহ্র সাথে আরো মা'বূদ রয়েছে'? এটি অস্বীকৃতি সূচক প্রশ্ন। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে আর কোন মা'বূদ নেই। যাকে আহ্বান করা যাবে বা যা কিছু আল্লাহ্রই জন্য নির্ধারিত তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাওয়া যাবে।

[3] আবূ বকর ﷺ মহানবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে আর্তনাদ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এটি জায়েয। কারণ, মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি আর্তনাদ শুনে তাদের কষ্ট দূর করতে সক্ষম ছিলেন। তাই সেটি মুনাফিককে হত্যার মাধ্যমে হোক অথবা তাকে কারাগার নিক্ষেপ করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে। এ পরিস্থিতিতেও নবী ﷺ তাদেরকে আদব শিক্ষা দেন এবং বলেন, 'আমার দ্বারা ফরিয়াদ করা যায় না, ফরিয়াদ একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই করতে হয়।'

[4] মুসলমানরা তাদের বিপদে রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'তাদের প্রথমত আল্লাহর নিকট আর্তনাদ-ফরিয়াদ করা ওয়াজিব যদিও বিষয়টি তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতার আওতায় ছিল।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সাহায্য চাওয়ার সাথে দু'আকে আত্ফ করার ব্যাপারটি কোন আম বস্তুকে খাছ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২. ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ -এ আয়াতের তাফসীর।

৩. গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাইরুল্লাহকে ডাকা 'শিরকে আকবার।'

৪. সব চেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যের সন্তুষ্টির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় বা দোয়া করে, তাহলেও সে জালিমদের অন্তর্ভূক্ত।

৫. ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ -এ আয়াতের তাফসীর।

৬. গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করা কুফরি কাজ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। [অর্থাৎ কুফরি কাজে কোন সময় দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করার মধ্যে দুনিয়ার উপকারও নেই]

৭. তৃতীয় ﴿فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ আয়াতের তাফসীর।

৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিজিক চাওয়া উচিত নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিত নয়।

৯. চতুর্থ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ আয়াতের তাফসীর।

১০. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে যে ব্যক্তি ডাকে তার চেয়ে বড় গোমরাহ্ আর কেউ নেই।

১১. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করে সে গাইরুল্লাহ দোয়াকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, অর্থাৎ তার ব্যাপারে গাইরুল্লাহ সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে।

১২. مدعو [মাদউ'] অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দোয়া করা হয়, দোয়াকারীর প্রতি তার রাগ ও শত্রুতার কারণেই হচ্ছে ঐ দোয়া যা তার [গাইরুল্লাহ'র] কাছে করা হয়। [কারণ প্রকৃত মাদউ'] কখনো এরকম শির্কী কাজের অনুমতি কিংবা নির্দেশ দেয়নি]।

১৩. গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য)কে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪. ঐ ইবাদতের মাধ্যমেই কুফরি করা হয়।

১৫. আর এটাই তার [গাইরুল্লাহর কাছে দু'আকারীর] জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হওয়ার একমাত্র কারণ।

১৬. পঞ্চম আয়াত অর্থাৎ ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ এর তাফসীর।

১৭. বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, মূর্তি পূজারীরাও এ কথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্ত, অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারে না। এ কারণে তারা যখন কঠিন মুসীবতে পতিত হয়, তখন ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে তারা আল্লাহকেই ডাকে।

১৮. এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কর্তৃক তাওহীদের হেফাযত, সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তাআলার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেল।

অধ্যায়-১৪

অক্ষমকে আহ্বান করা শির্ক

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ (الأعراف: ١٩٢-١٩١)

'তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। আর তারা তাদেরকে [মুশরিকদেরকে] কোন রকম সাহায্য করতে পারে না।'[1] (সূরা 'আরাফ: ১৯১-১৯২)

---

[1] বিগত অধ্যায়গুলোর পর এ অধ্যায়ের অবতারণা হল উত্তম অবতারণা এবং জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ তাওহীদ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনিই উপযুক্ত হওয়ার দলীল হল, মানুষের স্বভাবজাত চরিত্র, বাস্তবতা ও যুক্তি সব ধরণের দলীলই প্রমাণ করে যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ্ই তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই। এ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন। জীবিকা দেন, মালিকানা একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো সকল বিষয়ে কোনই ক্ষমতা নেই। এমনকি সৃষ্টি জীবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি মহানবী মুহাম্মদ ﷺও এ সকল বিষয়ে কোনই ক্ষমতা রাখেন না। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যখন নবী ﷺ-এর কোন ক্ষেত্রে ইখতিয়ার নেই তবে এমন কে রয়েছে যার সর্বক্ষেত্রে ইখতিয়ার রয়েছে? তিনি তো একমাত্র আল্লাহ্। অতএব, সে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্রই ইবাদত করা উচিত সকল সৃষ্টজীবের। যখন নবী ﷺ থেকে ঐ বিষয় নাকচ হয়ে গেল, তাঁর চেয়ে নিম্নদের থেকে ঐ বিষয় নাকচ হবেই। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরস্থদের প্রতি বা সৎব্যক্তি, নবী বা ওলীদের দিকে ধাবিত হয়, তাদের অভ্যন্তরে ধারণা হয় যে নিশ্চয়ই তাঁদেরও কর্তৃত্ব রয়েছে। যেমন: তাঁরাও রুযীর ব্যবস্থা করতে পারেন বা তাঁরা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীতই মধ্যস্থতা ও সুপারিশ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তা অতি ভ্রান্ত কথা কেননা তাঁরাই তো প্রতিপালিত ও রুযী প্রাপ্ত। তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে যারা তাদের নিকট চায় তাদেরকে তারা সাহায্য করতে সক্ষম। তাঁদের কোনই ক্ষমতা নেই। কুরআন মাজীদে বহু প্রমাণ রয়েছে যে, ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত হল আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। আর ঐ সমস্ত দলীলের আওতায় কোন কোনটিতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের তাওহীদে রুবূবিয়্যাতে স্বীকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। এ ধরণের দলীল সমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তোমরা যে সত্তার জন্য রুবূবিয়্যাত সাব্যস্ত কর ইবাদতেরও তিনিই উপযুক্ত। কুরআন মাজীদের দলীল সমূহে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তো স্বীয় রাসূল ﷺ, ওলীদেরকে তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কতিপয় কুরআনী দলীলে সৃষ্ট জীবের দুর্বলতাও সাব্যস্ত হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, জীবিত করার ক্ষেত্রে মাখলুকের কোন ইখতিয়ার নেই, বরং আল্লাহ্ তা'আলাই স্বীয় ইখতিয়ারে জীবন দান করেন এবং তাদের বিনা ইখতিয়ারেই তিনি জীবন বের করেন। সুতরাং মাখলুক হল নিরুপায় ও বাধ্য। তাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকারী একমাত্র আল্লাহ্। বাতিল উপাস্যরা নয়। একমাত্র তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যুদান করেন। আর এ কথা স্বভাবজাত চরিত্র থেকেই প্রত্যেকে স্বীকার করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার এটিও দলীল যে, তিনি উত্তম নাম ও উচ্চ গুণাবলী সম্পন্ন। তাঁর সত্তা পরিপূর্ণ, মহান গুণাবলীর অধিকারী। সর্বময় পরিপূর্ণতা তাঁরই, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে কোন অসম্পূর্ণতা নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ (فاطر: ١٣)

'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে [উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য] ডাকো তারা কোন কিছুরই মালিক নয়।'[1] (সূরা ফাতির: ১৩)

সহীহ বুখারীতে আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ فَنَزَلَتْ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة أحد، ح:١٧٩١ ومسند أحمد :٣/٩٩، ١٧٨)

উহুদ যুদ্ধে নবী (ﷺ) আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন নবী (ﷺ) দুঃখ করে বললেন, 'সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়।' তখন ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ এ আয়াত নাজিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, [আল্লাহর] এ [ফয়সালার] ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।' (সূরা আল-ইমরান: ১২৮) *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯১; মুসনাদ আহমাদ ৩/৯৯, ১৭৮)*

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে ফজরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سمعَ الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اللهم العن فلانا وفلانا অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি অমুক, অমুক, [নাম উল্লেখ করে] ব্যক্তির উপর তোমার লানত নাজিল করো।' তখন এ আয়াত নাজিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।' অন্য বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদু'আ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।'

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ)-এর উপর যখন ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ নাজিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

---

[1] আয়াতের মূলে قطمير শব্দ এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে 'বীজের আবরণ'। যারা বীজের আবরণেরই মালিক নয় তারা কিভাবে তার চেয়েও বেশি বড় জিনিসের মালিক হবে? অতএব, তাদের নিকট দু'আ করা মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। এতে ফেরেশ্‌তা, নবী, রাসূল, সৎব্যক্তি, অসৎ ব্যক্তি, জ্বিন সবাই অন্তর্ভূক্ত। অতএব, তাদের উচিত সবাইকে ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকেই আহ্বান করা।

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا (صحيح البخاري، الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأرقاب، ح:٢٧٥٣ ومسند أحمد ٢/٣٦٠)

'হে কুরাইশ বংশের লোকেরা [অথবা এ ধরণেরই কোন কথা বলেছেন] তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। [শিরকের পথ পরিত্যাগ করে তাওহীদের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও] আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।' *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৫৩; মুসনাদ আহমাদ, ২/৩৬০)*[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. এ অধ্যায়ে উল্লেখিত সূরা আ'রাফ এবং সূরা ফাতিরের দু'টি আয়াতের তাফসীর।
২. উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।
৩. সলাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা বিশ্বনবী কর্তৃক 'দু'আয়ে কুনুত' পাঠ করা এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আমীন বলা।
৪. যাদের উপর বদদু'আ করা হয়েছে তারা কাফের।

---

[1] তিনি তাদের কোন উপকার করতে পারবেন না। অর্থাৎ শাস্তি নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ হাদীস একটা স্পষ্ট দলীল যে, নবী ﷺ স্বীয় আত্মীয়দেরকে কোন উপকার সাধন করতে পারেননি, তবে তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত তাদের নিকট অবশ্যই পৌঁছিয়েছেন এবং এ মহা আমানত (রিসালাত) আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে আযাব-গজব থেকে পরিত্রাণ দেয়ার ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ স্বীয় মাখলুকের মধ্যে কাউকে স্বীয় বাদশাহীর কোন কিছু অর্পণ করেননি বরং তিনি তার রাজত্ব ও ক্ষমতায় একক।

৫. অধিকাংশ কাফেররা অতীতে যা করেছিল তারাও তাই করেছে। যেমন, নবীদেরকে আঘাত করা, তাঁদেরকে হত্যা করতে চাওয়া এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির নাক, কান কাটা।

৬. এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর উপর ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ অবতীর্ণ হওয়া।

৭. ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ (آل عمران:١٢٨) এরপর তারা তাওবা করল। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর উপর ঈমান আনল।

৮. বালা-মুসীবতের সময় দু'আ-কুনুত পড়া।

৯. যাদের উপর বদদু'আ করা হয়, সলাতের মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদদু'আ করা।

১০. কুনূতে নাযেলায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া।

১১. ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী জীবনের ঘটনা।

১২. ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর অক্লান্ত সংগ্রাম ও সাধনার কথা। এমনকি এ মহৎ কাজের জন্য তাঁকে পাগল পর্যন্ত বলা হয়েছে। কোন মুসলিম যদি আজও সে ধরনের দাওয়াতী কাজ করে তবে সেও উক্ত অবস্থার শিকার হবে।

১৩. রাসূল ﷺ তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন لا أغني عنك من الله شيئا [আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য করতে পারব না"] এমনকি তিনি ফাতেমা (رضي الله عنها)-কেও লক্ষ্য করে বলেছিলেন, يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا 'হে ফাতেমা, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার আমি করতে সক্ষম হব না।' তিনি সমস্ত নবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না, তখন সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচানোর ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার কাছে তাওহীদের মর্মকথা এবং দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

অধ্যায়-১৫

ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী অবতরণের ভীতি

আল্লাহ্‌র বাণী-

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سبا:٢٣)

'যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান।"[1] (সূরা সাবা: ২৩)

সহীহ্ বুখারীতে আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سبا:٢٣) فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ــ وصفه سفيان بكفه، فحرّفها وبدّد بين أصابعه ــ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء (صحيح البخاري، التفسير، باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، ح:٤٨٠٠)

---

[1] فزع অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর করা। ফেরেশ্‌তাদের আল্লাহ্ সম্পর্কে বহু জ্ঞান রয়েছে। তার জ্ঞানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, মর্যাদাবান এবং সমস্ত জগতের অধিপতি। এজন্য তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত ভয় পায়। কেননা তারা আল্লাহ্ তা'আলা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কতিপয় গুণাবলী হল, মহত্বপূর্ণ আর কতিপয় হল, সৌন্দর্যপূর্ণ। যেসব গুণাবলী অন্তরে ভয়-ভীতি, অস্থিরতা ও রবের প্রতি আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাকে জালালী বা মহত্বপূর্ণ গুণাবলী বলা হয়। আর প্রকৃতপক্ষে এ জালালী গুণাবলীতে যিনি গুণান্বিত তিনিই হলেন আল্লাহ্। কেননা তিনিই তাঁর পূত-পবিত্র গুণাবলীতে পুরিপূর্ণ। আর বাস্তবে যদি তাই হয় তবে গুণাবলীতে পরিপূর্ণ সত্তাই হল ইবাদতের উপযুক্ত। পক্ষান্তরে সৃষ্ট মানুষ হল অসম্পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। নিশ্চয়ই তাদের জীবন পরিপূর্ণ নয়, কেননা কখনো সে মাখলুক এমন ঘটনার সম্মুখীন হয় যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আবার কখনো এমন অবস্থায় স্বীকার হয় যে, রুগ্ন-অসুস্থ হয়ে যায়। সুতরাং তারা অত্যন্ত দুর্বল ও মুখাপেক্ষী। তাদের কোন পরিপূর্ণ গুণাবলী নেই। তাই এটিই হল তাদের অসম্পূর্ণতা ও অপারগতার দলীল এবং তারা যে প্রতিপালিত ও বাধ্যতার দলীল। সুতরাং বান্দার উচিত হল যার রয়েছে পরিপূর্ণ গুণাবলী, মুহত্ব ও সৌন্দর্য তাঁরই দিকে ধাবিত হওয়া, আর তিনি হলেন একক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। এটিই এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য যা প্রকাশ্য আল-হামদুলিল্লাহ্।

'যখন আল্লাহ তাআলা আকাশে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফিরিস্তারা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে।

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سبا:٢٣)

'যখন তাদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তারা জবাবে বলে, আল্লাহ হক কথাই বলেছেন। বস্তুত: তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ।' (সূরা সাবা: ২৩)

এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এভাবে পর পর অবস্থান করতে থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান বিন উয়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারী [খাত চোর] দের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর উপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুণের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক-অমুক দিনে এমন এমন কথা কি তোমাদেরকে বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আকাশে শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়। *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭০০)*

নাওয়াস বিন সামআন রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِه كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ تُنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿حَتَّىٰ فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِه فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى

مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ

'আল্লাহ তাআলা যখন কোন বিষয়ে ওহি করতে চান এবং ওহির মাধ্যমে কথা বলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ মন্ডলী কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ করে। আকাশবাসী ফিরিস্তাগণ এ নিকট আওয়াজ শুনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল তারপর আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন ওহির মাধ্যমে জিবরাঈল-এর সাথে কথা বলেন। জিবরাঈল এরপর ফিরিস্তাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যতবারই আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন ততবারই উক্ত আকাশের ফিরিস্তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে জিবরাঈল, আমাদের রব কি বলেছেন?' জিবরাঈল উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ হক কথাই বলেছেন, তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ'। একথা শুনে তারা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলে। তারপর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে যেখানে ওহি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সে দিকে চলে যান।" *(এ হাদীসটি যঈফ। দ্র. তাখরীজুস্ সুন্নাহ, আলবানী ১/২২৭)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা সাবার ২৩নং আয়াতের তাফসীর।
২. এ আয়াতে রয়েছে শির্ক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষ করে, সালেহীনের সাথে যে শির্ককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটিই সে আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শির্ক বৃক্ষের 'শিকড় কর্তনকারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।
৩. ﴿قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ -এ আয়াতটির তাফসীর
৪. হক্ব সম্পর্কে ফিরিশ্তাদের জিজ্ঞাসার কারণ।
৫. 'এমন এমন কথা বলেছেন'- এ কথার মাধ্যমে জিবরাঈল কর্তৃক জবাব প্রদান।
৬. সিজ্দারত অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম জিবরাইল কর্তৃক মাথা উঠানোর উল্লেখ।

৭. সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবরাইল কথা বলবেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞাসা করে।

৮. ওহী প্রসঙ্গে ধ্বনিত বিকট আওয়াজে চেতনা হারানোর বিষয়টি আকাশমণ্ডলীর সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য।

৯. আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০. আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে ওহী নিয়ে জিবরাঈল গমন করেন।

১১. শয়তানের চুপিসারে আল্লাহর বাণী শোনার বর্ণনা।

১২. তাদের একে অপরের উপর সওয়ার হবার বর্ণনা।

১৩. শয়তানের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রেরণ।

১৪. কখনো কথা শুনে তা সহচরের কাছে পৌছানোর পূর্বেই অগ্নিগোলক গিয়ে শয়তানকে জ্বালিয়ে দিত, আবার কখনো অগ্নিসম্পাতের পূর্বেই কথা শয়তান তার সহচরের কাছে পৌছিয়ে দিত।

১৫. গণক বা জ্যোতিষরা কখনো কখনো সত্য কথা বলে থাকে।

১৬. তারা সাধারণত মূল কথার সাথে শতটি মিথ্যা কথা বলে।

১৭. শয়তান তার মিথ্যাচারের সত্যতা কেবল আকাশ থেকে শোনা কথা দিয়েই প্রমাণ করে।

১৮. মানুষের অন্তর বাতিলকে গ্রহণ করে থাকে। মানসিক প্রবৃত্তি শত শত মিথ্যা পরিত্যাগ করে একটি মাত্র সত্যকে কিভাবে গ্রহণ করতে পারে?

১৯. শয়তানরা তাদের শোনা কথাটি পরস্পর থেকে শুনে মনে রাখে এবং তা দিয়েই প্রমাণ করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে।

২০. আল্লাহ্র গুণাবলী সাব্যস্ত করা। যা আশ্'আরি ও মুআত্তালার বিপরীত।

২১. ফিরিশতাদের চেতনা হারিয়ে ফেলা ও আকাশমণ্ডলী প্রকম্পিত হওয়া আল্লাহর ভয়েরই প্রভাব।

২২. তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় অবনত হয়।

অধ্যায়-১৬
শাফা'আত (সুপারিশ)[1]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ (الأنعام: ٥١)

'তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সকল লোকদের ভয় দেখাও, যারা তাদের রব্বের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফাআতকারী থাকবে না।'[2] (সূরা আন'আম: ৫১)

---

[1] বিগত দুটি অধ্যায়ের পর এ অধ্যায়ের অবতারণা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। কেননা, যারা নবী ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করে এবং তাঁর নিকট ফরিয়াদ করে অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন নবী বা ওলীদের নিকট প্রার্থনা করে, যখন তাদের সামনে তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের (আল্লাহ্র প্রভুত্বের একত্ব) প্রমাণ পেশ করা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা তো তা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা হল আল্লাহ্র নিকটতম সম্মানিত বান্দা এবং আল্লাহ্র নিকট তাদের মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তাকে তারা সুপারিশের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করবে। কেননা আল্লাহ্র নিকট রয়েছে তাদের মর্যাদা, আরা তারা তাদেরই অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ মর্যাদা উঁচু করেছেন। যার ফলে তাদরে সুপারিশ কবুল করা হবে।' এ সব হল তাদের ভ্রান্ত ধারণা। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব মুশরিকদের অবস্থা ও তাদের প্রমাণাদি সামনে রেখে বলেন, যখন তাদের সাথে এসব ক্ষেত্রে তর্ক করা হয়, তাদের নিকট শুধু সুপারিশ করার দলীল ব্যতীত আর কোন দলীল নেই। যার ফলে এ পর্যায়ে শাফায়াতের অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে। শাফায়াত বা সুপারিশের অর্থ হল দু'আ। কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে সুপারিশ বা শাফায়াত কামনা করি, তার অর্থ হচ্ছে, আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করি তিনি যেন আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন আর এটি হল দু'আ-প্রার্থনা। কুরআন ও সুন্নাতের অন্যান্য দলীল দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট দু'আ-প্রার্থনা বাতিল সাব্যস্ত হয়। ঐ সমস্ত দলীল দ্বারা মৃত ব্যক্তি এবং যারা ইহকাল থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের থেকে সুপারিশ প্রার্থনা করাও বাতিল সাব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত-সুপারিশ চাওয়া মহা শির্ক। তবে জীবিত ব্যক্তির নিকট চাওয়া জায়েয, কেননা তারা তো ইহকালে অবস্থান করছেন এবং উত্তর দেয়ার সামর্থ রাখেন। আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত ব্যক্তি থেকে দু'আ করানো, সুপারিশ কামনা করার অনুমতি দিয়েছেন। যার ফলে নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় কখনো কখনো সাহাবীগণ আসতেন এবং তাদের জন্য দু'আর আবেদন করতেন। আমাদের জানা উচিত সব সুপারিশ ও দু'আ কবুল হবে এমন নয় বরং কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আবার কোনটি প্রত্যাখ্যানও হতে পারে। সুপারিশ গ্রহণ হওয়ারও কতিপয় শর্ত রয়েছে অনুরূপ প্রত্যাখ্যান হওয়ারও কিছু কারণ রয়েছে।

অতএব, আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সুপারিশ দুই প্রকার, (১) নিষিদ্ধ সুপারিশ (২) অনুমোদিত সুপারিশ। নিষিদ্ধ সুপারিশ হল, যে সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের জন্য নিষেধ করেছেন। যেমন, শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাহ্হাব (রাহি.) তার প্রথম দলীল সূরা আন'আমের ৫১নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

[2] তাওহীদপন্থী ব্যতীত সকলের জন্য এ শাফায়াত নিষিদ্ধ। আবার তাওহীদ পন্থীদের সুপারিশ বা শাফায়াত ও কবুল হবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে। আর তা হল, (১) সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহ্র পক্ষ

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (الزمر: ٤٤)

'বলুন, সমস্ত শাফাআত কেবলমাত্র আল্লাহরই ইখতিয়ার ভুক্ত।'[1] (সূরা যুমার: ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

'তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কে শাফাআত [সুপারিশ] করতে পারে?' (সূরা বাকারাহ্: ২৫৫)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন-

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم:٢٦)

'আকাশমণ্ডলে কতই না ফেরেশতা রয়েছে। তাদের শাফাআত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফাআত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।'[2] (সূরা নাজম: ২৬)

থেকে সুপারিশ করার অনুমতি। (২) সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে, উভয়ের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থাকা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সুপারিশের অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত কারো নয়। এজন্য লেখক (রাহি.) এরপর দ্বিতীয় আয়াত, ﴿قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ নিয়ে এসেছেন।

[1] সকল প্রকার সুপারিশ কেবল আল্লাহ্র অধিকারে। প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের ও যারা মুমিন নয় তাদের আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশের অধিকারী নেই। বরং সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই হবে। যেহেতু কোন সুপারিশ উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষেই উপকারে আসবে না। তাই এ লেখক (রাহি.) তারপর দুটি আয়াত নিয়ে আসেন। প্রথম আয়াত : ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ অর্থ: 'কে আছে যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?' (সূরা বাকারাহ্ঃ ২৫৫) দ্বিতীয় আয়াত : ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ অর্থ: 'আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।' (সূরা নাজমঃ ২৬)

[2] আয়াতদ্বয় আনার উদ্দেশ্য হল, প্রথম আয়াত দ্বারা অনুমতির শর্তারোপ করা। অর্থাৎ ফেরেশ্তা, নবী বা নৈকট্য অর্জনকারী যে কোন ব্যক্তি হোন না কেন আল্লাহ্র অনুমতি (শর্ত) ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র সুপারিশের মালিক এবং তিনিই একমাত্র সুপারিশের তৌফিক দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য সুপারিশকারীর কথার উপর এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি সন্তুষ্টি থাকতে হবে। উল্লেখিত শর্তসমূহের উপকারিতা যে সমস্ত মাখলুকের নিকট (অজ্ঞাতবশত) সুপারিশ কামনা করা হয়, তাদের সাথে সুপারিশের জন্য সম্পর্ক না রাখা এবং তাদের ক্ষেত্রে এ ধারণা না রাখা যে, আল্লাহ্র নিকট তাদের এমন মর্যাদা রয়েছে যার দ্বারা তারা সুপারিশ করার অধিকার রাখে। মুশরিকগণ এ

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾

(سبأ: ٢٢)

'[হে মুহাম্মদ, মুশরিকদেরকে] বলো, তোমরা তোমাদের সেই সব মা'বুদদেরকে ডেকে দেখো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের মা'বুদ মনে করে নিয়েছো, তারা না আকাশের, না জমিনের এক অনু পরিমাণ জিনিসের মালিক।'[1]

(সূরা সাবা : ২২)

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রাহি.) বলেছেন,[2] গাইরুল্লাহর জন্য রাজত্ব অথবা আল্লাহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোন

ধরণেরই বিশ্বাস করে যে, তাদের বাতিল মা'বূদগুলি অবশ্যই সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ্ তাদের সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারা ঐ সমস্ত মুশরিকদের দাবীর অসারতা প্রমাণিত যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি এবং যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কেউ সুপারিশের মালিক নয়। আর যে ব্যক্তি সুপারিশ করবে সে আল্লাহ্র অনুমতিতেই করতে পারবে। অতএব মাখলুকের সাথে তার সুপারিশ পাওয়ার জন্য তারা কিভাবে সম্পর্ক গড়তে চায়? পক্ষান্তরে সম্পর্ক তো শুধু তাঁরই সাথে হওয়া উচিত যে সুপারিশের প্রকৃত মালিক।

কিয়ামতের দিন নবী ﷺ নিঃসন্দেহে সুপারিশ করবেন; কিন্তু ঐ সুপারিশ আমরা কার নিকট চাইব? তা একমাত্র আল্লাহ্রই নিকট চাইব। এবং এভাবে বলব اللهم شفع فينا نبيك 'হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আপনার নবীর সুপারিশ নসীব করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলাই নবী ﷺ-কে সুপারিশের তৌফিক দিবেন ও অন্তরে ইলহাম করে দিবেন যে, অমুক অমুকের জন্য সুপারিশ করুন এটি তাদের জন্য যারা এটি সুপারিশের জন্য একমাত্র আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেছে যে, নবী ﷺ যেন তাদের জন্য সুপারিশ করেন। এ জন্যই শায়খ (রাহি.) তারপর সূরা সাবার ২২-২৩নং আয়াত বর্ণনা করেন।

[1] এখানে তিনটি অবস্থা রয়েছে, (১) যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের ডাকে তাদের দেখুক তারা কি আকাশে ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ ও কোন কিছুর মালিক? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ অর্থাৎ 'যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ মনে করতে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়।' অতএব তাদের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বলতে কোন কিছু নেই। (২) আল্লাহ্র কোন বিষয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্র তাদের মধ্য থেকে কেউ মন্ত্রীও নয় এবং সাহায্যকারীও নয়। (৩) শাফায়াতের অধিকার কারোর নেই তবে যে অনুমতি লাভ করবে সেই শাফায়াতের অধিকার পাবে। এক্ষেত্রে তাদের ভ্রান্ত আকীদাকে সূরা সাবার ২৩নং আয়াতের মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ১) কাকে এই অনুমতি দেয়া হবে? ২) শাফায়াতকারী হিসেবে আল্লাহ্ কার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন? ৩) কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন? উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার উক্তিতে বিদ্যমান।

[2] কিয়ামতের দিন উল্লেখিত শর্ত ব্যতীত সুপারিশ স্বীকৃত হবে না। মুশরিকদের বিশ্বাস যে, নিশ্চয়ই শাফায়াত সুপারিশ আল্লাহ্র অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীতই বর্জন হবে। কেননা তাদের নিকট সুপারিশকারীই হল সুপারিশের অধিকারী; কিন্তু প্রকৃত কথা হল, কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুপারিশ শর্ত সাপেক্ষে অর্জন

হওয়াই সাব্যস্ত। এ হল শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রয়োজনের দলীল। নবী ﷺ ও অন্যদেরকে অনুমতি দেয়া হবে; কিন্তু তাঁরা নিজেরাই শাফায়াত অনুমতি ব্যতীত শুরু করবেন না বরং তাঁরা **প্রথমতঃ** অনুমতি চাইবেন, তারপর তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া হবে। কেননা তাঁরা তো শাফায়াতের মালিক নন। তার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

সুতরাং যার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্টি থাকবেন তার জন্য আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে সুপারিশ করা হবে। আর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হল ইখলাসধারী ও তাওহীদপন্থী ব্যক্তি। অতএব উক্ত সুপারিশ মুশরিকদের ভাগ্যে জুটবে না। এ জন্য তিনি বলেন, ব্যাপার যদি এরূপই হয় তবে যারা মৃত ব্যক্তি, রাসূল, নবী, সৎ ব্যক্তি ওলী বা অসৎ ব্যক্তিদের প্রতি যারা ধাবিত হয় এবং তাদের নিকট শাফায়াত চায় তারা নিশ্চয়ই মুশরিক। কেননা তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট শাফায়াত চাওয়ার মাধ্যমে দু'আ প্রার্থনায় ধাবিত হয়েছে। অথচ তারা শাফায়াতের মালিক নয়। বরং তারা নিশ্চয়ই শাফায়াত করবেন অনুমতি ও সন্তুষ্টির পর আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হবে তাওহীদপন্থীদের জন্য। আর তাওহীদপন্থী হল যারা কোন মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত চায় না। অতএব যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত চাইল সে নিজেকে নবী ﷺ-এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করল। কেননা সে আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করল।

শাফায়াতের হাকীকত, অর্থাৎ শাফায়াত অর্জনের তাৎপর্য কি? কিভাবে শাফায়াত অর্জন হবে?

উত্তরঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যে, আল্লাহ্ তা'আলা শাফায়াতের মাধ্যমে তাওহীদপন্থীদেরকে ক্ষমা করবেন। সেটি হবে শাফায়াতকারীর ফযীলত ও তার প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য। আর এটিই হল শাফায়াতের হাকীকত, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করলেন ও তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে করানোর মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ ও সম্মানে প্রদর্শন করলেন এবং যার জন্য শাফায়াত করা হল তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করলেন শাফায়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে।

অতএব এ বিষয়টি অবশ্যই সম্পূর্ণই ফুটে উঠে কারণ রয়েছে আল্লাহ্র বড়ত্ব-মহত্ব ও তাঁর একক কর্তৃত্বের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি। আর তা হল, শাফায়াতের আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। হুকুম ও বাদশাহী সম্পূর্ণ তাঁরই। সুতরাং ব্যাপার যেহেতু এরূপই তাহলে শাফায়াতের প্রত্যাশ্যার জন্য একমাত্র তাঁরই সাথে অন্তরের সম্পর্ক গড়া ওয়াজিব। কুরআন মাজীদে ঐ শাফায়াতেরই নাকচ করা হয়েছে যার মধ্যে শির্ক রয়েছে যেমনঃ আল্লাহ্র তা'আলার বাণী,

﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (الأنعام : ٥١)

এ ধরণের বাণীর মধ্যে যে সমস্ত শাফায়াতে শির্ক রয়েছে তার নাকচ হয়েছে। অনুরূপ মুশরিকদের জন্যেও শাফায়াত করাও নিষেধ। কেননা আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হননি। অতএব যখন এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, তিনিই শাফায়াত বাস্তবায়নকারী, তিনিই নিয়ামত দানকারী, তিনিই তাঁর মহত্ব প্রকাশের সমর্থ দেন এবং অন্তর একমাত্র তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত করার তৌফিক দিবেন। তারই সাথে শাফায়াত সুসাব্যস্ত। সুতরাং প্রত্যেক মহা শিরকে পতিত ব্যক্তি থেকে শাফায়াত নাকচ হয়ে যায়। কেননা শাফায়াত হল ইখলাস-তাওহীদপন্থীদের জন্য যা আল্লাহ্র একটি অনুগ্রহ।

আর এ হল স্বীকৃত শাফায়াত অর্থাৎ যা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে সুসাব্যস্ত। অনুমতি দুই প্রকার, (১) অবস্থাগত অনুমতি (২) শরীয়তসম্মত অনুমতি।

অবস্থাগত অনুমতির অর্থ হল: যে ব্যক্তি শাফায়াতের অনুমতিপ্রাপ্ত সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমিত পাওয়ার পূর্বে কখনোও শাফায়াত করতে পারবে না। অতএব আল্লাহ্ যদি তাকে বাধা দিয়ে থাকেন তবে তারা দ্বারা শাফায়াত সম্ভব হবে না, এমনকি সে মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবে না।

শরীয়তসম্মত অনুমতি অর্থ হল শাফায়াতে শির্ক অন্তর্ভূক্ত যেন না হয় এবং যার জন্য শাফায়াত করা হবে সে যেন মুশরিক না হয়। অবশ্য নবী ﷺ-এর চাচা আবু তালেব এ বিধানের আওতামুক্ত। কেননা তার ক্ষেত্রে নবী ﷺ তার আযাব হালকা হওয়ার জন্য শাফায়াত করবেন। কিন্তু শাফায়াত তাকে জাহান্নাম

গাইরুল্লাহ সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকি থাকল শাফাআতের বিষয়। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, 'আল্লাহ তাআলা শাফাআত [সুপারিশ] এর জন্য যাকে অনুমতি দিবেন তার ছাড়া আর কারো শাফাআত কোন কাজে আসবে না।'

আল্লাহ্ বলেছেন :

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾ (الأنبياء: ٢٨)

অর্থ: 'তিনি [আল্লাহ] যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে, কেবলমাত্র তার পক্ষেই তারা শাফাআত [সুপারিশ] করবে।' (সূরা আম্বিয়া: ২৮)

মুশরিকরা যে শাফাআতের আশা করে, কিয়ামাতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কুরআনে কারীমও এ ধরনের শাফাআতকে অস্বীকার করেছে। নবী করীম ﷺ জানিয়েছেন,

أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ــ لا يبدأ بالشفاعة أولا ــ ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفّع.

তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তাঁর রব্বের উদ্দেশ্যে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফাআত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, 'হে মুহাম্মদ, তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাকো, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। তুমি চাইতে থাকো, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাকো, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'

আবু হুরাইয়ারা (রাঃ) রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, 'যে ব্যক্তি খালেস দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।'

এ হাদীসে উল্লেখিত শাফাআত [বা সুপারিশ] আল্লাহ তাআলার অনুমতি প্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরিক করবে তার ভাগ্যে এ শাফাআত জুটবে না।

এ আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা মুখলিস বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা

থেকে বের করার জন্য কোন উপকারে আসবে না বরং তা হবে শুধু আযাব হালকা করার জন্য। আর এ ব্যাপারটি নিতান্তই নবী ﷺ-এর জন্য কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁকে ওহী করেন ও এর অনুমতি দেন।

করে দিবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফাআতকারীকে সম্মানিত করা এবং মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফাআতকে অস্বীকার করেছে, তাতে শির্ক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফাআত এর স্বীকৃতির কথা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, শাফাআত একমাত্র তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর।
২. যে শাফা'আতকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি।
৩. শরীয়ত অনুমোদিত শাফা'আতের প্রকৃতি তথা গুণ ও বৈশিষ্ট্য।
৪. সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফা'আতের উল্লেখ। আর তা হচ্ছে, 'মাকামে মাহমূদ' বা 'প্রশংসিত স্থান'।
৫. রাসূল ﷺ [শাফাআতের পূর্বে] যা করবেন তার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফাআতের কথা বলবেন না, বরং তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফাআত করতে পারবেন।
৬. শাফা'আতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ।
৭. আল্লাহর সাথে শির্ককারীর জন্য কোন শাফা'আত গৃহীত হবে না।
৮. শাফা'আতের স্বরূপ বর্ণনা।

---

[1] শাফায়াতের এ অধ্যায়ের মাধ্যমে ফুটে উঠে যে, বিদ'আতী কুসংস্কারবাদী ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্ককারীরা যে শাফায়াতের সাথে সম্পর্ক রাখে তা নিশ্চয়ই বাতিল শাফায়াত। আর তাদের বক্তব্য, ﴿وهؤلاء شفعاءنا عند الله﴾ বাতিল ও ভ্রান্ত বক্তব্য। কেননা যে শাফায়াত কার্যকরী তা শুধু তাওহীদপন্থী ইখলাসবাদীদের জন্যই। যেহেতু তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের নিকট শাফায়াত তলব করে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট শাফায়াত প্রার্থনা করে। আর এটিই হল তাদের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আলামত।

এ অধ্যায়ের ফল কথা হল, উক্ত বিদ'আতী ও কুসংস্কারবাদীদের যে শাফায়াতের সাথে সম্পর্ক তা তাদের কোন উপকার করবে না বরং ক্ষতি করবে। কেননা তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট শাফায়াত কামনা করে প্রকৃত শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তার এমন কিছুতে জড়িত হয়েছে আল্লাহ্ যার কোন অনুমোদন দেননি। কেননা তারা শির্কী শাফায়াত ব্যবহার করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের শরণাপন্ন হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়েছে।

অধ্যায়-১৭
হিদায়াত দানকারী একমাত্র আল্লাহ্

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (القصص: ٥٦)

'নিশ্চয়ই আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে আপনি হেদায়াত করতে পারবেন না।'[1] (সূরা কাসাস: ৫৬)

সহীহ বুখারীতে ইবনুল মোসাইয়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এল, তখন রাসূল ﷺ তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ এবং আবু জাহল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'চাচা, আপনি *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলুন। এ কালিমা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য কথা বলব, তখন তারা দু'জন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তাকে বলল, 'তুমি আবদুল

---

[1] হিদায়াত দুই প্রকার, প্রথমত: হিদায়াতে তাওফীক ও ইলহাম। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক বান্দাকে হেদায়েত কবুলের জন্য বিশেষ সাহায্য করা। আর তার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তাঁর কোন বান্দার অন্তরে হিদায়াত গ্রহণের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। যা অন্যের অন্তরে দেননি। অতএব তৌফিক হল, বিশেষ সাহায্য লাভ, আল্লাহ যার জন্য পছন্দ করেন তাকে তার তৌফিক দান করলে সে হিদায়াত গ্রহণ করে থাকে এবং এর মধ্যে প্রচেষ্টা করে থাকে। সুতরাং তা অন্তরে দেয়া হয় নবী ﷺ-এর হাতে নয়। এমনকি নবী ﷺ যাকে পছন্দ করেছিলেন তাকে মুসলমান করতে ও হিদায়াত দান করতে পারেননি। যিনি তাঁকে আত্মীয়দের মাঝে সর্বাধিক উপকার সাধন করেছিলেন তিনি হলেন আবু তালেব। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে হিদায়াতের তৌফিক দান করতে পারেন নি।

হিদায়াতের দ্বিতীয় প্রকার, এর সম্পর্ক মানুষের সাথে। এ হল ইরশাদ ও নির্দেশ সূচক হিদায়াত, এ হিদায়াত নবী ﷺ-এর জন্য ও আল্লাহ্র পথে প্রত্যেক আহ্বানকারী ও প্রত্যেক নবী রাসূল ﷺ-এর জন্য সাব্যস্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ 'আপনি তো শুধু ভীতি প্রদর্শনকারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্য না কেউ হিদায়াতকারী অবশ্যই হয়ে থাকে।' (সূরা রা'দঃ ৭) তিনি নবী ﷺ-কে আরো বলেন, ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ 'নিশ্চয়ই মানুষদেরকে আপনি সরল পথের দিকে নির্দেশনা দেন।' (সূরা শুরাঃ ৫২) অর্থাৎ আপনি সর্বোত্তম দলীল ও সর্বোত্তম নির্দেশিকা দ্বারা লোকদেরকে সরল পথের দিকে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন। যা মো'যেযা এবং শক্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা মদদপুষ্ট এবং যা আপনার সততারও প্রমাণ বহনকারী।

যখন হিদায়াতে তৌফিক মুহাম্মদ ﷺ-এর এত মহত্ব, শান ও তাঁর রবের নিকট এত মর্যাদা সত্ত্বেও নাকচ হয়ে যায়। অতএব বড় বড় উদ্দেশ্য যেমন হিদায়াত, ক্ষমা প্রদর্শন, সন্তুষ্টি কামনা, খারাপী থেকে দূরত্ব কামনা ও যাবতীয় কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্ক রাখা বাতিল পর্যবসিত হয়।

মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে?' নবী (ﷺ) তাকে কলেমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন। তারা দু'জন আবু তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বলল। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল এরূপ যে, সে আবদুল মোত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল ছিল এবং *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলতে অস্বীকার করেছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আপনার ব্যাপারে যতক্ষন পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব।' এরপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة :١١٣)

অর্থ: 'মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নবী এবং ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় কাজ নয়।" (তাওবা: ১১৩)

আল্লাহ তাআলা আবু তালিবের ব্যাপারে এ আয়াত নাজিল করেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (القصص: ٥٦)

অর্থ: 'আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন।' (আল-কাসাস: ৫৬)[1]

---

[1] لأيتغفرن لك ما لم أنه عنك لأيتغفرن..... وفي الصحيح عن ابن المسيب শব্দের মধ্যে لام শপথের জন্য ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দু'আ করব। আর নবী ﷺ প্রকৃত পক্ষেই স্বীয় চাচার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করেছেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর এ দু'আ কি তাঁর চাচার কোন উপকারে এসেছিল? কোনই উপকারে আসেনি, কেননা এখানে যার জন্য শাফায়াত করা হয়েছিল সে মুশরিক ছিল। আর ক্ষমা প্রার্থনা ও শাফায়াত মুশরিকদের জন্য উপকারে আসবে না। নবী ﷺ-এর এ অধিকার নেই যে কোন মুশরিকের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তাকে কোন উপকার সাধন করে দিবেন বা কোন ব্যক্তি শির্ক করে তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে আর তিনি তার বিপদাপদ দূর করে কল্যাণ সাধন করে দিবেন। এ জন্যই তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বিরত না করা হবে অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন, : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ অর্থাৎ 'নবী ও অন্যান্য মুমিনদের জন্যে জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (সূরা তাওবাঃ ১১৩)

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ-কে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। ব্যাপার যদি এরূপই হয় তবে যদি মনে করা হয়, নবী ﷺ আ'লমে বারযাখে ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করতে পারেন তবুও তিনি কোন এমন মুশরিকের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে পারেন না। যে আল্লাহ ব্যতীত তাঁর নিকট শাফায়াত তলব করে, ফরিয়াদ করে, জবাই করে, মানত করে, অথবা তাঁকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করে, তাঁর উপর ভরসা করে অথবা তাঁর নিকট স্বীয় প্রয়োজন তুলে ধরে শিরকে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আবু তালিবের ব্যাপারে অবতীর্ণ করেন, ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾- এ আয়াতটির তাফসীর।

২. ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ সূরা তাওবার ১১৩নং আয়াতের এ অংশটির তাফসীর।

৩. قل لا إله إلا الله অর্থাৎ 'আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন', রাসূল ﷺ-এর এ কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবীদারদের বিপরীত। (যারা দাবী করে যে শুধু জানাই যথেষ্ট)

৪. রাসূল ﷺ মৃত্যুপথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলুন, এ কথার দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কি উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল। দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যার তুলনায় আবূ জাহল ইসলামের মূলের ব্যাপারে বেশী ওয়াকিবহাল ছিল।

৫. আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণপন চেষ্টা।

৬. যারা আবদুল মুত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবি করে, তাদের দাবিসমূহ উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা খণ্ডন হয়ে যায়।

৭. রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধজ্ঞা এসেছে।

৮. মানুষের উপরে খারাপ সঙ্গীদের কুপ্রভাব।

৯. পূর্ববর্তী তথা পূর্ব-পুরুষ এবং পীর-বুজুর্গদের সম্মানে বাড়াবাড়ি করার ক্ষতি।

১০. আবূ জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীদের অন্তরে সংশয়।

﴿أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ 'তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসরণকারীদেরকে।'

১১. সর্বশেষ আমলের উত্তম পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা, আবূ তালিব যদি শেষ মুহূর্তে কালিমা পাঠ করত তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

১২. গোমরাহীতে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্তার বিষয় নিহিত রয়েছে। কেননা উক্ত ঘটনায় ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা [কাফির-মুশরিকরা] তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভালবাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে এর [গোমরাহীর তথাকথিত] সুস্পষ্টতা ও [তথাকথিত] শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

অধ্যায়-১৮

নেককার পীর-বুজুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ[1]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (النساء: ١٧١)

---

[1] শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহি.) এ অধ্যায় ও এর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করেন যে, এ উম্মত ও পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝে শির্ক অনুপ্রবেশের নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় কারণ হল, সৎ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে الغلو অর্থাৎ বাড়াবাড়ি সীমালংঘন করা, যা থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। মৌলিক নীতিমালা ও আকীদার বর্ণনার পর এক্ষেত্রে পথ-ভ্রষ্টতার কারণ বর্ণনা উদ্দেশ্য।

الغو : غلو শব্দটি আরবী বাক্য غلا في الشيئ কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা বুঝায় যখন বিষয়টিকে নিয়ে সীমালংঘন হয়ে যায়। অতএব বনী আদমের কুফরী ও তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করার কারণ হল, সৎ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদায় ঐ সীমা অতিক্রম করা যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন।

সৎব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হল, নবী, রাসূল, ওলী এবং প্রত্যেক ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সৎ ও ইখলাসের গুণে গুণান্বিত। তাঁরা হল যাবতীয় নেক কাজে অগ্রগামী বা মধ্যপন্থী। আর তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র নিকট মর্যাদা। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সৎলোকদেরকে ভালবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাঁদের সৎকর্ম ও ইলমের অনুসরণ করা হল আমাদের করণীয়। সৎব্যক্তিগণ যদি নবী ও রাসূল ﷺ-এর অন্তর্ভূক্ত হন তবে তাঁদের শরীয়ত ও হুকুম আহকামের উপর চলতে হবে এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন এবং তাদের প্রতি আন্তরিকতা, তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও তাঁদেরকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

তাদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নমুনা হল, তাঁদের কাউকে কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে দেয়া বা কারো কারো ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, তিনি লাওহ ও কলমের ভেদ (গোপন রহস্য) জানেন বা তিনিই ভূপতি। যেমন, বুসাইরীয় তার প্রসিদ্ধ কবিতায় আবৃত্ত করেন,

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নবী ﷺ-কে এমন কোন নিদর্শন দেয়া হয়নি যা তার মান-মর্যাদার সমতুল্য হতে পারে। এই কবিতায় ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, 'নবী ﷺ-কে যত নির্দেশনাবলী মোজেযা দেয়া হয়েছে এমন কি আল-কুরআনেরও মর্যাদা তাঁর সমতুল্য নয়।' (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালিক) আরো বলা হয়, 'তাঁর তো এত বড় স্থান ও মর্যাদা যে, তাঁর নাম নেয়ার ফলে মৃতদের মাটিতে মিশে যাওয়া হাড় একত্রিত হয়ে জীবিত হয়ে যায়।' এ ধরণের বাড়াবাড়ি তারাই করে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের পূজারী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে নবী ও রাসূলদের দিকে ধাবিত হয় ও তাদের মধ্যে আল্লাহ্র গুণাবলীতে বিশ্বাসী অথচ যার কখনোও অনুমতি দেয়া হয়নি বরং তা হল তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহা শির্ক স্থাপন এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাদৃশ্য জ্ঞাপন নাউযুবিল্লাহ্। এ হল আল্লাহ্র সাথে কুফরী। অতএব এখানে রয়েছে শরীয়ত অনুমোদিত সৎলোকদের সম্মানের সীমা-রেখা এবং অন্য দিকে রয়েছে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি। এক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থা হল, অত্যাচার, কঠোরতা ও অবিচার, অর্থাৎ সৎলোকদের সাথে আন্তরিকতা, সম্মান ও তাঁদের হক আদায় না করে এবং তাঁদের না ভালবেসে তাদের প্রতি অবিচার করা। সুতরাং তাঁদের অবজ্ঞা করা হল অবিচার ও তাঁদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হল সীমালঙ্ঘন।

'হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করো না।'[1] (সূরা নিসা: ১৭১)

সহীহ হাদিসে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (نوح: ٢٣)

"এবং [কাফেররা] বলল, 'তোমরা নিজেদের মাবূদগুলোকে পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে 'ওয়াদ', 'সুআ', 'ইয়াগুছ' 'ইয়াউক' এবং 'নসর' কে কখনো পরিত্যাগ করো না।"[2] (সূরা নূহ: ২৩)- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এগুলো হচ্ছে নূহ (عليه السلام)-এর কওমের কতিপয় নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যু বরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, 'যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত, সে সব জায়গাগুলোতে তাদের [বুজুর্গ ব্যক্তিদের] মুর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মুর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মুর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপন কারীরা যখন মৃত্যু বরণ করল এবং মুর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল, তখনই মুর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হল।

---

[1] ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবকে বাড়াবাড়ি করা থেকে নিষেধ করেছেন। تغلوا ক্রিয়াটি نهى এরপর আসার কারণে দ্বীনের ভিতর সব ধরণের বাড়াবাড়ি নিষেধ। আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তারা সৎব্যক্তিদেরকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করেছে। যেমন, খ্রিস্টানরা ঈসা (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তারা বাড়াবাড়ি করেছে তাঁর মাতা মারইয়াম ও তাঁর হাওয়ারীদেরকে নিয়ে। ইহুদীরাও বাড়াবাড়ি করেছে উযাইর (আঃ), মূসা (আঃ)-এর সাথী ও তাদের পুরোহিত পাদরীগণকে নিয়ে। তারা তাদের জন্য আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যসমূহ সাব্যস্ত করে তাদের নিকট শাফায়াত তলব করে, মনে করে যে বিশ্বজগতের আধিপত্যে তাদের অংশ রয়েছে। তাঁরা কার্যপরিচালনা করে যা বিশ্বজগত নিয়ন্ত্রণ তাদেরও কিছু কর্তৃত্ব রয়েছে।

[2] وفي الصحيح عن ابن عباس.... في قول الله تعالى..... ونسرا .... إلى قومهم নূহ (আঃ)-এর জাতিতে শিরকের অনুপ্রবেশ। নূহ (আঃ)-এর জাতি যে শিরকে নিমজ্জিত ছিল তাহল, সৎব্যক্তি ও তাঁদের রূহের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। শয়তান সে জাতির নিকট বুজুর্গ ব্যক্তির আকৃতিতে আগমন করে এবং তার বুজুর্গী ও আল্লাহ্র নৈকট্যের দাবী করে বলে, যে ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক গড়বে তার জন্য আমি শাফায়াত করব। অতএব শয়তান তাদেরকে সম্মানের এ পর্যায় থেকে নিয়ে যায় প্রতিকৃতি, মূর্তি, আস্তানাও দরগাহ পর্যন্ত। যেমন আলোচ্য অংশে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) এই শিরকে পতিত হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'তারা যখন ধ্বংস হয়ে যায়, শয়তান তাদের জাতির অন্তরে ইলহাম করে দেয় যে, তারা যেখানে অবস্থান করত সেখানে আস্তানা বা দরগাহ গড়ে তোল এবং তাদের নামে নামকরণ কর। অতপর তারা তাই করল, তবে ইবাদত শুরু হল না। অতপর যখন তারা মারা গেল, জ্ঞান ও উঠিয়ে নেয়া হল। তাদের ইবাদত শুরু হয়ে গেল।'

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.) বলেন, একাধিক আলেম বলেছেন, 'যখন নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকত। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করল। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের ইবাদতে লেগে গেল।[1]

ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ ح: ٣٤٤٥، وأصله عند مسلم في الصحيح ح:١٦٩١)

'তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে প্রশংসা করেছিল নাসারারা মরিয়ম পুত্র ঈসা (عليه السلام)-এর। আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে।"[2]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯১)

ওমর (রা.) আরো বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ (سنن النسائي، المناسك، باب التقاض الحصى، ح:٣٠٥٩ وسنن ابن ماجة، المناسك، باب قدر حصى الرمي، ح:٣٠٢٩)

---

[1] وقال ابن القيم : قال غير واحد .... فعدوهم এ অংশের উদ্দেশ্য হল, তারা যখন ঐ বুজুর্গ ব্যক্তিদের ছবি তৈরি করার ইচ্ছা করে তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা ঐ সমস্ত ছবির পূজা করবে না, কেননা তারা জ্ঞানী ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটল তখন ঐ ছবিগুলোর পূজা করা সৎলোক ও বুজুর্গদের নৈকট্য অর্জনের উসীলা ও কারণ মনে করতে লাগল। শয়তান কখনো কখনো উক্ত ছবি প্রতিকৃতির নিকট এসে তার দর্শকদের বা উপস্থিত ব্যক্তিদের মনে এ ধরণের প্রভাব ফেলত যে এ প্রতিকৃতি তো কথা বলতে পারে এবং কথাও শ্রবণ করতে পারে- এ ধরণের বহু ধারণা তাদেরকে দিয়ে থাকে। যার ফলে তাদের অন্তর সৎব্যক্তিদের রূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। পরিশেষে শয়তান তাদেরকে বুজুর্গদের পূজার প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে।

বর্তমান এ অবস্থা হল ঐ লোকদের যারা কবর-মাজারে গিয়ে সলাতের মত করে বসে ও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের সাথে তাদেরও ইবাদত করে। আর এ আমলই আল্লাহ্র সাথে শির্ক করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[2] وعن عمر أنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُطْرُونِي .... ابْنَ مَرْيَمَ

শব্দের অর্থ হল, কারো প্রশংসায় সীমালংঘন করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় প্রশংসায় সীমালংঘন করতে এ জন্য নিষেধ করেন যে, খ্রিস্টানরা যখন ঈসা (আঃ)-এর প্রশংসায় সীমালংঘন করল তখন তার ফল হল তারা কুফর ও শিরকে পতিত হওয়ার সাথে সাথে তারা এ দাবীও করে বসল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র। এ জন্যই তিনি বলেন : إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ 'আমি তো একজন বান্দা, অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূলই বল।'

'তোমরা বাড়া-বাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমা লঙ্ঘন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে।' *(সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৫৯; সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৯)*[1]

মুসলিম শরীফে ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ– قَالَهَا ثَلاثًا (صحيح مسلم، العلم، باب هلك المتنطعون، ح:٢٦٧٠)

'দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।'- এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭০)*[2]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টি সহ পরবর্তী দু'টি অধ্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্য জনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২. পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের সূচনা, যা নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সংশয় ও সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

৩. সর্বপ্রথম যে জিনিসের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে এ কথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে [দ্বীন কায়েমের জন্য] পাঠিয়েছেন।

---

[1] وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، .... مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ

এ হাদীসে সব ধরণের বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা বাড়াবাড়িই হল সমস্ত খারাবির কারণ। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা অবলম্বন হল সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি।

[2] ولمسلم : عن ابن مسعود ..... هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ– قَالَهَا ثَلاثًا

المتنطعون দ্বারা এমন লোকেরা উদ্দেশ্য যারা স্বীয় কথায়-কাজে ও কোন জ্ঞানার্জনে এমন চরম বাড়াবাড়ি করবে এবং চরম পন্থা অবলম্বন করবে যা আল্লাহ্ অনুমতি দেননি।

تنطع، إطراء، غلو সমার্থবোধক শব্দ তবে غلو শব্দেই সব অর্থ এসে যায়। শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহি:) এ অধ্যায়ে সাব্যস্ত করেন যে, বনী আদমের কুফরীর কারণ হল তাদের দ্বীন পরিত্যাগ করা ও সৎব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। যেমন, নূহ (আঃ)-এর জাতি সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, তাদের কবরে গিয়ে অবস্থান নেয় ও পরবর্তীতে তাদের পূজা শুরু করে। তেমনি খ্রিস্টানরা তাদের রাসূল ঈসা (আঃ), হাওয়ারী ও তাদের পাদ্রীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে পরিশেষে তাদেরকেও আল্লাহ্‌র সাথে মা'বুদ সাব্যস্ত করে। অনুরূপভাবে, এ উম্মতের লোকেরাও নবী (ﷺ)-এর জন্যও আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু তাঁর জন্য সাব্যস্ত করে, অথচ নবী (ﷺ) এ সবই নিষেধ করেছেন।

৪. 'শরীয়ত' ও 'প্রকৃতি' বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিদা'আতকে গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ।

৫. উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতেলের সংমিশ্রণ, এর প্রথমটি হচ্ছে, সালেহীন বা নেককার ও বুজুর্গ লোকদের প্রতি [মাত্রাতিরিক্ত] ভালোবাসা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে বিদ'আত ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬. সূরা নূহের ২৩নং আয়াতের তাফসীর।

৭. মানুষের অন্তরে হকের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ কম। কিন্তু বাতিলের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ অপক্ষোকৃত বেশি।

৮. কোন কোন সালাফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, বিদ'আত হচ্ছে কুফরির কারণ। তাছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে এটাকেই বেশি পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তওবা করা সহজ হলেও বিদ'আত থেকে তওবা করা সহজ নয়। [কারণ বিদ'আত তো সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয় বলে পাপের অনুভূতি থাকে না, তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভুত হয় না]

৯. আমলকারীর নিয়ত যত মহৎ হোক না কেন, বিদআতের পরিণতি কি, তা শয়তান ভাল করেই জানে। এ জন্যই শয়তান আমল কারীকে বিদআতের দিকে নিয়ে যায়।

১০. 'দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করা না করা'- এ নীতি সম্পর্কে এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১১. নেক কাজের নিয়তে কবরের পাশে ধ্যানমগ্ন হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১২. মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩. হাদীসে উল্লেখিত নূহ (আ:)-এর জাতির ঘটনাটির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা। যদিও অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে উদাসীন।

১৪. সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, বিদ'আত পন্থীরা তাফসীর ও হাদীসের কিতাবগুলোতে শির্ক ও বিদ'আতের কথাগুলোকে পড়েছে এবং

আল্লাহ্‌র কালামের অর্থও তারা জানত, শির্‌ক ও বিদ'আতের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরও তারা বিশ্বাস করত যে, নূহ (আ:)-এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা এ কথাও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরী যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়। [অর্থাৎ হত্যা করে ধন-সম্পদ দখল করা যায়।]

১৫. এটা সুস্পষ্ট যে, তারা শির্‌ক ও বিদ'আত মিশ্রিত কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬. তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যেসব পন্ডিত ব্যক্তিরা ছবি ও মূর্তি তৈরি করেছিল তারাও শাফায়াত লাভের আশা পোষণ করত।

১৭. 'তোমরা আমার মাত্রারিক্ত প্রশংসা কর না যেমনিভাবে খ্রিস্টানেরা মরিয়ম তনয়কে করত।'- এ মহান বাণীর দাওয়াত রাসূল ﷺ পূর্ণাঙ্গভাবে পৌছিয়েছেন।

১৮. রাসূল ﷺ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯. এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত মুর্তি পুজার সূচনা হয়নি। ফলে এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২০. ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আলেমগণের মৃত্যু।

অধ্যায়-১৯

নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?[1]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাবশায় যে গীর্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা রাসূল ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ বললেন,

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ (صحيح البخاري، الصلاة، باب تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ح:٤٢٨، ١٣٤١ وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، ح:٥٢٨)

'তাদের মধ্যে কোন নেককার বুজুর্গ ব্যক্তির মৃত্যু বরণ করার পর তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরী করত এবং মসজিদে ঐ ছবিগুলো অংকন করতো। [অর্থাৎ তুমি সে জাতীয় ছবিগুলোই দেখেছ]। তারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।' তারা দুটি ফিতনাকে একত্রিত করেছে। একটি হচ্ছে কবর

---

[1] আলোচ্য অধ্যায় ও এর পরবর্তী অধ্যায়গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, নবী ﷺ স্বীয় উম্মতের হিদায়াতের জন্য একান্ত আগ্রহী ছিলেন। এ জন্য তিনি উম্মাতকে প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে সতর্ক করে দেন ও তার উপকরণগুলো বন্ধ করে দেন যা কিছু শিরক পর্যন্ত পৌছার কারণ হতে পারে। এখানে এমন ধরণেরও শিরকের ব্যাপারে কঠোরতা এসেছে যে, কেউ যদি কোন সৎ ব্যক্তির কবরে এ উদ্দেশ্যে আসে যে সে সেখানে একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে কিন্তু সেখানের বরকত কামনার মাধ্যম। এ ধরণের উদ্দেশ্য বহুলোকের হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, সৎব্যক্তিদের কবর ও তার নিকটবর্তী জায়গা বরকতময় এবং সেখানে ইবাদত করা সাধারণ জায়গা থেকে ভিন্ন। যেহেতু ঐ কবরগুলোর নিকটে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার অনুমতি নেয় তবে উক্ত কবর বা কবরে শায়িত ব্যক্তির কিভাবে ইবাদত জায়েয হবে? অথচ দেখা যায় যে, কবর ভক্তদের প্রবণতা কখনো কবরের দিকে কখনো, কবরবাসীর প্রতি বরং কখনো দেখা যায় কবরের আশে-পাশে। সুতরাং ওলীদের কবরের ভিত্তি-বাউন্ডারী মাজারে পরিণত হয়। কখনো কবরের লোহার বেস্টনীকেই মা'বূদ বানিয়ে নেয়া হয়। কেননা: যখন তা স্পর্শ করে বরকতের নিয়তেই স্পর্শ করে এবং তারা সেটিকে আল্লাহ্‌র নিকট পৌছার উসীলা মনে করে সলাতরত অবস্থায় বসার মতোই বসে এবং তার ইবাদত করে তার প্রত্যাশা রাখে ও তাকে ভয় পায়।

পুজার ফিতনা। অপরটি হচ্ছে মূর্তি পূজার ফিতনা। *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৭, ১৩৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৭)*[1]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থায়ই তিনি বললেন,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:٣٤٥٣، ١٣٩٠ وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ح:٥٢٩)

'ইয়াহুদী নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।' তিনি ﷺ এ ব্যাপারে [তাঁর উম্মতের জন্যও] আশংকা করতেন। তাই, তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন। যদি তিনি ﷺ তাঁর কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশঙ্কা না করতেন, তাহলে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো।[2]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৫৩, ১৩৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯)

---

[1] في الصحيح عن عائشة.... بأن أم سلمة ذكرت ... فيه تلك الصور

মসজিদ প্রত্যেক ঐ স্থানকেই বলা হয় যে স্থানকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করা হয়। আর উক্ত সৎব্যক্তিদের কবরে আস্তানা ও উক্ত কবর ও কবরের আশেপাশের সীমানায় তার প্রতিকৃতি এ জন্যই ছিল যে, যেন লোকদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকেই আহ্বান করার সাথে সাথে উক্ত সৎব্যক্তি ও তার কবরের সম্মান ও মর্যাদা করা হয়। সুতরাং তারাই হল অর্থাৎ যারা সৎ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। অথচ উক্ত হাদীসে এ ধরণের কথা নেই যে তারা ঐ সৎলোকদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল, বরং তারা শুধু তাদের কবরকে সম্মান প্রদর্শন করেছিল ও প্রতিকৃতি তৈরি করেছিল। সুতরাং সেখানে দুই ফিতনার সমন্বয় ঘটেছিল, কবরের ফিতনা ও প্রতিকৃতির ফিতনা। আর উভয় ফিতনা হল মহা শিরকের উসীলা। এ থেকে আমরা এ উম্মতের মধ্যে কারো কবরে ইবাদতগাহ বানিয়ে নেয়ার হুঁশিয়ারিই বুঝতে পারি।

[2] ولهما عنها যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যুাসন্ন হল, ... طفق يطرح له على وجهه

এ হাদীসটি শিরকের উসীলা ওলী ও সৎলোকদের কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ও কবরে মসজিদ নির্মাণ করার প্রতি কঠোরতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। কেননা নবী ﷺ অতি কষ্ট, অস্থিরতা ও মৃত্যু যন্ত্রণার সময়ও এ বিষয়টি ভুলে যাননি। বরং তিনি স্বীয় উম্মতকে শিরকের উসীলাগুলো থেকে বাঁচার জন্য এমতাবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন এবং তিনি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি অভিশাপ ও বদদু'আ করেন। কেননা তারা পরবর্তী নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় নবী ﷺ এ আশংকা করেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের কবরকে যেমন মসজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে নেয়া হয়েছে। অনুরূপ হয়ত তাঁর কবরকেও বানিয়ে নেয়া হবে। আর তিনি যে অভিশাপ করেছেন তার দ্বারা

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'রাসূল (ﷺ)-কে তাঁর ইন্তেকালের পাঁচদিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি,

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ح:٥٣٢)

'তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার খলীল [বন্ধু] হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ

প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সাহাবাদেরকে উক্ত কর্ম থেকে সতর্ক করা এবং জানিয়ে দেয়া যে, তাদের ঐ কৃতকর্ম কবীরা গুনাহ ছিল। অতএব এ থেকে তারা যেন বেঁচে থাকে।

কোন কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে নেয়ার তিনটি রূপ, **প্রথমত:** কবরে সিজদা করা এ হল সবচেয়ে ভয়াবহ। **দ্বিতীয়ত:** কবর সম্মুখে রেখে সলাত আদায় করা। এমতাবস্থায় যেহেতু কবর ও তার আশ-পাশের জায়গাকে বিনয়-নম্রতা প্রকাশের জায়গা বানিয়ে নেয়া হয়। অথচ মসজিদ হল বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের স্থান। এজন্যই নবী (ﷺ) কবর সম্মুখে রেখে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেন। কেননা কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা তার সম্মান ও মর্যাদা দানের একটি উসীলা ও কারণ। আর এ অবস্থাটিই শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। **তৃতীয়ত:** মসজিদের অভ্যন্তরে কবর দেয়া। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা নবীকে দাফন-দাফন করে তার কবরের পার্শ্বে বিল্ডিং তৈরি করে তার চারপার্শ্বকে মসজিদে পরিণত করে সেখানে তারা ইবাদত ও সলাত আদায় করত।

নবী (ﷺ)-কে সাধারণ কবরস্থানে দাফন না করার কারণসমূহ: (১) আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ)-কে বাইরে সাধারণ কবরস্থানে এ ভয়ে দাফন করা হয়নি যে, তার কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে সেখানে পূজা করা শুরু হত। (২) কারণ হল আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী (ﷺ) বলেন, অর্থঃ 'নবীগণের যেখানে মৃত্যু হয়, সেখানেই দাফন করা হয়।' সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী (ﷺ)-এর ভীতি প্রদর্শন গ্রহণ করেন ও তাঁর অসীয়ত অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে তাঁরা রওজা শরীফ (নবী (ﷺ)-এর বাড়ী ও তাঁর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানকে রওজা বলা হয়।) থেকে তিন মিটার বা তার চেয়েও কিছু অতিরিক্ত জায়গা নিয়ে প্রথমে এক দেয়াল ছিল তারপর দ্বিতীয় দেয়াল তারপর তৃতীয় দেয়াল অতপর লোহার বেড়া দেন। সাহাবাদের এ কাজটি ছিল নবী (ﷺ)-এর নির্দেশের প্রতিফলন। আর এ কাজের জন্য মসজিদেরও কিছু অংশ নেয়াকে তাঁরা বৈধতা দেন, যেন নবী (ﷺ) কবেরর নিকটে সিজদা না দেয়া হয় এবং সেখানে ইবাদত হওয়া থেকে তাঁর কবর সংরক্ষিত থাকে। নিশ্চয়ই উক্ত কাজটি চিন্তাশীলদের জন্য হয়েছে। কিন্তু যারা চিন্তাশীল ও প্রকৃত বিবেকবান নয়, তারা মনে করে যে কবর রয়েছে মসজিদের অভ্যন্তরে। প্রকৃতপক্ষে তো কবর মসজিদের অভ্যন্তরে নয় কেননা কবর ও মসজিদকে পৃথক করার জন্য রয়েছে কয়েকটি দেয়াল ও বেড়া এবং কবরের পূর্ব পার্শ্বেও মসজিদের অংশ নয়। মূলত, নবী (ﷺ)-এর কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের জায়গা বানিয়ে নেয়া হয়নি।

করেছেন। যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীম (عليه السلام)-কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম। সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।" *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩২)*

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও এ কাজ [কবরকে মসজিদে পরিণত] করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে (তাঁর কথার ধরণ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে) তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে সলাত আদায় করা রাসূল ﷺ-এর এ লানতের অন্তর্ভুক্ত।

خشي أن يتخذ مسجدا.

এ বাণীর দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মত লোক ছিলেন না। যে স্থানকে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ যেখানে সিজদা আদায় করা হয়। যেমন রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

'পৃথিবার সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।' (বুখারী, মুসলিম, সুনান-ই আরবাআ প্রমুখ) [1]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে 'মারফু' হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

---

[1] ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم..... قبور أنبيائهم مساجد বর্তমানে এ উম্মতের মাঝেও অনুরূপ ফিতনা জারী হয়ে চলেছে যেমন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝে ছিল। এ হল শিরকের বড় মাধ্যম ও কারণ। আর মাধ্যম ও কারণ সব সময় তার পরবর্তী উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যায়। উলামা ও গবেষকদের ঐক্যমতে স্বীকৃত কায়দা হল, শিরক ও অন্যান্য হারাম কর্মের দিকে নিয়ে যাবে এমন ধরণের উসীলা-মাধ্যম ও কারণ সমূহের মূলোৎপাটন করাও ওয়াজিব। এ জন্যই কোন কবরে নির্মিত মসজিদে সলাত আদায় কার জায়েয নয়। কেননা তা নবী ﷺ-এর নিষিদ্ধ বিষয়ের পরিপন্থী। অতএব যে মসজিদ কোন কবরে নির্মিত সে মসজিদে এবং কবরের আশে-পাশে সলাত আদায় করা জায়েয নয়। সেখানে বরকতের উদ্দেশ্যেই হোক আর জানাযা ব্যতীত অন্যান্য কোন নফলই হোক কোন সলাতই জায়েয নেই। চাই তা কবরে নির্মিত মসজিদ আকারে হোক বা মসজিদ আকারে না হোক। যেমন, সহীহ বুখারীতে তালীকরূপে বর্ণনা হয়েছে, ওমর (رضي الله عنه), আনাস (رضي الله عنه)-কে এক কবরের নিকট সলাত আদায় করতে দেখে বলেন, 'কবর', 'কবর'; অর্থাৎ কবর থেকে বেঁচে থাকুন, কবর থেকে বেঁচে থাকুন। (কবরে নিকট সলাত আদায় করবেন না) এ থেকে বুঝা গেল যে, কবরের পার্শ্বে সলাত আদায় করা জায়েয নয়। কেননা তা হল শিরকের বড় মাধ্যম ও কারণ।

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. (مسند أحمد : ٣٥١٦ وصحيح ابن خزيمة ح: ٧٨٩)

'জীবন্ত অবস্থায় যাদের উপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।'

(মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৫৩১৬; সহীহ ইবনু খুযায়মা, হাদীস নং ৭৮৯; আবু হাতিম সহীহ হাদীসে এটি বর্ণনা করেছেন।)[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. যে ব্যক্তি নেককার ও বুজুর্গ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায় নিয়ত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুঁশিয়ারী তার জন্য প্রযোজ্য।

২. মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং কঠোরতা অবলম্বন।

৩. কবরে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি কিরূপ গুরুত্বারোপ করেছিলেন তা আলোচ্য হাদীসগুলো হতে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। প্রথমে তিনি খুব কঠোভাবে নিষেধ করেন, অতঃপর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে তিনি তা পুনরায় বারবার নিষেধ করে এ বিষয়ে জোর প্রদান করেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। [যার ফলে মৃত্যুর পূর্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন] অতএব রাসূল ﷺ কর্তৃক এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

---

[1] ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود .... أبو حاتم في صحيحه হাদীসে বর্ণিত 'যারা কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।' এর মধ্যে প্রত্যেক ঐ ধরণের লোক অন্তর্ভূক্ত যারা কবরের উপর সলাত আদায় করে বা তার দিক হয়ে বা তার নিকট সলাত আদায় করে। এ জন্যই কবরের পার্শ্বে সলাত আদায় করার ইচ্ছা পোষণকারীরা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। নবী ﷺ যাদের গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। প্রিয় পাঠক! এর সাথে সাথে মুসলিম দেশসমূহে কবরের উপর বিল্ডিং বা কবর পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণের যে প্রথা শুরু হয়েছে এবং সেখানে আস্তানা গড়া, তার সম্মান প্রদর্শন, লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা, ও উক্ত কবরবাসীদেরকে ওলী সাব্যস্ত ও প্রকাশ করে তাদের ফযীলত ও প্রশংসায় লম্বা-চওড়া কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করে প্রমাণ করা হয় যে, এ ওলীগণ লোকদের আহ্বান শুনে ও ফরিয়াদ কবূল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দ্বারা বর্তমান ও অতীতকাল খাঁটি ইসলামের চরম অসহায়ত্বের প্রকাশ ঘটে। অবস্থা এতটুকুই নয়, বরং তারা এগুলোকে জায়েয বলে এবং এগুলোই তারা তাওহীদের অন্তর্ভূক্ত মনে করে। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করে তাদেরকে তারা অজ্ঞতার অপবাদ দেয় অথচ এরা তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করছে, আর তারা তো আহ্বান করছে জাহান্নামের পথে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমরা ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করি।

৪. নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তাঁর কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজাকে নিষেধ করেছেন।

৫. নবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ইহুদি নাসারাদের রীতি-নীতি।

৬. এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিসম্পাত।

৭. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী ﷺ-এর কবরের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮. তাঁর কবরকে উন্মুক্ত ও সুশোভিত না রাখার কারণ এ হাদিসে সুস্পষ্ট।

৯. কবরকে মসজিদে রুপান্তর করার তাৎপর্যও এর দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

১০. যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দু'ধরণের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ কোন পথ অবলম্বন করলে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি সেটাও উল্লেখ করেছেন।

১১. রাসূল ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদ'আতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি দলের জবাব দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিদ'আতীদেরকে ৭২ দলের বহির্ভুত বলে মনে করেন। এসব বিদ'আতীরা হচ্ছে 'রাফেযী' ও 'জাহমিয়া'। এ রাফেযী দলের কারণেই শির্ক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম তারাই কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২. মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

১৩. 'খুল্লাত' বা বন্ধুত্বের মর্যাদা ও সম্মান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছে।

১৪. খুল্লাতই হচ্ছে মুহাব্বত ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫. এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ) শ্রেষ্ঠ সাহাবী।

১৬. আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

অধ্যায়-২০

নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে[1]

ইমাম মালেক (রাহি.) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ দু'আ করেছেন,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (الموطأ لإمام مالك، الصلاة، باب جامع الصلاة، ح:٢٦١ والمصنف لابن أبي شيبة :٣/٣٤٥)

'হে আল্লাহ আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির উপর আল্লাহর কঠিন গজব নাজিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।' (*মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ২৬১; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ৩/৩৪৫*)[2]

---

[1] শরীয়তে নেক্কার ও সাধারণ লোকের কবরের মাঝে কোন পার্থক্যে নেই। সকলের কবরের বিধান এক ও অভিন্ন। গম্বুজ আকৃতি উঁচু কবর হোক আর না হোক। শরীয়তের দলীলেও নেক্কার ও অন্যদের কবরের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং নেক্কারদের কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির অর্থ হল, তাদের ব্যাপারে যা হুকুম দেয়া হয়েছে আর যা কিছু নিষেধ করা হয়েছে তার সীমালঙ্ঘন করা। কবরে লিখা, কবর উঁচু করা, তার উপর বিল্ডিং নির্মাণ করা, কবর অথবা কবরবাসীকে তাদের জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উসীলা বা মাধ্যম মনে করা, কবর অথবা কবরবাসীকে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফায়াতকারী ধারণা করা। কবরে মানত করা, জবাই করা অথবা কবরের মাটিকে শাফায়াতকারী মনে করা ইত্যাদি সবগুলোকেই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উসীলা হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহ্র সাথে মহা শিরক করার অন্তর্ভূক্ত।

[2] নবী ﷺ روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .... لا تجعل قبري وثنا يعبد.. স্বীয় কবরে পূজা উপাসনা শুরু হওয়ার আশংকায় এ দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন যে, 'হে আল্লাহ্! আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত কর না। যার পূজা উপাসনা করা হবে।' এর উদ্দেশ্যই হল, যে কবরের পূজা ও উপাসনা করা হয় তা মূর্তিরই অন্তর্ভূক্ত। আর ঐ পূজার কারণে আল্লাহ্ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে থাকেন যা হাদীসের শেষাংশে বর্ণনা করা হয়েছে। শিরক পর্যন্ত পৌছায় এমন উসীলা গ্রহণ করাই কবরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। নবী ﷺ এ হাদীসে যেখানে কবরের পূজার মাধ্যম বর্ণনা দিয়েছেন সেখানেই তা থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে ঐ নিকষ্ট কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্র মারাত্মক লা'নতের ব্যাপারেও হুশিয়ারী দেন। আরো বর্ণনা দেন যে, পরিশেষে উক্ত উসীলা-মাধ্যমের পরিণতি এ দাঁড়ায় যে, মূর্তির মতই কবরগুলির পূজা শুরু হয়ে যায়। মূলকথা, উক্ত হাদীসে এ কথাই স্পষ্ট করে দেয় যে, যে কবরের পূজা করা হয় তা মূর্তিই বটে।

ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ 'তোমরা কি লাত ও উয্যাকে দেখেছ?' (সূরা নাজম: ১৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'লাত' এমন একজন নেককার লোক ছেলেন, যিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে 'ছাতু' খাওয়াতেন। তরপর যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরে ইতেকাফ করতে লাগল।[1]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, 'লাত' হাজীদেরকে 'ছাতু' খাওয়াতেন। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ (سنن أبي داود، الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ح:٣٢٣٦ وجامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، ح:٣٢ وسنن النسائي، الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ح:٢٠٤٥)

'রাসূল (ﷺ) কবর যিয়ারতকারিনী (মহিলা)-দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।'

(আহলুস সুনান' এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩২৩৬; জামি' তিরমিযী, হাদীস নং ৩২; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২০৪৫)[2]

---

[1] ولابن جرير بسنده عن سفيان .... فعكفوا على قبري 'লাত' যেহেতু হাজীদেরকে ছাতু গুলে খাওয়াত তার এ কর্মের কারণে লোকেরা তার কবরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকার হয়। আর সেখানে সলাতে বসার মত বসার রহস্য হল, কবরের সম্মান করে বরকত, নেকী, উপকার লাভ ও ক্ষতি থেকে বাঁচার আশায় কবরে বসে থাকা। কবরের নিকট উক্তভাবে বসাতে কবর মূর্তি ও পূজার আস্তানায় পরিণত হয়।

[2] ....وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم কবরে মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে বাতি জ্বালানো নিষেধ। কেননা তা হল তার সম্মানে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন। অতীতকালে কবরে চেরাগ ও মোমবাতি জ্বালানো হত, কিন্তু বর্তমানে বড় ধরণের আলোকসজ্জা ও লাইটিং করা হয় যাতে লক্ষ্য স্থল ভালভাবে চিহ্নিত হয় ও ব্যাপক সম্মান প্রকাশ পায়। কবরের উপর এরূপ করা নাজায়েয এবং নবী (ﷺ)-এর বাণী অনুসারে এগুলো যে করে সে অভিশপ্ত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. أوثان (মূর্তি ও প্রতিমা) এর তাফসীর।
২. 'ইবাদত'-এর তাফসীর।
৩. রাসূল ﷺ যা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।
৪. নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তিপূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।
৫. এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন গজব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি 'লাতের' ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেল।
৭. 'লাত' নামক মূর্তির স্থানটি মূলত একজন নেককার লোকের কবর।
৮. 'লাত' প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্য ও উল্লেখ করা হয়েছে।
৯. কবর জিয়ারত কারিনী (মহিলা)-দের প্রতি নবী ﷺ-এর অভিসম্পাত।
১০. যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতিও রাসূল ﷺ-এর অভিসম্পাত।

অধ্যায়-২১

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় এবং শিরকের সকল পথ বন্ধ করতে একান্তই তৎপর ছিলেন

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল তোমাদের দুঃখ কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।'[1] (সূরা তাওবা: ১২৮)

সাহাবী আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (سنن أبي داود، المناسك، باب زيارة القبور، ح:٢٠٤٢)

'তোমরা তোমাদের বাড়ি ঘরগুলোকে কবরে [যেখানে সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ] পরিণত করো না। আর আমার কবরকে উৎসব স্থলে [ঈদে] পরিণত করো না। আমার প্রতি দরূদ পড়। কারণ তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।' (*আবূ দাউদ হাসান সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ২০৪২*)[2]

---

[1] অর্থাৎ তাঁর উম্মত কোন কিছু ক্লেশের মধ্যে পড়ে যাক এটি মহানবী ﷺ চান না। আর তিনি যে তাঁর উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী তার দলীল হল, তিনি তাওহীদের সীমারেখাকে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেছেন, অনুরূপ আমরা যেন শিরকে পতিত না হই এ জন্য সমস্ত পথকে বন্ধ করেছেন।

[2] মূলে আরবীতে 'ঈদ' শব্দ এসেছে। এর অর্থ উৎসব স্থানবাচক হতে পারে। যেমন হাদীসে রয়েছে, আবার কালবাচকও হতে পারে। অর্থাৎ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে কবরের নিকট সমবেত হওয়া। 'আমার কবরকে উৎসবস্থল রূপে পরিণত করবে না।' অর্থাৎ বছরে কোন নির্ধারিত দিবস অথবা নির্দিষ্ট সময়গুলোতে মেলা বা উরস করে সেখানে আগমন করবে না। কেননা এর ফলে নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহ্র সম্মানের মত হয়ে যায়। যেহেতু কবরকে উরস ও মেলা বানানো শিরকের উসীলা, এ জন্য নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেখান থেকেই আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। কেননা তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছে যায়।'

আলী ইবনুল হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রাসূল ﷺ-এর কবরের পাশে একটি ছিদ্র পথে প্রবেশ করে সেখানে কিছু দোয়া-খায়ের করে চলে যায়। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এ ধরনের কাজ নিষেধ করে দিলেন। তাকে আরো বললেন, 'আমি কি তোমার কাছে সে হাদীসটি বর্ণনা করব না, যা আমি আমর পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রাসূল সাহাবী এর কাছ থেকে? রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন,

لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (رواه الضياء المقدسي في المختارة، ح:٤٢٨ ومجمع الزوائد :٣/٤)

'তোমরা তোমাদের বাড়ি ঘরগুলোকে কবরে [যেখানে সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ] পরিণত করো না। আর আমার কবরকে উৎসব স্থলে [ঈদে] পরিণত করো না। আমার প্রতি দরূদ পড়। কারণ তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।' (*আবূ দাঊদ এ হাদীসটি তাঁর নির্বাচিত হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেছেন। মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩*)[1]

---

[1] মহানবী ﷺ তাওহীদ সংরক্ষণ করেছেন। শিরকের সকল পথ রুদ্ধ করেছেন। এ পর্যায়ে তিনি তাঁর কবরকে উৎসব স্থলে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এটি শিরকের পথকে সুগম করে। যখন নবী ﷺ-এর কবরের সম্মানে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ., তবে অন্য লোকের কবরে এ ধরণের সম্মান করা তো কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, তাঁর অধিকাংশ উম্মত তাঁর নির্দেশনাকে গ্রহণ করে না, বরং তাঁর হিদায়াত নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে কবরকে মসজিদ ইবাদতের স্থান বানায় ও সেখানে উরস ও মেলা উদ্‌যাপন করে। বরং তার উপর গুম্বুজ বানায়, আলোক সজ্জা করে; বরং সেখানে পশু জবাই করা হয়, মানত পূর্ণ করা হয়, কা'বা ঘরের মত তার চারি পার্শ্বে তাওয়াফ করা হয়, কবরের আশে-পাশের স্থানসমূহকে অনুরূপ পূত-পবিত্র মনে করে যেরূপ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পূত-পবিত বরকতময় হারাম শরীফ; বরং কবর-মাজার ভক্তরা নবী বা কোন সৎব্যক্তি বা ওলীর কবরে আগমন করলে এমন বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ ও নিরবতা অবলম্বন করে যে, আল্লাহ্‌র সামনেও তেমন করে না। এগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সরাসরি বিরোধিতা এবং তাদের সাথে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা তাওবার ১২৮নং আয়াতের তাফসীর।
২. রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শির্কী গুনাহর সীমারেখা থেকে বহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।
৩. আমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর মমত্ববোধ, দয়া, করুণা এবং আমাদের ব্যাপারে তাঁর তীব্র আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. রাসূল ﷺ-এর যিয়ারত সর্বোত্তম নেক কাজ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন।
৫. অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।
৬. ঘরে নফল সলাত আদায় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।
৭. 'কবরস্থানে সলাত আদায় করা যাবে না।'- এটাই সালফে সালেহীনের অভিমত।
৮. নবী ﷺ-এর কবরস্থানে নামায কিংবা দরূদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর উপর পঠিত দরূদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তাঁর কাছে পৌছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় তাঁর কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।
৯. 'আলমে বরযখে' রাসূল ﷺ-এর কাছে তাঁর উম্মাতের আমল দরূদ ও সালামের মধ্যে পেশ করা হয়।

অধ্যায়-২২

মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পুজা করবে[1]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (النساء: ٥١)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হওয়ার পরও অমূলক যাদু, প্রতিমা ও তাগূতের প্রতি বিশ্বাস করে।'[2] (সূরা নিসা: ৫১-৫২)

---

[1] মূলে আরবীতে (الأوثان) শব্দ এসেছে। মানুষ আল্লাহ্র সাথে যা কিছুরই ইবাদত করে অথবা তার নিকট ফরিয়াদ করে, অথবা এ বিশ্বাস রাখে যে, সে আল্লাহ্র হুকুম ছাড়াই উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে অথবা তার থেকে গোপনে গোপনে ভয় পায়। যেমন, আল্লাহকে ভয় করা হয় তাকেই (وثن) বলা হয়। তাই সেটি মূর্তি হোক, মৃত ব্যক্তি হোক, কবর হোক অথবা অন্য কিছু হোক। তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তার অপরিহার্যতা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ভয় পাওয়া শিরকের অন্তর্ভূক্ত। তাওহীদের প্রকার, মহা শিরক ও ছোট শিরকের প্রাকার এবং মাধ্যম ও কারণসমূহ বর্ণনা করার পর শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহি.)-এর মাথায় এ প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, কোন লোক এমন কথাও বলতে পারে যে, উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ সঠিক। কিন্তু এ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াকে তো মহা শিরকে পতিত হওয়া থেকে হেফাযত করা হয়েছে। কেননা নবী ﷺ বলেন, 'শয়তান আবর ভূ-খণ্ডে সলাতী ব্যক্তিরা যে তা ইবাদত করবে এ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, অবশ্য সে তাদের পদস্খলনের চেষ্টা করতেই থাকবে।'

উত্তরঃ প্রথমতঃ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ যথাস্থানে হয়নি, শয়তান ঠিকই নিরাশ হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানকে আরব ভূ-খন্ডে যে একেবারে তার ইবাদত হবে না তা থেকে নিরাশ করেননি। **দ্বিতীয়তঃ** নবী ﷺ বলেন, শয়তান ঐ ব্যাপার থেকে নিরাশ হয় যে, জাযিরাতুল আরবে সলাতিরা তার ইবাদত করবে। আর নিঃসন্দেহে সলাতি ব্যক্তিরা তো লোকদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধই করে থাকে। আর সবচেয়ে বড় অসৎ কাজ হল আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা। যে সমস্ত মানুষ যথাযথভাবে সলাত আদায় করে, শয়তান প্রকৃতই তাঁদের থেকে নিরাশ যে, তাঁরা কখনই তার ইবাদত করবে না। অতএব, আমরা বলব, এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, এ উম্মতের কেউ শয়তানের ইবাদত করবে না। এ কারণেই নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের কিছু দিন পরেই আরবের এক গোষ্ঠী মুরতাদ হয়ে যায়, আর এতো শয়তানের ইবাদতের ফলেই, কেননা শয়তানের ইবাদতের অর্থ হল তার অনুসরণ করা। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ' হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নিকট এ অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সূরা ইয়াসীনঃ ৬০) এ আয়াতে তাফসীরে বলা হয়েছে, যেমনভাবে শিরকে পতিত হওয়া ও ঈমান ও ঈমানের দাবী সমূহকে প্রত্যাখ্যান করা শয়তানের ইবাদত, অনুরূপ তার আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করাও ইবাদত।

[2] আকীদাহ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ বিরোধী আবরণ রয়েছে সেটিকেই 'জীবিত' বলা হয়। সেটি যাদু হতে পারে, জ্যোতিষী হতে পারে অথবা এমন নোংরা জিনিস হতে পারে যাতে মানুষের ক্ষতি হয়। শরীয়ত সীমালংঘন করে যারই ইবাদত অনুসরণ ও আনুগত্য করা হয় তাকেই 'তাগুত' বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুসরণ ও আনুগত্যের সীমা হল, যার আনুগত্য করা হবে সে এমন কাজের হুকুম দিবে যার শরীয়ত হুকুম দিয়েছে এবং এমন কাজ থেকে নিষেধ করবে যা থেকে

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ (المائدة: ٦٠)

'বলো, [হে মুহাম্মদ] আমি কি সে সব লোকদের কথা জানিয়ে দেব? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে [ফাসেক লোকদের পরিণতি] এর চেয়ে খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহর গজব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। তারা তাগুতের পূজা করেছে।[1] (সূরা মায়িদা : ৬০)

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন,

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ (الكهف: ٢١)

'যারা তাঁদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর [অর্থাৎ কবরস্থানে] মসজিদ তৈরী করব।'[2] (সূরা কাহ্ফ : ২১)

সাহাবী আবু সাঈদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ؟ (صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:٣٤٥٦ وصحيح مسلم، العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، ح:٢٦٦٩)

শরীয়ত নিষেধ করেছে। অতএব, শরীয়তের গণ্ডি হতে বের হয়ে যার ইবাদত, অনুসরণ ও আনুগত্য করা হবে সেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

সামঞ্জস্যতা: আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে উক্ত আয়াতের সামঞ্জস্য হল, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও মূর্তি ও শয়তানের প্রতি ঈমান আনে এবং নবী (ﷺ) ও বলেছেন যে বিগত উম্মতদের মধ্যে যা কিছু দেখা দিয়েছিল এ উম্মতের মধ্যেও তা দেখা দিবে। এ উম্মতের মধ্যে যাদুর প্রতি ঈমান রাখবে এরূপ লোকও হবে এবং তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করবে। ফলকথা হল তারা তাদের পূর্ববর্তীদের তরীকায় চলবে।

[1] তাগুতের ইবাদত ব্যাপক। এটি কবর পূজা হতে পারে, কবরবাসীকে প্রভু হিসেবে গণ্য করা তাদেরকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী হিসেবে মানা প্রভৃতি হতে পারে। আর উম্মতে মুহাম্মাদিয়ায় বহু লোক কবর, আস্তানা, গাছ ও পাথরের ইবাদত নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

[2] যেহেতু এটি পূর্ববর্তী উম্মতে সংঘটিত হয়েছে তাই এ উম্মতেও সংঘটিত হবে।

"আমি আশঙ্কা করছি, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে[1] [যা আদৌ করা উচিত নয়] এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কি ইহুদি ও খ্রিস্টান?' জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে?"[2] *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিম শরীফে সাহাবী ছাওবান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا (صحيح مسلم، الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح:٢٨٨٩)

'আল্লাহ তা'আলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি জমিনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। পৃথিবীর ততটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মতের শাসন বা রাজত্ব যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দু'টি ধন-ভাণ্ডার আমাকে দেয়া হল আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন যার ফলে সে (শত্রু) তাদের সম্পদকে হালাল মনে করবে [লুটে নিবে]। আমার রব আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা নিয়ে ফেলি, তখন তার

---

[1] السنن শব্দের অর্থ পথ। অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথ অনুসরণ করবে। নবী (ﷺ) لَتَتْبَعُنَّ শব্দটি প্রয়োগ করে শপথ করে এমন গুরুত্বসহ এ ভবিষ্যদ্বানী করেন যে, এ উম্মত পূর্বের উম্মতের এমনভাবে অনুসরণ করবে এবং এমনভাবে তাদের সমতায় পৌছবে যেমন তীরের একপার দ্বিতীয় পারের একেবারে সমান সমান হয়ে থাকে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না।

কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদের গণ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করব না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্ব ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোন শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করব না যা তাদের সম্পদকে বৈধ মনে করে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরকে ধ্বংস করবে আর একে অপরকে বন্দী করবে।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৯)

বারকানী তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (سنن أبي داود، الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ح:٤٢٥٢ ومسند أحمد : ٥/٢٨٤،٢٧٨)

'আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট শাসকদের ব্যাপারে বেশি আশঙ্কা বোধ করছি। একবার যদি তাদের উপর তলোয়ার উঠে তবে সে তলোয়ার কেয়ামত পর্যন্ত আর নামবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে।[1] আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী অর্থাৎ ভন্ড নবীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই হচ্ছি সর্বশেষ নবী। আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দলের অস্তিত্ব থাকবে[2] যাদেরকে কোন লাঞ্ছনাকারীর লাঞ্ছনা এবং বিরোধিতাকারীর বিরোধিতা

---

[1] মুসলিম দেশ ত্যাগ করে মুশরিকদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্টি হয়ে তাদের দেশে চলে যাবে অথবা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মুশরিকদের মতোই শিরকে লিপ্ত হবে। তারও অনুরূপ শির্ক করবে যেরূপ মুশরিকরা করেও তাদের সাথেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

[2] তাদের বিজয়ী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে একটি সমরাস্ত্রের বিজয় নয়। বরং দলীল প্রমাণ ও হকের বিজয়। যদিও কোন কোন যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছে বা কখনো তাদের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও

তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না [অর্থাৎ সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না] যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসে।'

(সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪২৫২; মুসনাদ আহমাদ, ৫ম খণ্ড ২৭৮, ২৮৪)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
২. সূরা মায়িদাহ্র ৬০নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৩. সূরা কাহাফের ২১নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৪. এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আর তা হচ্ছে] এখানে 'জিবত' [প্রতিমা] এবং 'তাগুত'[শয়তান]-এর প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্ত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়?
৫. তাগুত পূজারীদের কথা হচ্ছে, কাফেররা তাদের কুফরি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা মোমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।
৬. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। [যারা ইহুদি খৃষ্টানদের হুবহু অনুসারী]।
৭. এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। অর্থাৎ এ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বহু মূর্তি পূজারী লোক পাওয়া যাবে।
৮. সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, 'মুখতার' ও তার মতো মিথ্যা এবং ভণ্ড নবীর আবির্ভাব। 'মুখতার' নামক এ ভণ্ডনবী আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (ﷺ)-এর রিসালতকে স্বীকার করত। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত বলেও ঘোষণা করত। সে আরো ঘোষণা দিত যে, 'রাসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভণ্ড মুর্খও সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

তারা স্বীয় দলীল ও প্রমাণে এবং অন্যদের তুলনায় হক ও সঠিকের প্রতি দৃঢ়তায় তারই হকপন্থী আর অন্যরা বাতিল পন্থী।

৯. এ মর্মে সুসংবাদ প্রদান যে, অতীতের মতো হক সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হকের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০. এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, তারা [হক পন্থীরা] সংখ্যায় কম হলেও কোন অপমানকারী ও বিরোধিতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১. এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

১২. এ অধ্যায়ে কতগুলো বড় নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। যথা:

- ❖ রাসূল ﷺ কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন যে, 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সবকিছুই একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়েছেন বাস্তবে ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে, যা উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি।
- ❖ তাঁকে দু'টি ধন-ভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।
- ❖ তাঁর উম্মতের ব্যাপারে মাত্র দুটি দু'আ কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দু'আ কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন।
- ❖ তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না]।
- ❖ তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মতের জন্য তিনি ভ্রান্ত শাসকদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।
- ❖ এ উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভন্ড নবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন। সাহায্য প্রাপ্ত একটি হক পন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখিত সব বিষয়ই পরিবেশিত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ এমনটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাধীন নয়।

১৩. একমাত্র পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারেই তিনি শংকিত ছিলেন।

১৪. عبادة الأولين- অর্থাৎ মূর্তি পূজার মর্মার্থের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সতর্কবাণী।

অধ্যায়-২৩
যাদু[1]

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (البقرة: ١٠٢)

'আর তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালে সামান্যতমও কোন অংশ নেই।"[2] (সূরা বাকারা: ১০২)

আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেছেন,

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (نساء : ٥١)

'তারা জিবত্ ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস করে।"[3] (সূরা নিসা: ৫১)

---

[1] যাদু শিরকে আকবার তথা বড় শির্ক-এর অন্যতম এবং তা তাওহীদের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যাদুর বাস্তবতা হচ্ছে যাদুকে কার্যকর এবং ক্রিয়াশীল করতে হলে শয়তানকে ব্যবহার এবং তার নৈকট্য লাভ করতেই হয়। আর শুধুমাত্র তার নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই জিন-শয়তান যাদুকৃত ব্যক্তির শরীরে যাদুর ক্রিয়া শুরু করে। শয়তানের নৈকট্য লাভ ছাড়া কোন যাদুকরের পক্ষেই যাদুকর হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণেই আমরা বলব যে, যাদু শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন, '(বলুন যে আমি পরিত্রাণ কামনা করছি) গিরা তথা বন্ধনে অধিক ফুঁ দান কারিনীদের অনিষ্ট হতে।' نفاثات শব্দটি نفاثة-এর বহুবচন এবং نفث/نفاثة থেকে মুবালাগা তথা অতিমাত্রায় ফুঁ দান করার অর্থ বহন করে এবং তা দ্বারা নিঃসন্দেহে যাদুকারিনী বুঝানো হয়েছে এবং সরাসরি যাদুকারিনী না বলে অতিমাত্রায় ফুঁ দানকারিনী বলা হয়েছে। কেননা তারা অতি মাত্রায় ফুঁ দান করত এবং ঝাড় ফুঁক ও বিভিন্ন রকমের তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ফুঁ দিত এবং সে ফুঁ এর মাধ্যমে জ্বিন সেই গিরা বন্ধনে কাজ করত যাতে যাদুকৃত ব্যক্তির শরীরের কিছু একটা থাকত অথবা এমন কিছু থাকত যার সাথে যাদুকৃত ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে যাদু ক্রিয়াশীল হয়ে যেত।

[2] আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, 'আর তারা নিশ্চয় অবগত আছে যে, যে ব্যক্তি যাদু ক্রয় (অবলম্বন) করল' এর অর্থ হচ্ছে যাদুকর ব্যক্তি যাঁদু ক্রিয়া করল এবং বিনিময়ে তাওহীদ প্রদান করল, ফলে মূল্য হচ্ছে তাওহীদ আর পণ্য হচ্ছে যাদু' 'ماله في الآخرة من خلق' যাদুকর ব্যক্তির পরকালে কোন অংশ থাকব না, ঠিক একইরূপ অবস্থা মুশরিকদেরও হবে। পরকালে তাদের ভাগ্যেও কিছুই জুটবে না।

[3] আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'তারা জিবত ও তাগুতে বিশ্বাস করে'। উমার (رضي الله عنه) বলেন, জিবত হচ্ছে যাদু। উল্লেখিত আয়াতে আহলে কিতাবদের দোষারোপ ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে কেননা তারা যাদুতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর এটা সাধারণত ইহুদীদের ক্ষেত্রে অধিক দেখা যায়। এ কথা সুস্পষ্ট বলা যায় যে, যাদুবিদ্যা চর্চা ও তা অবলম্বনের কারণে আল্লাহ্ তাদের দুর্নাম করেছেন ও তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন এবং তাদের প্রতি ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সুনিশ্চিত এটা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আর যদি তাতে শির্কী কথা থাকে তবে অবশ্যই সেটা শির্ক বলেই গণ্য হবে। এভাবেই তার সমস্ত প্রকারের এক নির্দেশ।

'উমার (رضي الله عنه) বলেছেন,

الْجِبْتُ السِّحْرُ وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ (أخرجه الطبراني في التفسير، برقم:٥٨٣٤)

'জিবত্' হচ্ছে যাদু, আর 'তাগুত' হচ্ছে শয়তান। *(ত্বাবারানী, ৫৮৩৪)*

জাবির (رضي الله عنه) বলেছেন,

الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ (أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور :٢/٢٢ ورواه البخاري في الصحيح معلقا، فتح الباري :٨/٣١٧)

'তাগুত' হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো। আর সাধারণত প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল।[1]

(ইবনে আবী হাতিম, ২/২২; সহীহ বুখারী, ৮/৩১৭)

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ (صحيح البخاري، الوصايا، باب قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ ح:٢٧٦٦، ٥٧٦٤ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ح:٨٩)

'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি?' তিনি জবাবে বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শির্ক করা। ২. যাদু করা। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৭। সতী সাধ্বী মু'মিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।'[2]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬, ৫৭৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯)

তাগুত হচ্ছে শয়তান এবং জিবত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ হলেও ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট তা যাদুর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তারা যাদু ও শয়তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য প্রকাশ করে হক থেকে দূরে সরে গেছে।

[1] জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (رضي الله عنه)-এর অভিমত, 'তাগুত দ্বারা গণককে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ের আলোচনা সামনে করা হবে।

[2] আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেন,' 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক।' সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ঐ জিনিসগুলো কি কি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা যাদু করা' ইত্যাদি।' উপরোক্ত পাপগুলির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতেই ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নিঃসন্দেহে এগুলো মহাপাপ। সুতরাং যাদু শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

জুনদুব (رضي الله عنه) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ (جامع الترمذي، الحدود، باب حد الساحر، ح:١٤٦٠)

'যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া (মৃত্যু দণ্ড)।"[1] *(জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৪৬)*

সহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, ওমর (رضي الله عنه) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশ নামায় লিখেছিলেন,

اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَّسَاحِرَةٍ، قَالَ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ (صحيح البخاري، الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ح:٣١٥٦ وسنن أبي داود، الخراج، باب في أخذ الجزية من المجوس، ح:٣٠٤٣ ومسند أحمد : ١/١٩١، ١٩٠ واللفظ له)

'তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা কর।' বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করেছি।[2] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৫৬; সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩০৪৩; মুসনাদ আহমাদ, ১/১৯০,১৯১)*

হাফসা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে আছে,

أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ، وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (الموطأ للإمام مالك العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، ح : ٤٦)

'তিনি তাঁর অধীনস্থ একজন ক্রীতদাসীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে যাদু করেছিল। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে।'

---

[1] জুনদুর (رضي الله عنه) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যাদুকরের হদ তথা শাস্তি হচ্ছে তরবারি দ্বারা হত্যা করা (মৃত্যুদণ্ড)। (তিরমিযী) ইমাম তিরমিযী (রাহি.) বলেন, সঠিক অর্থে হাদীসটি মওকুফ। শাস্তির ব্যাপারে মূলত যাদুকরগণের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। যে কোন প্রকার যাদু হোক না কেন যাদুকরকে হত্যা করতে হবে এবং বাস্তবতা হচ্ছে যাদুকরের শাস্তি এবং মুরতাদের শাস্তি একই কেননা। যাদুতে শির্ক থাকেই। ফলে যে ব্যক্তি শির্ক করল সে মুরতাদ হয়ে গেল এবং তার জানমাল বৈধ হয়ে গেল। (হত্যাযোগ্য হয়ে গেল)

[2] বাজালা বিন আব্দুল্লাহ্ থেকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ওমর (رضي الله عنه) ফরমানজারী করেছিলেন যে, 'তোমরা প্রত্যেক যাদুকর এবং যাদুকারিনীকে হত্যা কর, তিনি বলেন, ফলে আমরা তিনজন যাদুকারিনীকে হত্যা করেছিলাম।' এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাদুকর এবং যাদুকারিনীকে হত্যার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই।

(মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ৪৬; একই রকম হাদীস জুনদুব থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রাহি) বলেছেন, নবী ﷺ-এর তিনজন সাহাবী থেকে এ কথা সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে।)[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা বাকারার ১০২নং আয়াতের তাফসীর।
২. সূরা নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর।
৩. 'জিবত' এবং 'তাগুত'-এর তাফসীর এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।
৪. 'তাগুত' কখনো জ্বিন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।
৫. ধ্বংসাত্মক সাতটি এমন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।
৬. যাদুকরকে কাফের ঘোষণা দিতে হবে।
৭. তাওবার সুযোগ ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।
৮. যদি ওমর (رضي الله عنه)-এর যুগে যাদুবিদ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী যুগের অবস্থা কি দাঁড়াবে? [অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী যুগে যাদুবিদ্যার প্রচলন অবশ্যই আছে।]

---

[1] হাফছা (رضي الله عنها) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার অধীনস্ত একজন ক্রীতদাসকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, দাসী তাকে যাদু করেছিল অতঃপর তিনি উক্ত দাসীকে হত্যা হয়েছিল। একই রকম হাদীস জুনদুব (رضي الله عنه) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রাহি.) বলেন, তিনজন সাহাবী থেকে যাদুকরকে হত্যার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) যাদুকরকে হত্যার ফাতওয়া ও আদেশ প্রদান করেছেন, এ মর্মে সেখানে কোন রকম পার্থক্য করেননি এবং এটাই ওয়াজিব যে, যেন কোন প্রকার পার্থক্য করা না হয়। প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব যে, তারা যাদুর সকল প্রকার থেকে সাবধান থাকবে এবং এ বিধান প্রচারে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং এ গর্হিত কাজের বিরোধীতা করবে যেমন ইমামগণ বলেছেন যে, যখনই কোন যাদুকর কোন নগরীতে প্রবেশ করবে তখনই সেখানে অশান্তি, অত্যাচার সীমলংঘন এবং সন্ত্রাস বিরাজ করবে।

অধ্যায়-২৪

যাদু এবং যাদুর শ্রেণীভূক্ত বিষয়[1]

ইমাম আহমাদ (রাহি:) বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মদ বিন জা'ফর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আউফ আমাদেরকে হাইয়ান বিন আ'লা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কুতুন বিন কাবিসা তাঁর পিতার নিকট থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ

"নিশ্চয়ই 'ইয়াফা', 'তারক্', এবং 'তিয়ারাহ' হচ্ছে 'জিবত' এর অন্তর্ভূক্ত।"[2]

তারপর বর্ণনাকারী 'আউফ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ইয়াফা' হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা এবং 'তারক্' হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয় করা।

'জিবত' শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে হাসান বসরী (রাহি.) বলেন, 'জিব্ত' হচ্ছে শয়তানের তন্ত্র-মন্ত্র।[3] *(এ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য [হাসান]। আবু দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান তাঁর মুসনাদ সহীহ হাদীস গ্রন্থে মারুফভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে হাদীসটি দুর্বল। দেখুন, তাখরীজ রিয়াদুস সালেহীন-আলবানী, হাদীস নং ১৬৬৮)*

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেছেন,

مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ. (سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في النجوم ، ح:٣٩٠٥)

---

[1] যাদু ভাষাগত দিক থেকে একটি ব্যাপক শব্দ। শয়তানের সহযোগিতায় ও তার ইবাদত ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে যাদুকর যা কিছু প্রয়োগ করে তার সবই যাদুর পর্যায়ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তে কিছু বিষয়কে যাদু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেগুলো মূলত কোনভাবেই যাদু নয়। এর কতকগুলো স্তর আছে এবং স্তরগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব জরুরী। এ অর্থেই মহামতি গ্রন্থকার (রাহি.) অত্র অধ্যায়ে সবগুলো প্রকার উল্লেখ করেছেন।

[2] নবী ﷺ বলেছেন, 'পাখি উড়িয়ে ও মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা জিবত এর অন্তর্ভূক্ত।' পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালোমন্দ নির্ণয় করা ইয়াফার অন্যতম একটি ব্যাখ্যা এবং মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয় করা মূলত গণকদের কাজ যারা মাটিতে অনেকগুলো রেখা টেনে পর্যায়ক্রমে একটি দুটি করে মিটাতে থাকে এবং বলে যে রেখা বাকি আছে তার দ্বারা এ বুঝা যায় ইত্যাদি। মূলত গণকবিদ্যা যাদুর একটা অংশ।

[3] হাসান (রাহি.) বলেছেন, জিব্ত শয়তানের মন্ত্র বা মধুর সুর এটা যাদুরই অন্তর্ভূক্ত। কেননা, শয়তান সেদিকে তার সুর দিয়ে মানুষকে আহ্বান করে।

'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখল, মূলত সে যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখল।[1] এ জ্যোতির্বিদ্যা যত বাড়বে যাদুবিদ্যাও তত বাড়বে।" (*আবু দাউদ সহীহ্ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৯০৫)*

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (سنن النسائي، تحريم الدم، باب الحكم في السحرة، ح:٤٠٨٤)

'যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলত যাদু করে।[2] আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলত শির্ক করে। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস (তাবীজ-কবজ) লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়।' (*সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪০৮৪। হাদীসটি যঈফ, দেখুন, যঈফুল জামে'-আলবানী, হা/৫৭১৪)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَلاَ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ : الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ (صحيح مسلم، البر والصلة والأدب باب تحريم النميمة ح:٢٦٠٦ ومسند أحمد ١/٤٣٧)

'আমি তোমাদেরকে 'ইযাহ' কী- এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা লাগনো বা বদনাম ছড়ানো।'[3]

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৬; মুসনাদ আহমাদ, ১/৪৩৭)

---

[1] ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখল সে মূলত যাদুবিদ্যারই কিছু অংশ শিখল। এ জ্যোতির্বিদ্যা যত বাড়বে যাদু বিদ্যাও তত বাড়বে।' (আবু দাউদ) এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অর্জন যাদুবিদ্যা শিক্ষারই পর্যায়ভুক্ত।

[2] যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলত যাদু করে। ফুঁক দেওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, সে এমন কিছু পড়ে ফুঁক দেয়, যা দ্বারা সে শয়তানকে ব্যবহার করে ও কথাগুলো প্রয়োগের সময় সে জ্বিন হাজির করে এবং সেই জ্বিন ফুঁকের মাধ্যমে উক্ত গিরাতে কাজ করে। যাদুকরের নিকট গিরা লাগানোর উপকার হচ্ছে যে, যতক্ষণ গিরা বলবৎ থাকবে ততক্ষণ যাদুও ক্রিয়াশীল থাকবে। গিরা কখনও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় আবার কখনও অতি ছোট ছোট ও সূক্ষ্ম হয়। যে যাদু করল সে শির্ক করল। এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি কোন জিনিস লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ততা রাখে আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট, আর যখন বান্দা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে তখন তাকে সেদিকে সোপর্দ করা হয়। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী তিনিই একমাত্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের মালিক। 'হে মানব সকল! তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ্ প্রশংসিত ধনবান।'

[3] ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণিত হাদীস, 'আমি কি তোমাদেরকে 'আযাহ' (যাদু) এর সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে, চোগলখুরী বা কুৎসা রচনা করা।' হাদীসে বর্ণিত 'আযাহ' অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি বিভিন্ন অর্থের

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا (صحيح البخاري، النكاح، باب الخطبة، ح:٥١٤٦، ٥٧٦٧، ومسند أحمد:٢/١٦، ٥٩، ٦٣، ٩٤)

'নিশ্চয় কোন কোন কথা ও আলোচনার মধ্যে যাদু আছে।'[1] (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৪৬, ৫৭৬৭; মুসনাদ আহমাদ, ২/১৬, ৫৯, ৬৩, ৯৪)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১. পাখি উড়িয়ে, মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য নির্ণয়করণ জিব্ত তথা যাদুর পর্যায়ভূক্ত।
২. ইয়াফা, তারক্ এবং তিয়ারাহ্ এর তাফসীর।
৩. জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্তর্ভূক্ত।
৪. ফুঁকসহ গিরা লাগানো যাদুর অন্তর্ভূক্ত।
৫. কুৎসা রটনা করাও যাদুর শামিল।
৬. কিছু কিছু বাগ্মিতা ও যাদুর আওতায় পড়ে।

মধ্যে একটি যাদুর অর্থ বহন করে। কুৎসা রটনাকে যাদুর অন্তর্ভূক্ত করার কারণ হচ্ছে যে যাদু যেমন দু'জন বন্ধুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা দু'জন পৃথক ব্যক্তিকে একত্রিত করে এবং হৃদয়ে তার প্রভাব অতি সুক্ষ্মভাবে সম্পূর্ণ হয়, ঠিক তেমনি চোগলখুরীর মাধ্যমেও বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটে।

[1] ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই কোন কোন কথা বা আলোচনার মধ্যে যাদু আছে।' কতকগুলো কথা একেবারে যাদুর মত অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা যা কখনও হৃদয় ছুঁয়ে যায় ও অন্তঃকরণে বিশেষ রেখাপাত করে এমন কি ভাষার জোরে হক বাতিল এবং বাতিলকে হক বলে মনে হয়।

উলামাদের সঠিক মতানুযায়ী এখানে বাক পটুতার সমালোচনা করা হয়েছে, প্রশংসা নয়। ফলে গ্রন্থকার (রাহি.) হাদীসটি অত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন, যাতে হারাম কাজগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায়-২৫

গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তা[1]

ইমাম মুসলিম (রাহি.) রাসূল ﷺ-এর এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً (صحيح مسلم، السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ح: ٢٢٣٠، دون قوله : فصدقة، فهو عند أحمد في المسند:٤/٦٨، ٥/٣٨٠)

'যে ব্যক্তি কোন গণক তথা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আসল, তারপর তাকে [ভাগ্য সম্পর্কে] কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত কবুল হবে না।'[2]

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩; মুসনাদ আহমাদ, ৪/৬৭, ৫/৩৭)

---

[1] গণক বলতে ভবিষ্যদ্বক্তা ও জ্যোতিষীদের বুঝানো হয়েছে, গণক বিদ্যা এমন একটি পেশা যা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং গণক মুশরিক বলে বিবেচিত। কেননা সে জ্বিনদের ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের উপাসনা করে তাদের নৈকট্য লাভ করে এবং জ্বিন তাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করে। জ্বিনের উপাসনা ও তার নৈকট্য লাভ ছাড়া এটা আদৌ সম্ভব নয়। জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ গণকদের নেতৃত্বে আস্থা রাখত এবং বিশ্বাস করত যে, তারা গায়েব সম্পর্কে যা পৃথিবীতে অথবা মানব সমাজে ঘটবে তা অবগত আছে। যার ফলে আরবরা গণকদের সম্মান করত ও তাদের প্রতি ভীত থাকত। জ্বিনদের প্রকৃত ব্যাপারে ছিল এ রকম যে, জ্বিনেরা গোপনে চুরি করে ফেরেশ্তাদের পরস্পরের কথোপকথন শুনে ঐ গণক বা জ্যোতিষির নিকট বলে। শ্রবণ চুরি তিন অবস্থায়, (১) নবুওয়াতের পূর্বে এবং তা ব্যাপকভাবে ছিল, (২) নবুওয়াত এর পরে জ্বিনদের পক্ষে শ্রবণ চুরি সম্ভব হয়নি যদিও কিছু হয়েছে তবে তা আল্লাহ্র কিতাব বা কুরআনের ওহী ব্যতিরেকে। (৩) নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর শ্রবণ চুরির ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তা খুবই সীমিত আকারে, কেননা আসমানে পাহারার কঠোর ব্যবস্থা ও অগ্নি নিক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, فَصَدَّقَهُ শব্দটি সহীহ্ মুসলিমে নেই বরং মুসনাদে আহমাদে রয়েছে। যেহেতু উভয়ের বর্ণনা একই যার কারণে লিখক (রাহি.) আহলে ইলমের পথ অনুসরণ করে একটির শব্দ অন্যটির দিকে সম্পর্কিত করেছেন। মুলত গণক এবং আররাফ কখনও একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী ও জ্যোতির্বিদ গণকের পর্যায়ভুক্ত।

[2] ইমাম মুসলিম (রাহিঃ) রাসূল ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী থেকে তাঁর সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন গণক তথা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে আসল অতঃপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল এবং গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত কবুল হবে না।' চল্লিশ দিনের সলাত কবুল হবে না অর্থাৎ তার সলাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে; কেননা গণকের কাছে আগমন তার চল্লিশ দিনের সলাতের সওয়াব নষ্ট করে দেবে এবং এও বোধগম্য হয় যে, গণকের নিকট এসে কিছু জিজ্ঞাসা করাই মহাপাপ যদিও তা বিশ্বাস না করে শুধু ভবিষ্যত সম্পর্কে জানার আগ্রহের কারণে হয়ে থাকে।

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الكهان، ح: ٣٩٠٤)

'যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মূলত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।"[1] (*সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৯০৪; তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও হাতিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে আবু ইয়া'লা অনুরূপ মওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।*)

ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু' হাদিসে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করল, অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হল, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করল অথবা যার জন্য যাদু করা হল অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, অতঃপর সে [গণক] যা বলল তা বিশ্বাস করল[2] সে ব্যক্তি মূলত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর যা নাজিল করা হয়েছে তা [কুরআন] অস্বীকার করল। *(হাদীসটি বায্যার হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে 'যে ব্যক্তি যায়' থেকে হাদিসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদিসে উল্লেখ নেই।)*

ইমাম বাগাবী রহ.) বলেন عراف ['আররাফ' বা 'গণক'] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবি করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলত গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বাণী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবি করে তাকেই গণক বলা হয়।

---

[1] 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল, অতপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মূলত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তারই কুফরী করল। অর্থাৎ যেন কুরআনকেই অস্বীকার করল। কুরআন এবং হাদীসে বলা হয়েছে গণক, যাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা এরা পরিত্রাণ পাবে না এবং তারা মিথ্যা বৈ সত্য বলে না এবং সঠিক মতে এখানে কুফরী ছোট কুফরী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

[2] ليس منا-এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত কাজ হারাম, আর কতিপয় ইমাম বলেন যে, তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। গণকের কথা বিশ্বাস করা সম্পর্কে নবী (ﷺ) বলেন, 'সে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দ্বীনের সাথে কুফরী করল।' কেননা গণককে বিশ্বাস করার মাধ্যমে শিরকে আকবার তথা বড় শিরকে সহযোগিতা করা হবে। এ তো তার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী যে গণকের নিকট এলো এবং শুধু জিজ্ঞাসা করল আর গণকের ব্যাপারে বর্ণনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে।

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন كاهن [গণক], منجم [জ্যোতির্বিদ], এবং رمال [বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী] এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবি করে তাদেরকেই আররাফ [عراف] বলে।[1]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবী أباجاد ['আবজাদ'-এর অক্ষরগুলো] লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।[2]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জান যায় :

১. গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।
২. ভাগ্য গণনা করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।
৩. যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।
৪. পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।
৫. যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।
৬. ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি 'আবজাদ' শিক্ষা করেছে তার উল্লেখ।
৭. কাহিন, এবং আর্‌রাফ এর মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ।

---

[1] ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রাহি.)-এর মতে গণক জ্যোতির্বিদ এবং বালিতে দাগ কেটে ভাগ্য নির্ণয়কারী সকলকেই আর্‌রাফ বলা হয়েছে।

[2] ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর মতে, যে সম্প্রদায় আবজাদ পদ্ধতিতে ভাগ্য নির্ণয় করে ও তারকারাজিতে দৃষ্টিপাত করে তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই, তাদেরকেও গণকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোটকথা, গণক বিদ্যার প্রকার অসংখ্য কিন্তু সার কথা হচ্ছে যে গণক তার নিকট আগুন্তুক ব্যক্তিকে বোকা বানায় যে সে সঠিক জ্ঞান পর্যন্ত পৌছে গেছে, কিন্তু মূলত সে বাস্তবতা থেকে বহুদূরে এবং সে যা কিছু দাবী করে তাও জ্বিনের মাধ্যমে, কিন্তু দুর্বল ঈমানের লোকেরা ধারণা করে যে, তাদের নিকটও এক ধরণের জ্ঞান রয়েছে এবং তারা আল্লাহ্‌র ওয়ালী।

অধ্যায়-২৬

নাশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক যাদু[1]

সাহাবী জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ)-কে নুশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন,

هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

'এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ।"[2] *(আহমদ, আবু দাউদ)*

ইমাম আবু দাউদ (রাহি.) বলেন, ইমাম আহমদ (রাহি.)-কে নাশরাহ্ (প্রতিরোধমূলক যাদু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, 'ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর (নাশরাহ্)-এর সবকিছুই অপছন্দ করতেন।

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, 'একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমাধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু (নাশরাহ্)-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ, তারা এর (নাশরাহ্) দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধণ করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।'*

---

[1] 'নুশরাহ্' অর্থ 'ক্রিয়া নষ্ট' বা 'প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা'। এটা অবৈধ, আন্-নুশরাহ্ মূলত 'নাশর' থেকে নির্গত যার অর্থ সুস্থভাবে রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা। যাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা পদ্ধতিতে আন্-নুশরাহ্ বলা হয়। নুশরাহ্ দু'প্রকার: প্রথমটি বৈধ, দ্বিতীয়টি অবৈধ। বৈধ নুশরাহ্ যখন তা কুরআন ও হাদীস বর্ণিত দু'আ অথবা ডাক্তারের ঔষধের মাধ্যমে হবে। অবৈধ যা নিষিদ্ধ নুশরাহ্ হচ্ছে প্রথম যাদুকে দ্বিতীয় যাদু দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা। কেননা উক্ত যাদুতেও জ্বিনের আশ্রয় গ্রহণ জরুরী এবং যেখানে কুফুরী অথবা শির্কী বাক্য থাকবেই। ফলে বলা হয়েছে যাদুকরই একমাত্র শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি ব্যতীত যাদু নষ্ট করে থাকে।

[2] জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ)-কে নুশরাহ্ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ। আরবে সাধারণত প্রচলিত ছিল যে, শুধুমাত্র যাদুকররাই যাদুর প্রভাব নষ্ট করত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহি.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সবই অপছন্দ করতেন। এটা যে মুহূর্তে নুশরাহ্ কুরআন সম্বলিত তাবিজের মাধ্যমে হবে তাও তখন অপছন্দনীয় কিন্তু ঝড়-ফুঁক দ্বারা তাবিজ ছাড়া যদি নুশরাহ্ প্রয়োগ করা হয় তবে তাতে অপছন্দ করার কোন কারণ নেই। কেননা নবী (ﷺ) নিজে তা ব্যবহার করেছেন এবং অন্যকে অনুমতি দিয়েছেন।

হাসান (رحمه الله) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.) বলেন, 'নাশারাহ' হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা।[1]

নুশরাহ্ দু'ধরণের:

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা, আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রাহি.)-এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাশের (যাদুর চিকিৎসক) ও মুনতাশার (যাদুকৃত রোগী) উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়ত সম্মত দু'আ ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা- এ ধরণের চিকিৎসা বৈধ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. নাশরাহ্ (প্রতিরোধমূলক যাদু)-এর উপর নিষেধাজ্ঞারোপ।

২. নিষিদ্ধ বস্তু ও অনুমতিপ্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকরণ, যাতে সন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়।

---

[1] সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (رحمه الله) থেকে বর্ণিত আছে আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, 'একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমাধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (নুশরাহ্)-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ, তারা এর (নুশরাহ্) সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়। ইবনে মুসাইয়্যিব (رحمه الله)-এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নুশরাহ্ যখন দু'আ, ঝাড়-ফুঁক কুরআন দ্বারা হবে তখনই কেবল তা বৈধ হবে; কিন্তু যখন তা যাদুর মাধ্যমে হবে তখন সেটাকে বৈধ বলা নিশ্চয়ই যাবে না। মোটকথা, যাদু কিংবা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যখন যাদু বা শিরকি কালাম দ্বারা হবে তখন অবশ্য অবৈধ হবে, পক্ষান্তরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যদি শরীয়ত সমর্থিত ঝাড়-ফুঁক দ্বারা হয় তখন তা বৈধ হবে।

অধ্যায়-২৭

অশুভ আলামত[1] সম্পর্কীয় বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف:١٣١)

'মনে রেখো, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের অশুভ আলামতসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না।'[2] (সূরা আরাফ: ১৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ﴾ (يس : ١٩)

'তারা বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদর সাথেই রয়েছে।'[3] (সূরা ইয়াসীন: ১৯)

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ (صحيح البخاري، الطب، باب لا هامة، ح:٥٧٥٧ وصحيح مسلم، السلام، باب عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ح: ٢٢٢، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول)

'দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্য, পেঁচার ডাক ও সফর মাসের কোন রহস্য নেই।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২০; তবে মুসলিমের হাদীসে 'নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই' এ কথাটুকু অতিরিক্ত আছে।)*

---

[1] অশুভ আলামত ধারণা পোষণ শিরকের অন্তর্ভূক্ত এবং পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী, তবে এটা ছোট শির্ক, এটার উদাহরণ এরূপ যেমন পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দের নির্ণয় করা, অথবা কোন ঘটনা থেকে অশুভ আলামত নির্ণয় করা।

[2] 'মনে রেখ আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে তাদের অশুভ আলামতসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। অর্থাৎ তাদের কাছে কল্যাণকর এবং ক্ষতিকর ভাল-মন্দ যা কিছুই জুটে তা সবকিছুই তাকদীরের কারণে। যা আল্লাহ্র কাছে শিরধার্য। কুলক্ষণের ধারণা নবীদের চিরশত্রু পৌত্তলিকদের অন্যতম গুণাবলী, ফলে এটা অবশ্যই নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে নবীদের অনুসারীগণ সবকিছুতেই তাদের ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করে, যেমন- আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় তাদের অশুভ আলামতসমূহের চাবিকাঠি আল্লাহ্র কাছে।' তাঁরা বলেন, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে। সুতরাং অশুভ আলামত ধারণা মুশরিক ও রাসূলদের শত্রুদের অভ্যাসের অন্তর্ভূক্ত।

[3] তিনি বলেন, 'ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্য কথার অশুভ আলামত বলতে কিছুই নেই।' কোন ব্যাধির সংক্রমিত হবার নিজস্ব ক্ষমতা নেই, বরং আল্লাহ্র ইচ্ছায় কখনও কখনও সংক্রমিত হয়ে থাকে। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ ধারণা রাখত যে, ব্যাধি নিজে নিজেই সংক্রমিত হয়ে থাকে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে আকিদাকে বাতিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পাখি উড়িয়ে যা কখনও কখনও হৃদয়ে উদয় হয় কিন্তু এটার কোনই প্রভাব পড়ে না।

বুখারী ও মুসলিম আনাস (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) এরশাদ করেছেন,

لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ (صحيح البخاري، الطب، باب لا عدوى، ح:٥٧٧٦ وصحيح مسلم، السلام، باب طيرة والفأل ح : ٢٢٢٤)

'ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর অশুভ আলামত বলতে কিছুই নেই। তবে 'ফাল' আমাকে অবাক করে [অর্থাৎ আমার কাছে ভাল লাগে।] সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাল' কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, 'উত্তম কথা'।[1] (যে কথা শির্ক মুক্ত)

উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উল্লেখ করা হল। জবাবে তিনি বললেন,

أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে 'ফাল'। অশুভ আলামত কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ (سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الطيرة، ح:٣٩١٩)

'হে আল্লাহ্ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই।"[2]

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১৯)

---

[1] 'ফাল' তথা উত্তম কথা আল্লাহ্র সাথে ভাল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা প্রশংসিত কিন্তু অশুভ আলামত যেহেতু আল্লাহ্র সাথে খারাপ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ফলে অশুভ আলামত অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

[2] অশুভ আলামত কথা ও কাজের ম্যাধমে হতে পারে কিন্তু উত্তম ধারণাই কাঙ্খিত হওয়া উচিত। কেননা আলামত শুভ মনে করা বক্ষকে প্রশস্ত করে সংকীর্ণতাকে দূর করে বান্দা যখন কোন কাজে শুভ আলামত গ্রহণ করে তখন তার অন্তর থেকে শয়তানি প্রভাব দূর হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثًا وَمَا مِنَّا إِلاَّ... وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ (سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الطيرة، ح:٣٩١٠ وجامع الترمذي، السير، باب ما جاء في الطيرة، ح: ١٦١٤)

'পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শির্কী কাজ, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা শির্কী কাজ, এ কাজ আমাদের নয়। আল্লাহ তা'আলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন।'[1]

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১০; তিরমিযী, হাদীস নং ১৬১৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, 'অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলত শির্ক করল।[2] সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দু'আ পড়বে-

اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ (مسند أحمد :٢/٢٢٠)

'হে আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।" *(মুসনাদ আহমাদ, ২/২২০)*

ফজল বিন আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ (مسند أحمد:١/٢١٣)

'তিয়ারাহ' অর্থাৎ অশুভ আলামত হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোন অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।' *(মুসনাদ আহমাদ, ১/২১৩, শু'আইব অরনাউৎ হাদীসটিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন, ফাতহুল মাজীদ টীকা নং ২৭০)*

উপরে বর্ণিত দু'আ 'হে আল্লাহ্ তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আধার একমাত্র তুমিই'। যার মাধ্যমে মনে উদয় হওয়া সকল প্রকার কুলক্ষণে অশুভ ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকর মহান দু'আ।

[1] ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শির্কী কাজ, অর্থাৎ শিরকে আসগার বা ছোট শির্ক। সঠিকভাবে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করার কাজগুলির মত শয়তানী চক্রান্ত দূর করে দেয়।

[2] 'অশুভ আলামত বা দুর্ভাগ্যের ধারণা, যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলত শির্ক করল। হাদীসটি পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শির্ক হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. 'জেনে রাখ তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহ্‌র কাছে নিহিত' (সূরা আরাফ: ১৩১) এবং 'তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে।' (সূরা ইয়াসীন: ১৯)-এ আয়াত দু'টির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২. সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩. অশুভ আলামতের অস্বীকৃতি।

৪. পেঁচার ডাকে কোন রহস্য তথা দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে অস্বীকৃতি [অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই]

৫. অশুভ 'সফর'-এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন [অর্থাৎ অশুভ 'সফর মাস' বলতে কিছুই নেই। জাহেলি যুগে সফর মাসকে অশুভ মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।]

৬. 'ফাল' উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভূক্ত নয়; বরং এটা মোস্তাহাব।

৭. 'ফাল'-এর ব্যাখ্যা।

৮. অনিচ্ছায় অন্তরে উদয় হওয়া অশুভ আলামতের ধারণা সৃষ্টি হওয়া ক্ষতিকারক নয়, বরং তা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাতে দূর হয়ে যায়।

৯. যার অন্তরে অশুভ আলামতের ধারণা উদয় হবে সে কি দু'আ পড়বে তার বর্ণনা।

১০. অশুভ আলামত শির্‌ক হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা।

১১. নিন্দনীয় কুলক্ষণের তাফসীর।

অধ্যায়-২৮

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরীয়তের বিধান[1]

ইমাম বুখারী (রাহি.) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ্ (রাহি.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, (১) আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, (২) আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং (৩) দিক ভ্রান্ত পথিকদের নির্দেশনা হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিলতায় সে পড়বে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে।[2]

কাতাদাহ্ (রাহি.) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উ'য়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকেই এ কথা হারব (রাহি.) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক (রাহি.) [চাঁদের] কক্ষপথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন।[3]

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ (مسند أحمد:٤/٣٩٩ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح:١٣٨١)

---

[1] জ্যোতির্বিদ্যার বিধান ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা তিন প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে, ধারণা পোষণ করা যে, তারকারাজি নিজেই ক্রিয়াশীল এবং পার্থিবজগতের যাবতীয় ঘটনাবলী নক্ষত্ররাজির ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে এবং এটা সর্বসম্মতিক্রমে বড় ধরণের কুফরী এবং ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতির শিরকের ন্যায় শির্ক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জ্যোতির্বিদ্যাকে ইলমুত্তাছীর বলা হয়। আর তা হচ্ছে আকাশের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, নক্ষত্রের চলাচল সেগুলির মিলন, বিচ্ছেদ উদয় ও অস্ত থেকে যাবতীয় ঘটনাবলী প্রমাণ গ্রহণ করা। যিনি এ ধরণের কাজ করেন তাকে জ্যোতির্ষী বলা হয়। যা গণকের একটা অংশ। এদের কাছে শয়তানের আগমন ঘটে এবং শয়তান তাদেরকে তাদের কথামত খবর প্রদান করে এটা সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহ্; তাছাড়া এটা আল্লাহ্র সাথে প্রকাশ্য কুফরী। জ্যোতির্বিদ্যার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, ইলমুত্তাসয়ীর সেটা হচ্ছে তারকারাজি ও তার চলাচল সম্পর্কে কেবলা নির্ধারণ, সময় নির্ধারণ এবং কৃষি কার্যের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। উক্ত প্রকার জ্যোতির্বিদ্যার উলামায়ে কিরাম সম্মতি প্রদান করেছেন। ফলে উক্ত প্রকার জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও আলোচনায় কোন অসুবিধা নেই।

[2] তারকারাজির সৃষ্টির তিনটি রহস্যই সঠিক, কেননা তারকারাজিও আল্লাহ্র মাখলুক। সুতরাং আল্লাহ্ আমাদেরকে যা কিছু অবহিত করেছেন, তাছাড়া অন্য কোন রহস্য আমাদের জানা নেই।

[3] চন্দ্রের কক্ষপথ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন সঠিক, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সেটা উল্লেখ করে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি চন্দ্রকে নূর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন যেন তোমরা বছর এবং হিসাব সম্পর্কে অবগত হতে পার।

'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, (১) মাদকাসক্ত ব্যক্তি, (২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং (৩) যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।'

(মুসনাদ আহমদ, ৪/৩৯৯; ইবনু হিব্বান, হাদীস নং১৩৮১)[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২. নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩. কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪. যাদু বাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভূক্ত সামান্য জিনিসকেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী।

---

[1] ইতিপূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে, জ্যোতির্বিদ্যা যাদুরই একটি প্রকার। যেমন নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার যতটুকু অংশ শিক্ষা করল সে যেন ঐ পরিমাণ যাদু শিক্ষা করল।' (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)

মানুষের অজ্ঞাতসারে বর্তমানে স্পষ্টত জ্যোতির্বিদ্যার যে ক্ষেত্রে মানুষ নিমজ্জিত হচ্ছে তা হল, ব্যাপকভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত রাশিফল বা রাশিচক্র। এটি হল তাসীরী জ্যোতির্বিদ্যা এবং তা হল গণকদের কর্মের অন্তর্ভূক্ত। অতএব এটিকে সার্বিকভাবে প্রতিহত করা অপারিহার্য। এ ধরণের পেপার পত্রিকা ঘরে উঠানো, পড়া ও তা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। কেননা যে রাশিফল সম্বলিত পত্রিকা গ্রহণ করল, পড়ল ও তার সেই রাশি সম্পর্কে জানল যাতে সে জন্মগ্রহণ করেছে বা তার উপযুক্ত রাশি নির্ণয় করল ও সে সম্পর্কে পড়ল তবে সে যেন গণকের নিকটই এসে সেগুলি সম্পর্কে জানল যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। অতএব, রাশিফল সে যা পড়ে জানল তা সত্যি মনে করে তবে অবশ্যই সে মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল। সুতরাং রাশিফল প্রয়োগকারীরা হল, গণকদেরই অন্তর্ভূক্ত ও তাওহীদের পরিপন্থী।

অধ্যায়-২৯

নক্ষত্রের উসীলায় বৃষ্টি কামনা করা[1]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ (الواقعة : ٨٢)

'তোমরা (নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের) রিযিক নিহিত আছে মনে করে নিশ্চয়ই তোমরা (আল্লাহর নেয়ামতকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ।'[2] (সূরা ওয়াকেয়াহ্: ৮২)

আবু মালেক আশ'আরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (صحيح مسلم، الجنائز، باب التشديد في النياحة، ح:٩٣٤ ومسند أحمد : ٣٤٢/٥، ٣٤٤)

'জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব[3] আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না: (১) আভিজাত্যের অহংকার করা। (২) বংশের বদনাম গাওয়া। (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি পানি কামনা করা এবং (৪)

---

[1] অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হিসেবে নক্ষত্রের উল্লেখ করা, এটা সম্পূর্ণ তাওহীদ পরিপন্থী। সমস্ত নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ্র দিকে সম্বোধন করাতেই তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে এবং যেন নিয়ামতের কোন অংশই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য দিকে সম্বোধন না করা হয়। যদিও সেখানে কেউ উক্ত নিয়ামতের কারণ বা মাধ্যমও হয়। এর ফলে দু'ভাবে সীমালঙ্ঘন ঘটে থাকে, (১) নক্ষত্র বৃষ্টি বর্ষণের কারণ নয়। (২) বৃষ্টি বর্ষণের জন্য এমন মাধ্যমকে কারণ সাব্যস্ত করা যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কারণ সাব্যস্ত করেননি। অর্থাৎ নিয়ামত, অনুগ্রহ ও বৃষ্টি বর্ষণের সম্পর্ক নক্ষত্রের দিকে করা।

[2] 'তোমরা (নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের) রিযিক নিহিত আছে মনে করে আল্লাহ্র নিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ।' তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন যে, আল্লাহ্র ব্যাপারে অত্র নিয়ামতকে অন্যের দিকে সম্বোধন করার ব্যাপারে অত্র আয়াতে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

[3] 'জাহেলী যুগের কুস্বভাবগুলো অত্যন্ত নিন্দনীয়। সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে ক্রোধের ব্যক্তি তিন প্রকারের লোক তন্মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি যে ইসলামে জাহেলী যুগের প্রথা অবলম্বন করে।' আভিজাত্যের অহংকার করা, অর্থাৎ স্বীয় বংশের গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা। বংশের বদনাম করা, অর্থাৎ তাচ্ছিল্যসহ এ ধরণের কথা যে অমুক তো ঐ বংশের অথবা দলীল বিহীন ও বিনা প্রয়োজনেই কারো বংশ অস্বীকার করা ও তাকে অন্যায় ভাবা। নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করা, অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস করা যে নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়, বা এর চেয়েও যা ভয়াবহ তা হল নক্ষত্রের নিকটে বৃষ্টি কামনা করা। মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী যদি তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের জামা পরানো হবে। মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা কবীরা গুনাহ। বিপদের সময় চিৎকার করে কান্নাকাটি করা এবং বুকের কাপড় ছিড়ে ফেলা ইত্যাদি করা, যা সম্পূর্ণ ধৈর্য্যের পরিপন্থী এবং জাহেলী যুগের প্রথার অনুরূপ।

মৃত বৃক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি আরো বলেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে।' (*মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৪; মুসনাদ আহমাদ, ৫/৩৪৬, ৩৪৪)*

যায়েদ বিন খালিদ (رضي الله عنه) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন,

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (صحيح البخاري، الاستسقاء، باب قوله تعالى ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ ح:١٠٣٨ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ح:٧١)

"রাসূল (ﷺ) হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সলাত আদায় করলেন, সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সলাত শেষ করে রাসূল (ﷺ) লোকদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের কি জানা আছে তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বলল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।'[1] তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ পাক বলেছেন, আমার বন্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে রাত্রি অতিবাহিত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, আল্লাহ্র ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে।[2] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক নক্ষত্রের 'উসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।"[3] (*সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১)*

---

[1] 'লোকেরা বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।'- এ কথা শুধুমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশাতেই বল হত; কিন্তু রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর যদি কাউকে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যা তার জানা নেই তবে সে যেন বলে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

[2] 'সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। কেননা সে নিয়ামতকে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে সম্বোধন করেছে যা তার ঈমানের প্রমাণ করে।

[3] যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক নক্ষত্রের 'উসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।' নক্ষত্রকে যদি বৃষ্টির কারণ হিসেবে মনে করে তবে সেটা ছোট কুফরী হবে। কিন্তু যদি মনে করে যে নক্ষত্রই বৃষ্টিবর্ষণ করেছে এবং মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন তখন সেটা ভয়াবহ কুফরী হবে।

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ অর্থেই আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, 'অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إلى قوله تعالى تُكَذِّبُونَ﴾

'উপরন্তু আমি শপথ করছি তারকারাজির অস্তাচলের। তা অবশ্যই অতি বড় শপথ যদি তোমরা জানতে! অবশ্যই তা সম্মানিত কুরআন, (যা লিখিত আছে) সুরক্ষিত কিতাবে, পূত-পবিত্র (ফেরেশতা) ছাড়া (শয়ত্বানেরা) তা স্পর্শ করতে পারে না, জগৎ সমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ, তবুও কি তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ মনে করছ? আর তাকে মিথ্যে বলাকেই তোমরা তোমাদের জীবিকা বানিয়ে নিয়েছ। তাহলে কেন (তোমরা বাধা দাও না) যখন প্রাণ এসে যায় কণ্ঠনালীতে? আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ, আর আমি তোমাদের চেয়ে তার (অর্থাৎ প্রাণের) নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা। তোমরা যদি (আমার) কর্তৃত্বের অধীন না হও।' (সূরা ওয়াকিয়াহ্: ৭৫-৮৬)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা ওয়াক্বিয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।
২. জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।
৩. উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়ার উল্লেখ।
৪. এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একেবারে বের করে দিবে না।
৫. 'বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে'- এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত (বৃষ্টি) নাযিল হওয়া।
৬. এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।
৭. এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।
৮. অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োজন।
৯. তোমরা জান কি? কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে এরূপ প্রশ্ন করতে পারেন।
১০. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনীর জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

অধ্যায়-৩০

আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা দ্বীনের স্তম্ভ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١٦٥)

'মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালোবাসে।'[1] (সূরা বাকারাহ্: ১৬৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (التوبة: ٢٤)

"হে রাসূল, আপনি বলে দিন, 'যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ করো, তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ি-ঘর, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁরই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"[2] (সূরা তাওবা: ২৪)

---

[1] এখানে গ্রন্থকার (রাহি.) আন্তরিক ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছেন এবং এককভাবে আল্লাহ্র জন্য অন্তর্ভূক্ত ইবাদত করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এটা তাওহীদের অতীব জরুরী একটা বিষয় ও তাওহীদের পরিপূর্ণতা দানকারী। বান্দার নিকট আল্লাহ্ই যেন সব কিছুর চেয়ে প্রিয় হয় এমনকি নিজের অন্তরের চেয়ে। এখানে মুহাব্বত বলতে ইবাদতের মুহাব্বত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ তার প্রিয়তম আল্লাহ্র সাথে এমন গভীর সম্পর্ক রাখবে এবং তাঁর সাথে এমন মুহাব্বত হবে যে, সে আনন্দচিত্তে তার সমস্ত হুকুমকে পালন করবে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। যখনই তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাথে করা হবে তখন তা শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকে রূপান্তরিত হবে। এ মুহাব্বতই দ্বীনের স্তম্ভ এবং অন্তরের সঠিকতার ভিত্তি।

[2] 'হে রাসূল আপনি বলে দিন যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন...।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ধমক দিয়েছেন এবং এখানে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র মুহাব্বতের উপর অন্য কারো মুহাব্বতকে প্রাধান্য দেয়া কবিরা গুনাহ ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাওহীদকে পূর্ণতা দিতে হলে প্রত্যেক প্রিয়তমের চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে বেশি ভালবাসা দিতে হবে এবং নবী ﷺ-এর প্রতি মুহাব্বত হতে হবে আল্লাহ্র পথে মুহাব্বত, আল্লাহ্র সাথে নয় কেননা তিনি আমাদেরকে রাসূল ﷺ-কে ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

সাহাবী আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (صحيح البخاري، الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، ح:١٥ وصحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، ح:٤٤)

'তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।'[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪)*

আনাস (رضي الله عنه) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (صحيح البخاري، الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ح:١٦، ٢١، ٦٩٤١ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ح:٤٣)

'যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। (১) তার কাছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া। (২) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা। (৩) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হওয়া।' *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬, ২১, ৬৯৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩)*

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى.....(صحيح البخاري، الأدب، باب الحب في الله، ح:٦٠٤١)

---

[1] অর্থাৎ আমার প্রিয় বিষয়গুলোকে অন্যের প্রিয় বিষয়বস্তুর চেয়ে এরূপ অগ্রাধিকার দিতে হবে যে, তার অন্তরে আমার মুহাব্বত তার সন্তান, পিতা-মাতা এবং সমস্ত লোকের মুহাব্বত থেকে বেশি হয়। অবশ্য এ মুহাব্বত প্রকাশ পাবে কর্মের মাধ্যমে। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ইবাদতের ভালবাসা বেসে থাকে তবে সে আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভীতির সাথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা চালাবে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার যথা সম্ভব চেষ্টা করবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর সাথে প্রকৃত মুহাব্বত রাখে সেও প্রকৃত পক্ষে উক্ত নীতি অবলম্বন করবে।

'কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না... (হাদীসের শেষ প্রর্যন্ত)।'[1]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

مَنْ أَحَبَّ فِيْ اللهِ، وَأَبْغَضَ فِيْ اللهِ، وَوَالَى فِيْ اللهِ، وَعَادَى فِيْ اللهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلاَيَةُ اللهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَّجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ– وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ– حَتَّى يَكُوْنَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لاَ يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا (رواه ابن جرير، رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، ح:٣٥٣ وابن أبي شيبة في المصنف بالشطر الأول فقط، ح:٣٤٧٥٩ وأخرجه الطبراني أيضا موقوفا على ابن عمر في المعجم الكبير : ١٢/١٣٥٣٧)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে।[2] আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত সলাত, সাওমের পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, কোন বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না।' *(ইবনে জারীর; ইবনে মুবারাক, কিতাব আয-যুহদ, হাদীস নং ৩৫৩; ত্বাবারানী, ১২/১৩৫৩৭)*

সাধারণত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না।

(ইবনে জারীর)

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন,

﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ﴾ (البقرة : ١٦٦)

'তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'[3] (সূরা বাকারা: ১৬৬)- এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক।

---

[1] ঈমানেরও এক মধুর স্বাদ রয়েছে যা আত্মা দিয়ে অনুভব করা যায়।

[2] ভালবাসার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র ওয়ালীতে পরিণত হয়। (ওয়ালী) বেলায়ত এর অর্থ হল, মুহাব্বত ও সাহায্য।

[3] 'তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।'- কেননা মুশরিকগণ তাদের উপাস্যদের সাথে শির্ক করত ও তাদেরকে ভালবাসত এবং ধারণা করত যে, এরা তাদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে; কিন্তু তাদের সকল ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা বাকারার ১৬৫নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা তাওবার ২৪নং আয়াতের তাফসীর।

৩. রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪. কোন কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মু'মিন বলা যেতে পারে]

৫. ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

৬. অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহ্ পাকের বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদও অনুভব করা যায় না।

৭. একজন প্রখ্যাত সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণত গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮. ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾- এ আয়াতের তাফসীর।

৯. মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহকে খুব ভালবাসে। [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালবাসা অর্থহীন]

১০. সূরা তাওবার ২৪নং আয়াতে উল্লেখিত আটটি জিনিসের ভালবাসা যার অন্তরে স্বীয় দ্বীনের চেয়েও বেশি, তার প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

১১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে এবং ঐ শরীককে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসার মতই ভালবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরণের শির্ক করল।

অধ্যায়-৩১

ভয়-ভীতি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٧٥)

'এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফির বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক। তাহলে তাদেরকে [শয়তানের সহচরদেরকে] ভয় কর না বরং আমাকে ভয় কর।'[1] (সূরা আল-ইমরান: ১৭৫)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ (التوبة: ١٨)

'নিঃসন্দেহে আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।'[2] (সূরা তাওবা: ১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنكبوت: ١٠)

---

[1] অত্র অধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা যে ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত তা সম্পর্কে, যা আন্তরিক অপরিহার্য ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত এবং সেটার পূর্ণতা তাওহীদের পূর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা তাওহীদের অসম্পূর্ণতা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ভয় করা তিন প্রকারের, প্রথমটি শিরক, দ্বিতীয়টি হারাম এবং তৃতীয়টি বৈধ।

(১) **যে ভয় শিরকঃ** এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি, তিনি নবী হোন, ওলী হোন আর জ্বিন হোন গোপনে তার ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা রাখে এটা দুনিয়ার হোক কিংবা পরকালের ব্যাপারে। পরকালের ক্ষেত্রে শিরকী ভয় হল- কারো এ ধরণের ভয় করা যে, উক্ত ওলীরা সম্মানিত ব্যক্তি পরকালে তার উপকার করবে, সুপারিশ করবে, পরকালে তার নৈকট্য লাভ করতে পারবে, আযাব দূর করবে, তাই তাকে ভয় করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে।

(২) **নিষিদ্ধ ভয়ঃ** কারো প্রতি ভয়ের কারণে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়ন হতে বিরত থাকা।

(৩) **প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ভয়ঃ** যেমন শত্রু থেকে ভয়, হিংস্র প্রাণী থেকে ভয়, আগুন থেকে ভয় ইত্যাদি। আল্লাহ্র বাণী, 'তোমরা আমাকে ভয় করো যদি তোমরা মু'মিন হও।' ভয় করার নির্দেশ প্রদান এ কথাই প্রমাণ করে যে ভয় একটি ইবাদত।

[2] 'একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না'- অত্র আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ভয় একমাত্র আল্লাহ্কেই করতে হবে এবং যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করেন তিনি তাদের এখানে প্রশংসা করেছেন।

'মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহর পথে তারা দুঃখ কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহর আজাবের সমতুল্য মনে করে।'[1]

(সূরা আনকাবূত: ১০)

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِيْنِ : أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ. إِنَّ رِزْقَ اللهِ لاَ يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيْصٍ، وَلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ (شعب الإيمان، الخامس من شعب الإيمان، وهو باب في أن القدر....، ح: ٢٠٧)

'ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্ট করা, আল্লাহ্ পাকের রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ্ যা দান করেন নি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোন লোভীর লোভ আল্লাহ্ পাকের রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণাকারীর ঘৃণা আল্লাহ্ পাকের রিযিক বন্ধ করতে পারে না।'[2] *(শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ২০৭; এ হাদীসটি যঈফ, দেখুন, যঈফুল জামে', হাদীস নং ২০০৯)*

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رضي الله عنه وَأرضى عنه النَّاسِ، وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح : ١٥٤١-١٥٤٢ وجامع الترمذي، ح: ٢٤١٤ وله ألفاظ أخرى)

'যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ্র সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্

---

[1] 'মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহ্র আযাবের সমতুল্য মনে করে।' অর্থাৎ সে পরীক্ষাকে ভয় পায় এবং তার প্রতি আল্লাহ্র বিধান যেটা ওয়াজিব সেটা ছেড়ে দেয় অথবা মানুষের কথার ভয়ে গর্হিত কাজ করে ফেলে।

[2] যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায়.....। এটা ঈমানের দুর্বলতা এবং হারাম কাজগুলো ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে, কেননা ঈমান আনুগত্যের মাধ্যমে বর্ধিত হয় এবং পাপের কারণে ঈমান হ্রাস পায় এবং অত্র আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট রেখে মানুষকে খুশি করা যেমন পাপ তেমনি হারাম।

তা'আলাকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলাও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।'[1]

(ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৫৪১-১৫৪২; জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৪)

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা আল-ইমরানের ১৭৫নং আয়াতের তাফসীর।
২. সূরা তাওবার ১৮নং আয়াতের তাফসীর।
৩. সূরা আনকাবূতের ১০নং আয়াতের তাফসীর।
৪. ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দুর্বল হওয়া সংক্রান্ত কথা।
৫. উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয় ঈমানের দুর্বলতার আলামত।
৬. ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেও ভয় করা ফরয বা অবশ্য করণীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত।
৭. আল্লাহকে যে ভয় করে তার জন্য সওয়াবের উল্লেখ।
৮. অন্তর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় পরিত্যাগকারীর জন্য শাস্তির উল্লেখ।

---

[1] এ হল যারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে তার প্রতিদান এবং যে এ ভয়মূলক ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদপূর্ণ করবে না তার প্রতিদান, কেননা সে মানুষকে ভয় করে পাপে পতিত হয়েছে এবং সে মানুষ থেকে ভয় করাকে হারামে লিপ্ত হওয়ার ও ফরয কাজ পরিত্যাগ করার কারণ বানিয়েছে।

অধ্যায়-৩২

একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ٢٣)

'তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো।'[1] (সূরা মায়িদা: ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الانفال: ٢)

'নিশ্চয়ই একমাত্র তারাই মু'মিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়।'[1] (সূরা আনফাল: ২)

---

[1] আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা নির্ভেজাল ইসলামের শর্ত। সে কথাই অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করার শরয়ী মর্মার্থ হচ্ছে এটা একটি বিরাট মানের আন্তরিক ইবাদত, বান্দা তার সামাগ্রিক কাজে আল্লাহ্‌র উপর আস্থাশীল থাকবে এবং সবকিছুকেই তার উপর সোর্পদ করবে ও সাথে সাথে কারণগুলি নিজে সম্পাদন করবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী ঐ ব্যক্তি যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করার পর উক্ত ব্যাপারকে আল্লাহ্‌র দিকে সোর্পদ করে দিবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে, এ কারণে উপকার সাধন আল্লাহ্‌রই হুকুমে হতে পারে, আর যে কারণ ও মাধ্যম গ্রহণ করা হয়েছে সবকিছুই তার সাহায্য ও তাওফীকেই হয়ে থাকে। অতএব, নিছক আন্তরিক ইবাদত হল তাওয়াক্কুল।

গাইরুল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা দুই প্রকারঃ প্রথমটি হচ্ছে, কোন ব্যক্তি এমন কোন মাখ্‌লুক তথা সৃষ্টি জীবের উপর এমন বিষয়ে ভরসা বা আস্থা রাখে যার উপর সে ক্ষমতা রাখে না, বরং আল্লাহ্‌ই সে ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। যেমন- পাপ মার্জনা করা অথবা সন্তান দান করা, অথবা ভাল চাকরি প্রদান করা। এগুলো সচরাচর কবর পূজকদের মাঝে দেখা যায়। এটা মূলত শিরকে আকবার বা বড় শির্‌ক বা তাওহীদ পরিপন্থী। দ্বিতিয়টি হচ্ছে কোন ব্যক্তি এমন কোন মাখলুকের উপর এমন বিষয়ে ভরসা করে যার উপর সে ক্ষমতা রাখে। এটা শিরকে আসগার বা ছোট শির্‌ক। যেমন- কেউ যদি বলে আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি, তোমার উপরও। এমনকি এ কথাও বলা জায়েয হবে না যে, আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি অতঃপর তোমার উপর, কেননা, তাওয়াক্কুল এমন একটি বিষয় যেখানে কোন মাখলুকের কোন অংশ নেই। আর তাওয়াক্কুল বা ভরসার প্রকৃত অর্থ তো ইতোপূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে, তাওয়াক্কুলের মর্ম হল, স্বীয় কার্যাবলী আল্লাহ্‌রই দিকে সোপর্দ করা যার হাতেই রয়েছে সমস্ত কিছুর অধিকার মাখলুকের নিকট কোন অধিকার বা সামর্থ নেই। তবে মাখলুক কারণ হতে পারে। অতএব এর অর্থ এটা নয় যে, কোন মাখলুকের উপর ভরসা করা যাবে।

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾- এটিই প্রমাণ করে যে, এর পূর্বে আসার অর্থই হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা ওয়াজিব এবং যেহেতু তাওয়াক্কুল একটি ইবাদত সুতরাং তা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হবে। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন, 'যদি তোমরা মু'মিন হও'। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, এককভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করলে ঈমান সঠিক হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأنفال: ٦٤)

'হে নবী ﷺ! তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্যে (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা আনফাল: ৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ٣)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।'[2] (সূরা তালাক: ৩)

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ অর্থাৎ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক।' (সূরা আলি-ইমরান: ১৭৩)- এ কথা ইব্রাহীম (عليه السلام) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ﷺ এ কথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হল,

﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

(آل عمران : ١٧٣)

'তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদের ভয় কর, তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায়।'[3] (সূরা আলি-ইমরান: ১৭৩) *[বুখারী ও নাসাঈ]*

---

[1] অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, মু'মিনগণ শুধুমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে। সুতরাং এটা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

[2] অর্থাৎ 'হে নবী তোমার ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের ভরসার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট অন্যের উপর ভরসা করার প্রয়োজন নেই।' এ জন্য অন্য এক আয়াতও তারপর বর্ণনা করেন, ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ তাওয়াক্কুল তখনই পুরোপুরি বুঝা সম্ভব হবে তখন তাওহীদে রুবূবিয়্যাত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান থাকবে। কেননা যখন কেউ জানবে আল্লাহ্ই এ বিশাল ভূ-মণ্ডলে নভোমণ্ডলের একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তখন তাওয়াক্কুল বা ভরসা আরও দৃঢ় হবে।

[3] حَسْبُنَا اللَّهُ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি মহান বাণী। বান্দা যখন আল্লাহ্র উপর পুরো আস্থা রাখবে তখন আল্লাহ্ তার সহায় হবেন যদিও আসমান ও জমিন সমপরিমাণ তার উপর বিপদ থাক না কেন, আল্লাহ্ অবশ্যই তার পথ তৈরি করে দিবেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করা ফরয।
২. আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করা ঈমানের শর্ত।
৩. সূরা আনফালের ২নং আয়াতের তাফসীর।
৪. আয়াতটির তাফসীর এর শেষাংশেই রয়েছে।
৫. সূরা তালাকের ৩নং আয়াতের তাফসীর।
৬. ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾- এ কথাটি ইব্রাহীম (عليه السلام) ও মুহাম্মদ ﷺ বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

অধ্যায়-৩৩

আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (الاعراف: ٩٩)

অর্থ: 'তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত [নির্ভয়] হয়ে গেছে? বস্তুত: আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে একমাত্র হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া অন্য কেউ ভয়-হীন হতে পারে না।'* (সূরা আল-'আরাফ: ৯৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (الحجر: ٥٦)

'একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে?'[1] (সূরা হিজর: ৫৬)

---

* অত্র অধ্যায়ে দুটি আয়াতের উল্লেখ আছে এবং আয়াত দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। প্রথমত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের স্বভাব হল যে তারা আল্লাহ্র শাস্তির পাকড়াও থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে অর্থাৎ তারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে না। আর আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করা, ভয় না পাওয়া ও ভয়-ভীতির 'ইবাদত পরিহার করারই ফল। অথচ ভয় একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। আয়াতে উল্লেখিত 'মকর' কৌশল অবলম্বনের তাৎপর্য হল, আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য যাবতীয় কাজ এমন সহজ করে দেন যে, সে এমন ধারণা করে ফেলে যে সে বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, তার আর কোন ভয় নেই। প্রকৃতপক্ষে এ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে অবকাশ দেয়। আল্লাহ মানুষকে সবকিছুই দেন কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, সে নিরাপদে রয়েছে। এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, 'যখন তোমরা দেখবে যে আল্লাহ কোন বান্দাকে অনেক নিয়ামাত দিয়েছেন অথচ সে সদা পাপ কাজে লিপ্ত, তবে তোমরা জেনে রাখো যে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে অবকাশ দিচ্ছেন।' আল্লাহ তা'আলা এ কৌশল অবলম্বন তাদের সাথেই করে থাকেন যারা তাঁর নবী, অলীদের ও তাঁর দ্বীনের সাথে গোপনে চক্রান্ত ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়। এ কৌশল অবলম্বন আল্লাহ্র পরিপূর্ণ গুণাবলী। কেননা এ সময় তিনি স্বীয় ইজ্জত, কুদরত ও প্রভাব প্রকাশ করেন।

[1] এখানে আল্লাহ্ পথভ্রষ্টদের স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে, তারা আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত থেকে নিরাশ ও উদাসীন। মোটকথা মুত্তাক্বীন এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের গুণাবলী হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় না অথচ আল্লাহকে তারা ভয়ও করে। 'আল্লাহকে ভয় করা বান্দাহর অপরিহার্য কর্তব্য আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভয়-ভীতি এ উভয় গুণের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহ্র ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকা বান্দার জন্য ওয়াজিব। তবে অন্তরে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবে?

শারীরিকভাবে সুস্থ পাপীর জন্য ভয়-ভীতির দিক আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রাধান্য পায়, আর মৃত্যুর সম্মুখীন অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক প্রাধান্য পায়। তবে সঠিক ও কল্যাণের পথে ধাবমান অবস্থায় ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ্র বাণী,

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ)-কে কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন, 'কবীরা গুণাহ্ হচ্ছে-

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ". (مسند البزار، ح:١٠٦ ومجمع الزوائد ١/١٠٤)

আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্ পাকের পাকড়াও থেকে নির্ভয় হওয়া।"[1] *(মুসনাদ বাজ্জার, হাদীস নং ১০৬; মাযমাউয যাওয়ায়িদ, ১০৪)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন,

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، (مصنف عبد الرزاق : ١٠/٤٥٩ ومعجم الكبير للطبراني، ح:٨٧٨٧)

'সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল- আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নির্ভিক হওয়া, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্র করুণা থেকে বঞ্চিত মনে করা।'[2] *(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ১০/৪৫৯; ত্বাবারানী, হাদীস নং ৮৭৮৭)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা 'আরাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর।
২. সূরা হিজরের ৫৬নং আয়াতের তাফসীর।
৩. আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নির্ভিক ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।
৪. আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (الأنبياء : ٩٠)

'তারা নেকীর কাজে দ্রুতগামী এবং আমাকে তারা আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতির সাথে আহবান (ইবাদত) করে ও আমাকেই তারা ভয় করতে থাকে।' (সূরা আম্বিয়া: ৯০)

[1] আল্লাহ্র ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ইবাদত পরিত্যাগ করা হল নিরাশ হওয়া আর আল্লাহ্র ভয়-ভীতির ইবাদত ত্যাগ করা হল তাঁর শাস্তি থেকে নির্ভিক হওয়া। অতএব, উভয়টি বান্দার অন্তরে একত্রিত হওয়া ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত আর উভয়টি বান্দার অন্তর থেকে বিদায় হওয়া বা হ্রাস পাওয়া হল পরিপূর্ণ তাওহীদের হ্রাস পাওয়া।

[2] আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া অধিকাংশ লোকের মধ্যে বিদ্যমান। রহমত আল্লাহ্র নেয়ামত-অনুগ্রহসমূহ অর্জন ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়াকে অন্তর্ভূক্ত করে। আর হাদীস বর্ণিত শব্দ 'রাওহ' দ্বারা উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়াই নেয়া হয়ে থাকে।

অধ্যায়-৩৪

তাকদীরের [ফায়সালার] উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (التغابن:١١)

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে তিনি হেদায়াত দান করেন।' (সূরা আত্-তাগাবুন: ১১)

আলকামা (رحمه الله) বলেন, 'সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মু'মিন, যে বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে সে বিপদগ্রস্ত হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই স্বীকার করে নেয়।[1]

সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ (صحيح مسلم، الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، ح:٦٧، ومسند أحمد ٢/٣٧٧، ٤٤١، ٤٩٦)

'মানুষের মধ্যে এমন দু'টি [খারাপ] স্বভাব রয়েছে, যার দ্বারা তাদের কুফরী প্রকাশ পায়।[2] তার একটি হচ্ছে বংশ উল্লেখ করে খোটা দেয়া, আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭; মুসনাদ আহমাদ, ২/ ৩৭৭, ৪৪১, ৪৯৬)

---

* তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ ঈমানের অঙ্গ এবং এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সকল নির্দেশনাবলী পালনে যেমন ধৈর্যের প্রয়োজন হয়; তেমন সকল নিষেধাবলীতেও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তেমনি জাগতিক বিষয়ে তাকদীরের উপরও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। অতএব ধৈর্যের তিন প্রকার হল জিহ্বাকে শেকায়েত, দোষারূপ করা থেকে বিরত রাখা, মনকে নারাজ হওয়া থেকে বিরত রাখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা।

[1] 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে আল্লাহ্ তাকে ইবাদতের উপর ধৈর্যধারণের ও ভাগ্যের উপর ক্রোধ হওয়া থেকে বিরত রাখবেন। বিপদাপদে পতিত হওয়া তাকদীরেরই অন্তর্ভূক্ত। আর তাকদীর আল্লাহ্র হিকমতের উপরে হয় এবং আল্লাহ্র হিকমতের দাবীই হল, প্রত্যেক কাজকে তার উপযুক্ত ও ভাল স্থানেই স্থাপন করা। যখন কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটবে তার মঙ্গল হবে যেন সে ধৈর্যধারণ করে। কিন্তু যদি সে ক্রোধ প্রকাশ করে তবে তাতে তার পাপ হবে।

[2] দুটি কুফরী স্বভাব এমন যা অধিকাংশ লোকের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং তা অবশিষ্ট থাকবে, (১) বংশের খোটা দেয়া এবং (২) মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ করা। মৃতের জন্য বিলাপ করা ধৈর্যের পরিপন্থী। অথচ সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধৈর্য হল চেহারাতে মারা, বুক চাপড়ানো ইত্যাদি থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা। মুখ দ্বারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা থেকে বিরত থাকা।

উক্ত স্বভাব কুফরী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, এগুলো করলে সে এমন কাফির হয়ে গেল যে মিল্লাত থেকে একেবারে বেরিয়ে গেল বরং যে এ সমস্ত কর্মে লিপ্ত হল সে কুফরীর একটি স্বভাবে লিপ্ত হল ও কুফরের একটি অংশে পতিত হল।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে মারফু হাদীসে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (صحيح البخاري، الجنائز، باب ليس منا من ضربالخدود، ح:١٢٩٧ وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، ح: ١٠٣ ومسند أحمد :١/٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢)

'যে ব্যক্তি [কোন দুর্ভাগ্য বা ক্ষতির জন্য আফসোস করে] গাল চাপড়ায়, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে ও জাহেলী যুগের ন্যায় বিলাপ করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৩; মুসনাদ আহমাদ, ১/৩৭৮, ৪৩২, ৪৪২)*

আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (جامع الترمذي، الزهد، باب في الصبر على البلاء، ح:٢٣٩٦)

'আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ করতে চান, তখন অতি দ্রুত দুনিয়াতেই তার [অপরাধের] শাস্তি প্রদান করেন।[2] পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার অকল্যাণ করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পুরো শাস্তি দিতে পারেন।' *(জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৯৬)*

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ (جامع الترمذي، الزهد، باب في الصبر على البلاء، ح:٢٣٩٦)

---

[1] মৃত্যু ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা ও উল্লেখিত কাজগুলো করা সবই কবীরা গুনাহ্; ফলে আমরা বলব ধৈর্য ত্যাগ করা, ক্রোধ প্রকাশ করা কবীরা গুনাহ। যে কোন পাপ ঈমানের ঘাটতি যায় এবং ঈমান আনুগত্যের মাধ্যমে বর্ধিত হয় পাপের কারণে ঈমান হ্রাস পায় আর ঈমান হ্রাস পেলে তাওহীদও হ্রাস পাবে। বরং ধৈর্য পরিত্যাগ করা হল, আবশ্যকীয় পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী হাদীসে বর্ণিত 'আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়'- এর অর্থ উক্ত কর্মগুলো কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।

[2] উক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র এক বড় হিকমতের বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ হিকমত যখন বান্দার মাথায় ধরবে তখন সে ধৈর্যকে এক মহা আন্তরিক ইবাদত জ্ঞান করে নিজে সে গুণে গুণান্বিত হবে এবং আল্লাহ্‌র ফায়সালা ও তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে অসন্তুষ্টিকে বর্জন করবে। অনেক সালফে সালেহীন বিপদে ও কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত না হলে নিজেদের উপর শেকায়েত করতেন যে, হয়ত আমার পাপ বেশি হয়ে গেছে বলে আল্লাহ্ কোন বিপদ দিচ্ছেন না।

'পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার উপর আল্লাহও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট থাকেন।' *(জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৯৬)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা তাগাবুন-এর ১১নং আয়াতের তাফসীর।
২. বিপদে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহ্র ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।
৩. কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরীর শামিল।
৪. যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল-চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোন ন্যায় রোদন করে, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।
৫. বান্দার কল্যাণের প্রতি আল্লাহ্র ইচ্ছার নিদর্শন।
৬. বান্দার অকল্যাণের প্রতি আল্লাহ্র ইচ্ছার নির্দশন।
৭. বান্দাহ্র প্রতি আল্লাহ্র ভালবাসার নিদর্শন।
৮. আল্লাহ্র প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।
৯. বিপদে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পুরস্কার (সওয়াব)।

অধ্যায়-৩৫

রিয়া* (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরীয়তের বিধান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠)

'[হে মুহাম্মদ], আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এ মর্মে ওহি পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ। অতএব, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।'[1] (সূরা কাহাফ: ১১০)

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ (صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب الرياء، ح: ٢٩٨٥)

'আমি অংশীদারদের শির্ক (অর্থাৎ অংশীদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি [ঐ] ব্যক্তিকে এবং শির্ককে তথা অংশীদারকে ও অংশীদারিত্বকে প্রত্যাখ্যান করি।'[2] *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৫)*

---

* রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদতের কঠোরতা সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'রিয়া' চোখ দ্বারা দেখা অর্থে অর্থাৎ মানুষ কোন নেকীর কাজ করার সময় এমন ইচ্ছা করবে যে তাকে লোক এমতাবস্থায় যেন দেখে এবং তার প্রশংসা করে। রিয়া দুই প্রকার: প্রথমটি হচ্ছে মুনাফিকদের রিয়া, যেমন তারা মনের ভিতরে কুফর গোপন রেখে ইসলাম প্রকাশ করে শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য এটা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বড় ধরণের কুফুরী। দ্বিতীয় রিয়া হচ্ছে, যে কোন মুসলমান তার কিছু আমল সম্পাদন করবে কিন্তু উদ্দেশ্য হবে লোক দেখানো এটাও শির্ক তবে তা ছোট ধরণের শির্ক এবং তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

[1] উক্ত আয়াতে সব ধরণের শিরকের নাকচ করা হয়েছে। লোক দেখানো বা লোক শুনানো সকল প্রকার ইবাদতও শিরকের আওতায় পড়বে।

[2] এ হাদীস রিয়া মিশ্রিত আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণ না হওয়ার দলীল এবং তা আমলকারীর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদি কোন ইবাদত শুরু থেকেই রিয়া অর্থাৎ দেখানোর জন্য হয় তবে সমস্ত ইবাদত বাতিল গণ্য হয় আর সে আমলকারী দেখানোর জন্য গুনাহগার হয়ে থাকে এবং ছোট শিরকে পতিত হয়।

আবু সাঈদ (ﷺ) থেকে অন্য এক 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ (مسند أحمد :٣/٣٠ وسنن ابن ماجة، الزهد، باب الريء والسمعة، ح:٥٢٠٤)

'আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে 'মসীহ দাজ্জালের' চেয়েও ভয়ঙ্কর?[1] সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে শিরকে খফী বা গুপ্ত শির্ক। [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার সলাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার সলাত দেখছে [বলে সে মনে করছে]।" *(মুসনাদ আহমাদ, ৩/৩০; সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৫২০৪)*

তবে যদি মূল ইবাদত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে; কিন্তু আমলকারী তাতে রিয়া মিশ্রণ করে ফেলে অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি ফরয সলাত আদায় করতে এসে সলাতের রুকু, সিজদাহ্ লম্বা করে, তাসবীহ বেশি বেশি পড়ে তবে এর ফলে উক্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে এবং তার ততটুকু ইবাদত বাতিল হবে যতটুকু সে রিয়া মিশ্রণ করেছে। এ তো দৈহিক ইবাদতের অবস্থা। আর যদি আর্থিক ইবাদত হয় তবে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। أشرك معي فيه غيري অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্যকেও অন্তর্ভূক্ত করলো।' এমন ইবাদতের অর্থ হল যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় সৎ আমলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথে সাথে অন্যের ও সন্তুষ্টির আশাধারী হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরণের শির্ক থেকে মুক্ত। তিনি তো শুধু এমন আমলই কবুল করে থাকেন যা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে।

[1] রিয়া দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকেও মারাত্মক তার কারণ হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট সে ব্যাপারে নবী (ﷺ) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু রিয়া মানুষের মনকে আক্রান্ত করে যা সংরক্ষণ অতীব কঠিন আর তা মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে মানুষের দিকে ধাবিত করে। ফলে নবী (ﷺ) এটাকে দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকে বেশি ভয়াবহতা বলে উল্লেখ করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা কাহাফের ১১০নং আয়াতের তাফসীর।

২. নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ্ ছাড়াও অন্যকে খুশী করার নিয়ত।

৩. এর [অর্থাৎ শির্ক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্র কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এ জন্য গাইরুল্লাহ্ মিশ্রিত কোন আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪. আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্ বহু গুণে উত্তম।

৫. রাসূল ﷺ-এর অন্তরে রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের উপর ভয় ও আশংকা।

৬. রাসূল ﷺ রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত সলাত আদায় করবে আল্লাহ্রই জন্যে। তবে সলাত সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার সলাত দেখছে।

অধ্যায়-৩৬

নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শির্ক*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(هود: ١٥-١٦)

'যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয় না। কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নাই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিস্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে।'[1] (সূরা হূদ: ১৫-১৬)

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

---

* নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরকে আসগার তথা ছোট শির্ক।

[1] অত্র আয়াতে কারীমা যদিও কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ কিন্তু আয়াতের ভাবার্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারাই তাদের 'আমল দ্বারা দুনিয়া অর্জন করতে চাইবে তারাও এ হুকুমের আওতায় পড়বে।

বান্দা যে সমস্ত কাজ দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে করে তা দু'প্রকার, প্রথমটি শুধু দুনিয়া অর্জনের জন্যেই কোন আমল সম্পাদন করা এবং পরকালের উদ্দেশ্যে না করা। যেমন- সলাত, রোজা ইত্যাদি আমল শুধু দুনিয়ার স্বার্থে সম্পাদন করা তবে উক্ত ব্যক্তি মুশরিক বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় প্রকার যে কাজগুলোর ব্যাপারে শরীয়ত উৎসাহ প্রদান করেছে যেমন আত্মীয়তা রক্ষা করা, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ইত্যাদি, যখন এরূপ কাজ শুধুমাত্র দুনিয়ার লক্ষ্যেই করা হবে; বরং আখিরাতের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না তখনও তা শিরকের পর্যায়ভূক্ত হবে। কিন্তু যখন দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই উদ্দেশ্য হবে সেটা বৈধ বলে গণ্য হবে। অত্র আয়াতের আলোকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মাল উপার্জনের লক্ষ্যে সৎ কাজ করে সেও অত্র বিধানের আওতায় পড়বে; যেমন কেউ যদি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে শুধু চাকুরীর জন্য এবং দুনিয়ার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য, তার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সে এ বিদ্যার মাধ্যমে নিজের অজ্ঞতা দূর করবে এবং জান্নাত লাভ করবে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তবে তারও বিধান একই রূপ হবে।

ঠিক যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করবে এবং কোন ব্যক্তি সৎকাজ করল অথচ ঈমান ভঙ্গকারী পাপে সে জড়িত থাকল তবে সেও অত্র বিধানের আওতায় পড়বে। অর্থাৎ সে মু'মিন থাকবে না। যদিও দাবী করে যে সে মু'মিন কিন্তু সে তার দাবীতে সত্য নয় কেননা সে যদি সত্যবাদী হয় তবে আল্লাহকে এক সাব্যস্ত করত।

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ

(صحيح البخاري، الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، ح:٢٨٨٧)

'দীনার ও দিরহাম অর্থাৎ সম্পদের [টাকা-পয়সার] পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী [পোশাক-বিলাসী] ধ্বংস হোক। যাকে দিলে খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়, সে ধ্বংস হোক, তার আরো করুণ পরিণতি হোক, কাঁটা ফুটলে সে যেন তা খুলতে সক্ষম না হয় [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধুলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি প্রার্থনা করলে তাতে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।'[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৭৮)*

---

[1] এখানে কেউ যদি দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে নবী ﷺ তাকে আব্দুদ্ দীনার বা দীনারের বান্দা বা পূজারী বলেছেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, দাসত্বের বিভিন্ন স্তর আছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ছোট শির্ক পর্যায়ের দাসত্ব।

বলা হয়ে থাকে, অমুক ব্যক্তি ঐ বস্তুর পূজারী। কেননা, সে বস্তুই তার কার্যক্রমের কারণ। আর এ কথাও বিদিত যে, পূজারী আপন প্রভূর আনুগত্যই করে থাকে এবং তার প্রভূ তাকে যে দিকে ধাবিত হতে বলবে সেদিকেই সে ধাবিত হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২. সূরা হূদের ১৫ ও ১৬নং আয়াতের তাফসীর।

৩. একজন মুসলিমকে টাকা-পয়সা [সম্পদ] ও পোশাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪. উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা, বান্দাকে দিতে পারলেই খুশি হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ধরণের লোক দুনিয়াদার।

৫. দুনিয়াদারকে আল্লাহ্‌র নবী এ বদ্‌দু'আ করেছেন, 'সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।'

৬. দুনিয়াদারকে এ বলেও অভিসম্পাত করেছেন, 'তার গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হোক এবং তা সে খুলতে না সক্ষম হোক।'

৭. হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে। সে সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানানো হয়েছে।

অধ্যায়-৩৭

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করল, আলিম, বুযুর্গ ও নেতাদের অন্ধভাবে আনুগত্য করল, সে মূলত তাদেরকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করল।*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُوْنَ : قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ؟ (مسند أحمد :١/٣٣٧)

'তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অথচ তোমরা বলছ, 'আবু বকর ও উমার (رضي الله عنهما) বলেছেন।[1] *(মুসনাদ আহমাদ, ১/৩৩৭)*

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহি.) বলেন, 'ঐ সব লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদীসের সনদ ও সিহ্‌হাত [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদীসের পরম্পরা ও সহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর মতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور:٦٣)

'অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে।'[1] (সূরা নূর: ৬৩)

---

* অত্র অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাওহীদের চাহিদা ও দাবী এবং কালেমা তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র উপকরণ সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে। কিতাব ও সুন্নাত বুঝার মাধ্যম হলো উলামায়ে কিরাম। বলা হয়েছে যে, তাদের অনুসরণ আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণের অধীনেই নিয়ন্ত্রিত হবে। নিরঙ্কুশ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র যা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইজতেহাদী বিষয়ে অর্থাৎ যেখানে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান বুঝা যাচ্ছে না সেখানে আলেমদের অনুসরণ করতে হবে, কেননা আল্লাহ্ তার অনুমতি দিয়েছেন।

[1] ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর কথার মর্মার্থ হচ্ছে, নবী (ﷺ) কথার বিপরীত কারো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তিনি আবু বকর বা উমার (رضي الله عنهما) হোন না কেন। তবে তারা ব্যতীত অন্যের কথা রাসূলুল্লাহ্‌র সামনে কিভাবে পেশ করা যেতে পারে?

তুমি কি জানো ফিতনা কি? ফিত্না হচ্ছে শির্ক্। সম্ভবত তাঁর কোন কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আদী বিন হাতেম (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে এ আয়াত পড়তে শুনেছেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: ٣١)

'তারা [ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতির লোকেরা] আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল।' (সূরা তাওবাঃ ৩১) তখন আমি নবীজিকে বললাম, 'আমরা তো তাদের ইবাদত করি না।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা আল্লাহ্র হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম বলে গ্রহণ কর না? আবার আল্লাহ্র হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললে, তোমরা কি তা হালাল বলে গ্রহণ কর না? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, 'এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য)।[2]

(আহমাদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন)

---

[1] কারো কথার কারণে নবী (ﷺ)-এর কথা যদি প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের কথা বলেছেন, 'দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তার তাদের ইচ্ছাধীন বক্রতা অবলম্বন করল আল্লাহ্ তা'আলাও শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিয়েছেন।'

[2] ধর্মীয় নেতাদের হালাল-হারামের ব্যাপারে অনুসরণ অর্থাৎ হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল মেনে নেয়া শুধু তাদের ধর্মীয় নেতার নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের সম্মান ও তাদের অনুসরণের জন্য অথচ সে জানে যে এটা হারাম। এটাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তারা ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। এটা বড় ধরণের কুফরী এবং শিরকে আকবার এবং তা হলো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের আনুগত্য মূলক ইবাদত পালন করা। দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলার ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করা। অথচ সে বুঝে এর জন্যে সে পাপী এবং সে তার গুনাহকেও স্বীকার করে কিন্তু সে পাপের প্রতি আসক্তি বা তাদের নৈকট্য পাওয়ার আসক্তি হওয়াই তাদের অনুসরণ করে থাকে। অতএব, এ সমস্ত লোকেরা হলো গুনাহগার। সম্মানিত লেখক এখানে সূফীদের তুরীকা, সূফীদের সীমালংঘন এবং সূফী সম্রাটদের বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক করেন। তারা তাদের পীরদের বশ্যতা স্বীকার করে এবং ঐ সমস্ত ওলীর অনুসরণ করে যারা তাদের ধারণায় ওলী, যারা প্রকৃত দ্বীনকে রদ-বদল করে ফেলে। আর এটিই হল ঐ সকল বান্দাকে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে রব বানিয়ে নেয়া।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা নূরের ৬৩নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা তাওবার ৩১নং আয়াতের তাফসীর।

৩. আদী বিন হাতেম (رضي الله عنه) ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) কর্তৃক আবু বকর এবং উমার (رضي الله عنه)-এর দৃষ্টান্ত আর ইমাম আহমাদ (রাহি.) কর্তৃক সুফইয়ান সওরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা।

৫. অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন [গোমরাহীর] পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পণ্ডিত ও পীর বুযুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদতে পরিণত হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় 'বেলায়েত'। 'আহ্বার' তথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্র ইবাদত করল, সে সালেহ বা পূণ্যবান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করল অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য ইবাদত করল, সেই জাহেল বা মূর্খ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

অধ্যায়-৩৮

ঈমানের দাবীদার কতিপয় লোকের অবস্থা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

(النساء: ٦٠)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবি করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [আল্লাহদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়, * অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহিতে নিমজ্জিত করতে চায়।'[1] (সূরা নিসা: ৬০)

---

* যেমন আল্লাহ্ তাঁর তাওহীদে রূবুবীয়াত ও তাওহীদ ইবাদতে একক ঠিক তেমনই বিধি বিধান ও হুকুম-ফয়সালাতেও তাঁকে এককভাবে মানতে হবে। সুতরাং অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র তাওহীদ এবং কালামায়ে শাহাদত বাস্তবায়ন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী হুকুম-ফায়সালা ছাড়া হবে না। জাহেলিয়াত যুগের বিধান তথা প্রথা এবং প্রাচীন কথ্যকাহিনীর কারণে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে পরিত্যাগ করা বড় ধরণের কুফরী হবে যা কালিমা তাওহীদকে বিনষ্ট করে দিবে। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম (রাহি.) তার গ্রন্থ 'তাহ্কীমূল কাওয়ানীন'- এ উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ-এর উপর জিব্রাঈল আমিন মারফত নাযিলকৃত মহান আল্লাহ্র বিধানকে মানবরচিত বিধানের সমতুল্য মনে করা বড় ধরণের কুফুরী ও নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী।

[1] মূলত যারা বিচার ফয়সালার জন্য তাদের কাছে যায়, তারা মিথ্যাবাদী তাঁদের ঈমানই নেই। আয়াতে বর্ণিত (يريدون أن يتحاكموا.....) তারা চয় যে, আপন হুকুম ফায়সালা তাগুতের নিকট নিয়ে তার থেকে ফায়সালা করাবে। এর (يريدون) (তারা চায়) শব্দ দ্বারা এক গুরুত্বপূর্ণ কায়দার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো তাগুতের নিকট থেকে ফায়সালা গ্রহণকারীর ঈমান তখন নাকচ হয়ে যায়, যখন সে স্বীয় ইচ্ছা ও আনন্দ চিত্তে তার থেকে ফায়সালা গ্রহণ করে ও তাকে অপছন্দ করে না। সুতরাং এক্ষেত্রেই ইচ্ছা-ইখতিয়ারকে একটি শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাগুতের নিকট থেকে স্বেচ্ছায় ফয়সালা কুফরের হুকুমে। (পক্ষান্তরে যদি তাকে তাগুত দ্বারা ফায়সালা করতে বা তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়, আর সে তা অপছন্দও করে তবে এমন নিরুপায় ব্যক্তি ঈমান মুক্ত হবে না।) وقد أمروا.... তারা তাগুত ও তার ফায়সালার প্রতি কুফরী করতে আদিষ্ট তাগুত দ্বারা ফায়সালা করানোকে অস্বীকার করা এবং তার সাথে কুফরী সম্মান প্রদর্শন। ويريد الشيطان আয়াদের এ অংশ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের দ্বারা ফায়সালা করানোর ইচ্ছা রাখা এবং তা গ্রহণ করা সরাসরি শয়তানী ইলহাম ও তার কুমন্ত্রণা দ্বারাই হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (البقرة: ١١)

'এবং তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো শুধু শান্তি স্থাপনকামী।'[1] (সূরা বাকারা: ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: ٥٦)

'পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।' (সূরা 'আরাফ: ৫৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ (المائدة: ٥٠)

'তারা কি বর্বর যুগের আইন চায়?'[2] (সূরা মায়িদা: ৫০)

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (قال النووي في الأربعين، ح:٤١ حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح)

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।' *(ইমাম নববী এ হাদীসটিকে তার কিতাবুল হুজ্জাহতে বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ৪১। তবে এ হাদীসটি যঈফ। হাফিয ইবনু রজব এ হাদীসটি যঈফ হওয়ার পিছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন- ১. হাদীসটির সনদে নুআইম বিন হাম্মাদ নামক রাবী যঈফ, ২) হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে, ৩) হাদীসের বর্ণনায় হযবরলতা তথা ইজতেরাব আছে।)*

---

[1] 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্র বিধান ছাড়া অন্যের বিধান বাস্তবায়নে তাঁর সাথে শির্ক করার মাধ্যমে বিপর্যয় ঘটে থাকে। পৃথিবীতে শরীয়ত ও তাওহীদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শির্ক এর মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। অত্র আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার বুঝা যায় যে মুনাফিকরা শির্কও এ জাতীয় গর্হিত কাজের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপর্যায়ের সৃষ্টি করে যদিও তারা বলে থাকে যে আমরাই তো শান্তিকামী।

[2] 'তারা কি বর্বর যুগের আইন চায়?' জাহেলী যুগের মানবরচিত আইনই সমাজ পরিচালিত হত এবং সেটাকে তারা শরীয়তের মতো বিধান মনে করত। আর তা মনে করার অর্থ হলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেটাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করা ও আল্লাহ্র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা যা প্রকৃতপক্ষে অনুসরণের ক্ষেত্রে শির্ক।

ইমাম শা'বী (রাহি.) বলেছেন, একজন মুনাফিক এবং একজন ইহুদীর মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া ছিল। ইহুদী বলল, 'আমরা এর বিচার-ফায়সালার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাব, কেননা মুহাম্মদ ﷺ ঘুষ গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিল। আর মুনাফিক বলল, 'ফায়সালার জন্য আমরা ইহুদী বিচারকের কাছে যাব, কেননা ইহুদীরা ঘুষ খায়, এ কথা তার জানা ছিল। অবশেষে জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে তখন এ আয়াত নাযিল হয়,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

(سورة النساء : ٦٠)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবি করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [আল্লাহদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়,* অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহিতে নিমজ্জিত করতে চায়।' (সূরা নিসা: ৬০)

(উপরোক্ত শানে নুযুলটি মওজু (জাল) সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। দেখুন, আসবাবুন্ নুযুল- ওয়াহেদী ও তাফসীরে বগভী, ১/১৫২)

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত দু'জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিল, মীমাংসার জন্য আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাব, অপরজন বলেছিল কা'বা বিন আশরাফের কাছে যাব। পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমংসার জন্য উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে সোপর্দ করল। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উপস্থাপন করল। যে ব্যক্তি

---

* যেমন আল্লাহ্ তাঁর তাওহীদে রুবুবীয়াত ও তাওহীদ ইবাদতে একক ঠিক তেমনই বিধি বিধান ও হুকুম-ফয়সালাতেও তাঁকে এককভাবে মানতে হবে। সুতরাং অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাওহীদ এবং কালামায়ে শাহাদত বাস্তবায়ন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী হুকুম-ফায়সালা ছাড়া হবে না। জাহেলীয়াত যুগের বিধান তথা প্রথা এবং প্রাচীন কথ্যকাহিনীর কারণে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে পরিত্যাগ করা বড় ধরণের কুফরী হবে যা কালিমা তাওহীদকে বিনষ্ট করে দিবে। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম (রাহি.) তার গ্রন্থ 'তাহ্কীমূল কাওয়ানীন'- এ উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ-এর উপর জিব্রাঈল আমিন মারফত নাযিলকৃত মহান আল্লাহ্র বিধানকে মানবরচিত বিধানের সমতুল্য মনে করা বড় ধরণের কুফুরী ও নাযিলকৃত বিধানের পরিপন্থী।

রাসূল ﷺ-এর বিচার ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তাকে লক্ষ্য করে উমার (রাঃ) বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এ রকম? সে বলল, 'হ্যাঁ'। তখন উমার (রাঃ) তরবারির আঘাতে লোকটিকে হত্যা করে ফেললেন।'

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা নিসার ৬০নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
২. সূরা বাকারার ১১নং আয়াতের তাফসীর।
৩. সূরা আ'রাফের ৫৬নং আয়াতের তাফসীর।
৪. সূরা মায়িদার ৫০নং আয়াতের তাফসীর।
৫. এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে শা'বী (রাহি.)-এর বক্তব্য।
৬. সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।
৭. মুনাফিকের উমার (রাঃ)-এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা।
৮. প্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর আনীত আদর্শের অনুগত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয়।

অধ্যায়-৩৯
আল্লাহ্‌র 'আস্‌মা ও সিফাত' [নাম ও গুণাবলী] অস্বীকারকারীর পরিণাম*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ﴾ (الرعد: ٣٠)

'এবং তারা রহমান [আল্লাহর গুণবাচক নাম]-কে অস্বীকার করে'[1] (সূরা রা'দ: ৩০)

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে আলী (রাঃ) বলেন, 'লোকদের এমন কথা বল, যা দ্বারা তারা [আল্লাহ্ ও রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে] সঠিক কথা জানতে পারে।[2] তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হোক?' আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) থেকে একটি হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গুণকে অস্বীকার করার

---

* অত্র অধ্যায়ের মূল গ্রন্থের সাথে সম্পর্ক দু'ধরণের: প্রথমটি হচ্ছে যে, ইবাদত তাওহীদের প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে নাম এবং গুণের তাওহীদও অন্যতম। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণ বিষয়ে কিছু অস্বীকার করা শির্ক ও কুফুরী, যা মানুষকে ধর্মচ্যুত করে। যখন প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নাম বা গুণ নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা রাসূল (ﷺ) তা নির্ধারণ করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তা অস্বীকার করে তবে সেটা কুফুরী হবে কেননা এর দ্বারা কিতাব ও সুন্নাতের মিথ্যারোপ করা হবে।

[1] রহমান আল্লাহ্‌র নামসমূহের একটি কিন্তু মক্কার মুশরিকগণ বলত আমরা ইয়ামামা-এর রহমান ছাড়া কাউকে রহমান হিসেবে জানি না। ফলে তারা রহমানকে অস্বীকার করত আর তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কেই অস্বীকার করা। রহমান রহমত গুণের অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নামেই একটি গুণ অন্তর্ভূক্ত এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নামেই একটি দুইটি বিষয় রয়েছে, **প্রথমত:** আল্লাহ্‌র তা'আলার সত্তা। **দ্বিতীয়তঃ** তাঁর ঐ গুণ যার অর্থ ঐ নামই প্রকাশ করে থাকে। এ জন্য আমরা বলব, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নামেই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে কোন গুণ অন্তর্ভূক্ত। যেমন আল্লাহ্ শব্দটি ইলাহ্ যার অর্থ ইবাদত থেকে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

[2] 'লোকদের এমন কথা বলো যে ব্যাপারে তারা পরিচিত।'- এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে জানা প্রত্যেকের প্রযোজ্য নয়। ফলে নাম এবং গুণবোধক তাওহীদের কিছু কিছু সূক্ষ্ম মাছআলা সম্পর্কে জনসম্মুখে আলোচনা না করায় উত্তম, তবে মোটামুটিভাবে তার উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব যা কুরআন ও সুন্নাতে প্রকাশিত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর অস্বীকারের একটি কারণ হলো কোন ব্যক্তি লোকদের সামনে নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে এমন কথা বলে থাকে যা বুঝতে তারা অক্ষম, যার ফলে তারা তা পুরাপুরি অস্বীকার করে ফেলে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানদের বিশেষ করে উলামাদের উপর ওয়াজিব হল, তারা লোকদেরকে আল্লাহ্ যা বলেছেন ও তাঁর নবী যা খবর দিয়েছেন তার কোন কিছুর যেন অস্বীকারকারী না বানায়, অর্থাৎ তারা যেন লোকদেরকে এমন কিছু বর্ণনা না করে যা তারা বুঝতে পারবে না এবং যে পর্যন্ত তাদের জ্ঞানও পৌছবে না, ফলে তা হবে তাদের মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণ।

জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[1] তখন তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করল? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখাল, আর মুতাশাবেহ্ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করল?

কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে [আল্লাহ্র গুণবাচক নাম] 'রহমান'-এর উল্লেখ করতে শুনতে পেল, তখন তারা 'রহামান' গুণটিকে অস্বীকার করল।[2] এ প্রসঙ্গে ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ﴾ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্র কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা।
২. সূরা রা'দের ৩০নং আয়াতের তাফসীর।
৩. যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা।
৪. অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।
৫. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর কোন একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

---

[1] আল্লাহ্ যাবতীয় গুণাবলীকে স্বীকার করতেই হবে কোন প্রকার উদাহরণ উপমা ব্যতীকেকেই। উল্লেখিত ব্যক্তি এ হাদীসকে একেবারে অপরিচিত ভেবে শুনামাত্র কেঁপে উঠে। তার এ অবস্থা হওয়ার কারণ হল, সে বুঝেছিল আল্লাহ্র এ গুণে মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য ও তুলনা হয়ে যায়, তাই সে উক্ত গুণ থেকে ভয় পেয়ে যায়। অথচ, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হল, যখনই আল্লাহ্ তা'আলার কোন গুণ কুরআন ও হাদীস থেকে শুনবে তখন তার সেরূপ অর্থ গ্রহণ করবে যেরূপ অন্য গুণাবলীর নেয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তার গুণাবলীকে ঐভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে তাতে মাখলুকের সাথে কোনভাবেই কোন সাদৃশ্য ও তুলনা জ্ঞাপন করা যাবে না এবং না তার নির্ধারিত ধরণ-আকৃতি বর্ণনা করা হবে। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) ঐ সমস্ত লোকের অন্তরের অবস্থা জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে বলেন, এরা কেমন যে, যখন তারা এমন কথা শুনে যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই তখন তাদের অন্তর নরম করে তার প্রতি তারা ঈমান না রেখে তার অপব্যাখ্যা, অস্বীকার ও নাকচ করে থাকে। যার ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

[2] আল্লাহ্র কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে, তা বিশ্বাস না করা এবং এ কর্মটি যা কুফুরী বলে সাব্যস্ত।

অধ্যায়-৪০

আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (النحل:٨٣)

অর্থ: 'তারা আল্লাহর নিয়ামত বা অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।' (সূরা নাহল: ৮৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রাহি.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা- 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।'[1] আ'উন ইবনে আবদিল্লাহ্ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, 'অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতো না।'[2] ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, "মুশরিকরা বলে, 'এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।"[3] আবুল আব্বাস যায়েদ ইবনে খালিদের হাদীসে এ কথা আছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

* যাবতীয় নিয়ামতকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করা বান্দার প্রতি ওয়াজিব। এর মাধ্যমেই তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে। কোন প্রকার নিয়ামতকে আল্লাহ ছাড়া কারো সাথে সম্পৃক্ত করা তাওহীদের পূর্ণতায় ঘাটতির সৃষ্টি করে এবং তা ছোট শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

[1] 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।'- এ ধরণের পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী কথাও এক ধরণের শির্ক। কেননা, এখানে সম্পদকে নিজের দিকে ও পূর্বপুরুষদের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে অথচ এ সম্পদ আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্বরূপ তার পূর্বপুরুষকে এবং পরবর্তীতে তাকে দিয়েছেন যে, সে পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে তা অর্জন করেছে। তোমার নিকট পর্যন্ত সম্পদ পৌছাতে তোমার পিতা শুধু একজন মাধ্যম ফলে, পিতা তার ইচ্ছামত সম্পদ বন্টন করতে পারেন না কেননা বাস্তবে মাল তার নয়।

[2] 'অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হত না' যেমন কেউ বলে, এ পাইলট যদি না হত তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হতাম। এ ধরণের কথা সম্পূর্ণ নাজায়েয যার মধ্যে কোন কর্মের সম্পর্ক ঐ কর্মের মাধ্যম বা কারণের প্রতি করা হয়। সেটা কোন মানুষের ব্যাপারে হোক, কোন জড় পদার্থের ব্যাপারে হোক, কোন স্থান বা মাখলুক যেমন- (বৃষ্টি, পানি এবং বাতাস এর ব্যাপারে হোক)।

[3] মুশরিকরা বলে 'এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।' তারা যখনই কোন জিনিস অর্জন করত তারা বলত যে, এটা অর্জন করেছি আমাদের ওলী বা নবী বা কোন মূর্তি বা দেবদেবীর কারণে। এসব মূহুর্তে তারা তাদের উপাস্যদের স্মরণ করত অথচ যিনি এগুলো দান করেছেন সে আল্লাহকে তারা ভুলে যেত অথচ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন শির্কী সুপারিশ কবুল করবেন না যা তারা স্মরণ ও ধ্যান করে থাকে।

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ (وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ح : ٧١)

'আমার কোন বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মু'মিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায়।' উল্লেখ করে বলেন, এ ধরণের অনেক বক্তব্য কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নেয়ামত দানের বিষয়টি গাইরুল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ্ তার নিন্দা করেন।'

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালাফে সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতই, 'অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকুল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা'- এ ধরণের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. নিয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।
২. জেনে শুনে আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।
৩. মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত এসব কথা আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।
৪. অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

---

[1] আলোচ্য মাসয়ালাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা। লোকদেরকে এর প্রতি সতর্ক করা উচিত, কেননা, আমাদের প্রতি অগণিত নেয়ামত যা গণনা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের জন্য ফরয ও অপরিহার্য হল তাঁর নেয়ামতের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকেই সাব্যস্ত করা এবং তাকে স্মরণ ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের সবচেয়ে বড় স্তর হল নিয়ামতের সম্বন্ধ তাঁর দিকেই সাব্যস্ত করা। তিনি তাঁর নবীকে নির্দেশ করেন, ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ অর্থাৎ 'আর তুমি তোমার রবের নেয়ামত সমূহকে বর্ণনা করতে থাকে।' অর্থাৎ তুমি বলতে থাক যে, এ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে, এটা আল্লাহ্‌রই নিয়ামত। কেননা অন্তর যদি কোন মাখলুকের দিকে ধাবিত হয়ে যায় তখন মানুষ শিরকে পতিত হয়ে যায় আর এ শির্‌ক তাওহীদের প্রকাশ করা ওয়াজিব। তোমার উচিত হবে যে, তুমি বলবে এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, এটা আল্লাহ্‌র নিয়ামত।

অধ্যায়-৪১

শিরকের কতিপয় গোপনীয় অবস্থা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة : ٢٢)

'অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না।'*

(সূরা বাকারা: ২২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, أنداد [আন্দাদ] হচ্ছে শির্ক যা অন্ধকার রাতে নির্মল কালো পাথরের উপর পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম।[1] এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, 'আল্লাহ্র কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম।' 'যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর ঢুকত।' 'হাঁসটি যদি ঘরে না থাকত তাহলে অবশ্যই চোর আসত।' কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা, 'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন' এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছ' এবং এ কথা বলা যে, 'আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখ না।'- এ ধরণের সকল বক্তব্যই শির্ক।

(ইবনে আবি হাতিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ (جامع الترمذي، الأيمان والنذور، باب ماجاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، ح:١٥٣٥ والمستدرك للحاكم: ١/١٨)

---

* তাওহীদের হাকিকত বা মর্মকথা হচ্ছে যে, হৃদয় গহীনে 'আল্লাহ্ ছাড়া কেউ থাকবে না তাঁর কোন শরীক নেই, নেই কোন সমকক্ষ। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন নামে কসম করা, যদি আল্লাহ্ এবং অমুক না থাকত এ জাতীয় কথা প্রয়োগ না করে শুধু আল্লাহ্র ব্যাপারে উল্লেখ করাই প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে দুটি স্তর রয়েছে: প্রথমটি হচ্ছে পূর্ণতা অর্থাৎ পরিপূর্ণ তাওহীদ যেমন সে বলবে, 'যদি আল্লাহ্ না থাকতেন তবে এমন হত না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জায়েয, যেমন সে বলবে 'যদি আল্লাহ্ না থাকতেন অতঃপর অমুক না থাকত তবে এটা হত না' কিন্তু এটা পূর্ণ তাওহীদ নয়, প্রথমটায় হচ্ছে পরিপূর্ণ তাওহীদ এজন্যই ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে অমুককে রেখ না।

[1] ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) যে বলেছেন, এগুলো সবই শির্ক, যেমন কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ্ এবং অমুক যদি না থাকত' কেননা واو যার অর্থ 'এবং' যা অংশীদারিত্ব ও বিলম্বহীনতার অর্থ বহন করে। পক্ষান্তরে ثم যার অর্থ 'অতঃপর', বিলম্বের অর্থ প্রকাশ করে। ফলে যদি আল্লাহ্ না থাকতেন অতঃপর অমুক না থাকত বলা বৈধ হবে; কিন্তু পূর্বের বাক্যটি অর্থাৎ واو দিয়ে বাক্যটি শিরকে আসগার হবে।

'যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহ্‌র নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শির্‌ক করল।'[1]
(ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৩৫; ইমাম হাকেম তাকে হাসান ও সঠিক বলেছেন, মুসতাদরাক হাকিম, ১/১৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেছেন,

"لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ". (معجم الكبير للطبراني : ٩/١٨٣، رقم: ٨٩٠٢ ومصنف عبد الرزاق: ٨/٤٦٩، رقم :١٥٩٢٩)

'আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে গাইরুল্লাহ্‌র নামে সত্য শপথ করার চেয়ে বেশি পছন্দীয়।'[2] *(ত্বাবারানী, ৯/১৭৩; ... মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৭/৪৬৯...)*

হুযাইফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان (رواه أبو داد)

'আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন, এ কথা তোমরা বলো না। বরং এ কথা বল, 'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে।'

(আবু দাউদ এ হাদীসটি সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)[3]

---

[1] 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া কারও নামে কসম খাবে সে কুফুরী অথবা শির্‌ক করবে। কসম মূলত বাক্যের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং যার নামে কসম করা হয় তার বড়ত্ব প্রকাশ পায়, ফলে কসম আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য কারও নামে কসম খাওয়া শিরকে আসগার তথা ছোট শির্‌ক কিন্তু কখনও কখনও তা বড় শিরকে পরিণত হতে পারে যখন কসমকৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র মত বড়ত্ব দান করা হবে। কসম তিন অক্ষরের যে কোন একটি দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে। অক্ষরগুলো হচ্ছে- الواو، الباء، التاء
কসমের নিয়ত না করেও সচরাচর যারা বলে থাকেন নবী (ﷺ)-এর কসম, কাবা ঘরের কসম, যে কোন ওলীর নামে কসম ইত্যাদি সেগুলোও শিরকে পরিণত হবে। কেননা এতে গায়রুল্লাহ্‌র সম্মান প্রদর্শন হয়ে থাকে।

[2] আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম করা অপেক্ষা গাইরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম কসম খাওয়া মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ্ হলেও শিরকে আসগার তথা ছোট শির্‌ক তার চেয়েও মারাত্মক। ফলে ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) পছন্দ করতেন যে, তাওহীদের সাথে মিথ্যা বলবেন কিন্তু শিরকের সাথে সত্য বলবেন না। কেননা তাওহীদের উত্তমতা মিথ্যার ঘৃণতার চেয়ে বড় এবং শিরকের ঘৃণতা, মিথ্যার ঘৃণতার চেয়ে নিকৃষ্ট।

[3] এ 'নাহী' (নাকচ করা) হারাম অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ এ ধরণের কথা বলা হারাম কেননা এ ধরণের কথা দ্বারা ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে শরীক করা হয়ে থাকে। তবে অবশ্য এ ধরণের কথা জানা জায়েয হবে, 'তাই হবে যা আল্লাহ্ চাইবেন অতঃপর অমুক' কেননা, মানুষের ইখতিয়ার আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে অধীন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ অর্থঃ 'তুমি চাওনা কিন্তু তাই চাও যা আল্লাহ তা'আলা চায়--।'(সূরা দাহরঃ ৩০)

ইব্রাহীম নাখ্য়ী থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, أعوذ بالله وبك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই।'- এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أعوذ بالله ثم بك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।'- এ কথা বলা তিনি জায়েয মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, لو لا الله ثم فلان 'যদি আল্লাহ্ অতঃপর অমুক না হয়' এ কথা বলো, কিন্তু لو لا الله وفلان অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ্ এবং অমুক না হয়' এ কথা বলো না।[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্র সাথে শরীক করা সংক্রান্ত সূরা বাকারার ২২নং আয়াতের তাফসীর।
২. শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কিরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।
৩. গাইরুল্লাহ্র নামে কসম করা শির্ক।
৪. গাইরুল্লাহ্র নামে সত্য কসম করা, আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম করা চেয়েও জঘন্য গুনাহ্।
৫. বাক্যে অবস্থিত الواو এবং ثم এর মধ্যে পার্থক্য।

---

[1] ইবরাহীম নাখয়ীর 'আমি আল্লাহ্ ও আপনার কাছে আশ্রয় চাই' এ ধরণের কথা অপছন্দের কারণ হল, এখানে الواو শব্দটি আশ্রয় চাওয়ার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের দাবী রাখে। আশ্রয় চাওয়ার দুটি দিক যা ইতিপূর্বে বর্ণনাও করা হয়েছে, প্রকাশ্য দিক ও অপ্রকাশ্য দিক।
শরণাপন্ন হওয়া, আশ্রয় লওয়া, কামনা, ভয়-ভীতি এবং যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে তার দিকে হৃদয়কে ধাবিত করা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যে বিশুদ্ধ, অন্যের জন্যে নয়। বর্ণিত কারাহাত বা অপছন্দনীয় দ্বারা সালাফে সালেহীন অধিকাংশই হারাম উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। কখনো কখনো তা হারাম নয় এমন ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু তা একমাত্র সে ক্ষেত্রেই যার কোন দলীল নেই।

অধ্যায়-৪২

আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ (سنن ابن ماجة، الكفارات، باب من حلف له بالله فليرض، ح:٢١٠١)

'তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, তার উচিত কসমকে বাস্তবায়িত করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লহর নামে কসম করা হলো, তার উচিত উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই।'[1] *(সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২১০১। সনদ হাসান)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।
২. যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে কসম করা হল, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।
৩. আল্লাহ্‌র নামে কসম করার পর, যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

---

[1] এ বিধান সকল প্রকার কসমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিচারকের কাছে হোক কিংবা যেখানেই হোক কসমে যেহেতু বড়ত্ব প্রমাণ করা হয়। ফলে যার জন্য আল্লাহ্‌র নামে কসম খাওয়া হবে তার উচিত তাকে বিশ্বাস করা যদিও সে মিথ্যা কসম খায় কিন্তু তার উপরে ভরসা না করা তাঁর জন্য বৈধ হবে। তবে সে যে মিথ্যা কসম খেয়েছে তা জানতে দিবে না। যেহেতু কসমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব কামনা করা হয়েছে।
আল্লাহ্‌র কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হল না, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই। এ দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ্‌র কসমের প্রতি সন্তুষ্টি না হওয়ার কবীরা গুনাহ।

অধ্যায়-৪৩

আল্লাহ্ এবং আপনি যা চেয়েছেন বলার হুকুম*

কুতাইলাহ্ বর্ণনা করেন,

أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ : وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ (سنن النسائي، الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة، ح:٣٨٠٤)

'রাসূল ﷺ-এর কাছে একজন ইহুদী এসে বলল, 'আপনারা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করে থাকেন। কারণ, আপনারা বলে থাকেন, ماشاء الله وشئت আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন, والكعبة অর্থাৎ কা'বার কসম।' এরপর রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে, ورب الكعبة 'কা'বার রবের কসম' আর যেন, ماشاء الله ثم شئت 'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন'- এ কথা বলে।'[1] (হাদীসটি নাসায়ী বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন, সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩৭০৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আরও একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ فَقَالَ : أَجَعَلْتَنِي لِلّٰهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ (عمل اليوم والليلة للنسائي، ح: ٩٨٨ ومسند أحمد ١/٢١٤)

'এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলল, ماشاء الله وشئت [আপনি এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন] তখন রাসূল ﷺ বলেছেন, أجعلتني لله نداً 'তুমি কি

---

* এ কথা বলা শব্দগত শির্ক এবং ইখতিয়ারে আল্লাহ্র সাথে গাইরুল্লাহ্র শির্ক সাব্যস্ত হয়। আর এ শির্ক হল শিরকে আসগার।

[1] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কখনো কখনো প্রবৃত্তি পূজারীরাও হক্বপন্থীদের প্রতিবাদ করে থাকে যে, যেমন তাদের মধ্যে ভ্রান্তিতা রয়েছে হক্বপন্থীদের মধ্যেও রয়েছে। সুতরাং হক্বপন্থীদের উচিত যদি এরূপ হয়ে থাকে, তবে, সঙ্গে সঙ্গেই হক্ব গ্রহণ করে নেয়া তা যার নিকট থেকেই পাওয়া যায়। কখনও কখনও কুপ্রবৃদ্ধি স্বভাবের লোকেরাও সঠিক পথ বুঝতে পারে এবং তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা হক্ব সর্বদা গ্রহণযোগ্য যদিও তা ইহুদী খ্রিস্টানদের মাধ্যমে আসুক না কেন।

আল্লাহ্‌র সাথে আমাকে শরীক করে ফেলেছ?' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, তা এককভাবেই করেছেন।[1] *(নাসাঈ, হাদীস নং ৯৭৭; মুসনাদ আহমাদ, ১/২১৪)*

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মায়ের দিক দিয়ে (আখ্ইয়াফী) ভাই, তোফায়েল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمِ الْقَوْمُ، لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، إِنَّكُمْ لأَنْتُمِ الْقَوْمُ، لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمِ الْقَوْمُ، لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ، فَقَالُوا: لأَنْتُمِ الْقَوْمُ، لَوْلا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ (سنن ابن ماجة، الكفارات، باب النهي أن يقال : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، ح: ٢١١٨ ومسند أحمد :٥/٧٢)

'আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহ্‌র পুত্র না বলতে। তারা বলল, 'তোমরাও অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা ماشاء الله وشاء محمد (আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা ইচ্ছা করেন।' এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, 'ঈসা (আ:) আল্লাহ্‌র পুত্র এ কথা না বললে, তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বলল, 'তোমরাও ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা

---

[1] শিরকে আসগার তথা ছোট শির্‌কগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যায়ক্রমে দূর করেছেন, কিন্তু বড় বড় শির্‌ক নবুয়তের প্রথম থেকেই দূরীভূত করেছেন এবং শিরকে আকবার উৎখাত কাল বিলম্ব করা জায়েয হবে না। তবে শব্দগত শির্‌ক বা ছোট শির্‌ক বিশেষ স্বার্থে যেমন, দাওয়াতের স্বার্থে অথবা স্বল্প গুরুত্বের বিষয়ের উপর মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে বৃহৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সেগুলোতে দেরীতে নিষেধ করা যেতে পারে, কিন্তু মহা শির্‌ক কোন প্রকার স্বার্থের কারণে সহ্য করা যাবে না।

না বলতে, 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন।' সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। অতঃপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাকে এ সংবাদটি জানালাম। তিনি বললেন, এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছ? বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, 'তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছ, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলে থাক, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা ماشاء الله وشاء محمد অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ যা ইচ্ছা করেন'- এ কথা বল না বরং তোমরা বল ماشاء الله وحده অর্থাৎ 'এককভাবে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন।'

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. ছোট শির্ক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।
২. কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।
৩. রাসূল ﷺ-এর উক্তি ماشاء الله وشئت তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানিয়েছ? [অর্থাৎ এ কথা বললেই যদি শির্ক হয়,] তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, هي مالي من الوذ به سواك হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং [এ কবিতাংশের] পরবর্তী দুটি লাইন। [অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরণের শির্কী গুনাহ্ হবে।] অথবা কেউ যদি রাসূল ﷺ-কে আহ্বান করে বলে যে, হে রাসূলদের ইমাম! আমার তো আমার জন্য আল্লাহ্র দরজা। হে রাসূল আপনি ভরসা, আমার হাত ধরে থাকুন ও পরকালেও ধরবেন, কেননা আপনি ব্যতীত আমার সংকীর্ণতাকে কেউ সহজ করতে পারবে না। ইত্যাদি এসব অবশ্য শিরকের অন্তর্ভূক্ত।
৪. নবী ﷺ-এর বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার [বড় শির্ক]-এর পর্যায়ভূক্ত নয়।
৫. নেক স্বপ্ন ওহীর] শ্রেণীভুক্ত।
৬. স্বপ্ন শরীয়তের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।

অধ্যায়-৪৪

যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়।*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (الجاثية: ٢٤)

'অবিশ্বাসীরা বলে, শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি, যামানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।'[1]

(সূরা জাসিয়াঃ ২৪)

সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (صحيح البخاري، التفسير، سورة حم الجاثية، باب وما يهلكنا إلا الدهر، ح:٤٨٢٦ وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، ح :٢٢٤٦)

'আদম সন্তান আমাকে পীড়া দেয়। কারণ, সে যুগ বা সময়কে গালি দেয়।[2] অথচ আমিই হচ্ছি [যুগ] সময়। আমিই [সময়ের] রাতদিনকে পরিবর্তন করি।'

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪৬)

---

* যামানাকে ভালো-মন্দ বলা বা গালি দেয়া নাজায়েয। এ ধরণের অভ্যাস বর্জন করা খুবই জরুরী। যামানাকে গালি দেয়া পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। সাধারণত মূর্খ লোকদের দেখা যায় যে, তারা যামানাকে গালি দেয়, যখনই কোন সময় তাদের মনমতো কোন কাজ হয় না তখনই তার সে সময় বা যুগকে কটুক্তি এবং সেই দিন অথবা মাস অথবা বছরকে অভিশাপ প্রদান করে। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, যামানার কিছু করার ক্ষমতা নেই বরং যা কিছুর পরিবর্তন ঘটে তা স্বয়ং আল্লাহ্ করেন। ফলে গালি আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যামানাকে গালি দেয়ার কয়েকটি স্তর আছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হল যামানাকে অভিশাপ করা; কিন্তু কোন কোন বছরকে কঠিন বছর বলা অথবা কোন কোন দিনকে কালোদিবস হিসেবে আখ্যায়িত করা অথবা কোন কোন মাসকে অশুভ বলে আখ্যায়িত করা যামানাকে গালি দেয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে না। কেননা এটা নির্দিষ্ট একটা ব্যাপার। যে দিনে তার ভাগ্য তার সহায় হয়নি অর্থাৎ যেন সে তার অবস্থার বর্ণনা করছে যামানার ভাল মন্দের নয়।

[1] তাওহীদবাদীরা প্রতিটি বস্তুর সম্বোধন আল্লাহ্র দিকে করেন আর মুশরিকগণ প্রতিটি বস্তুর সম্বোধন যামানার দিকে করে।

[2] এর অর্থ এ নয় যে, যামানা আল্লাহ্র নামসমূহের একটি। বরং এখানে বলার অর্থ হল, যামানা স্বয়ং না কোন জিনিসের মালিক না কিছু করে বা করতে পারবে বরং যামানার প্রকৃত ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন করেন এবং এ দু'টির কোন কর্মক্ষমতা নাই ফলে এ দু'টিকে গালি দেয়া তাদের এ পরিবর্তনকারীকে গালি দেয়ারই নামান্তর।

অন্য বর্ণনায় আছে,

لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ (صحيح مسلم، الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر، ح: ٢٢٤٦)

'তোমরা যুগকে গালি দিওনা। কারণ, আল্লাহ্ই হচ্ছেন যামানা।'

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪৬)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. যুগ বা সময়কে গালি দেয়া নিষেধ।
২. যুগকে গালি দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।
৩. فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ 'আল্লাহ্ই হচ্ছেন যুগ' রাসূল ﷺ-এর এ বাণীর মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় নিহিত রয়েছে।
৪. বান্দার অন্তরে আল্লাহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধানতাবশত মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

অধ্যায়-৪৫

কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক, প্রভৃতি) নামকরণ প্রসঙ্গ*

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সহীহ হাদীসে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

(صحيح البخاري، الأدب، باب الأسماء إلى الله، ح:٦٢٠٦ وصحيح مسلم، الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك...، ح:٢١٠٦)

'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার নামকরণ করা হয় 'রাজাধিরাজ' বা 'প্রভুর প্রভু'।[1] আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রভু নেই।' *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৬)*

সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, 'রাজাধিরাজ' কথাটি 'শাহানশাহ' এর মতোই একটি নাম। আরও একটি বর্ণনা মতে রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ (صحيح مسلم، الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك...، ح : ٢١٤٣ ومسند أحمد : ٢/٣١٥)

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে [যার নামকরণ করা হয়েছে রাজাধিরাজ]।'[2] উল্লেখিত হাদীসে (أخنع يعني أوضع) শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৪৩; মুসনাদ আহমাদ, ২/৩১৫)*

---

* মানুষ নির্দিষ্ট কিছু একটার অথবা নির্দিষ্ট কোন ভূমির মালিক, কোন রাজ্যের মালিক হতে পারে; কিন্তু সবকিছুর মালিক, সারা পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। সুতরাং রাজাধিরাজ শাহানশাহ্ মাহাবিচারক, এ জাতীয় নাম আল্লাহ্ ছাড়া কারও জন্যই জায়েয নয়। কেননা তাওহীদের দাবীই হল যে, এ ধরণের নামে নামকরণ একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই।

[1] একমাত্র আল্লাহ্ই মহা অধিপতি, অতএব, এ ধরণের নাম মানুষের জন্য রাখার অর্থ হল আল্লাহ্র জন্য যা নির্ধারিত তা গ্রহণ করা। কেননা আধিপত্য তো একমাত্র আল্লাহ্র আর মানুষের জন্য এধরণের বলা যেতে পারে যে, সে অমুক জিনিসের মালিক, প্রত্যেক জিনিসের নয়। অথবা সে অমুক দেশের বাদশাহ্ বা মালিক কিন্তু সমস্ত বিশ্বের নয়। এজন্যে তাওহীদের দাবী হল, সৃষ্টির মধ্যে কাউকে রাজাধিরাজ বলা যাবে না। বরং কোন কিতাবে যদি পাওয়া যায় তবে তা মিটিয়ে দিতে হবে।

[2] আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হওয়ার কারণ যে, সে এ নামের দ্বারা আল্লাহ্র সমকক্ষ হবার জন্য নিজেকে পেশ করেছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. 'রাজাধিরাজ' নামকরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।
২. 'রাজাধিরাজ' ব্যতীত এর সমার্থবোধক শব্দও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত, যেমন সুফিয়ান সাওরী 'শাহানশাহ' শব্দটি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন।
৩. উল্লেখিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবাধানতা অবলম্বন করা। এ ক্ষেত্রে অন্তরে কী নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।
৪. এ বিষয়টি দ্বারা বুঝা উচিত যে, ঐ সমস্ত নাম ও গুণাবলী থেকে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হল আল্লাহ্ তা'আলারই বড়ত্ব প্রকাশ।

[লেখক (রাহি.) এখানে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে সমস্ত নামের অর্থ একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই প্রযোজ্য সেই নামে কারো নাম রাখা বৈধ নয়।]

অধ্যায়-৪৬

আল্লাহ্‌র নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্মানার্থে [শির্‌কী] নামের পরিবর্তন করা।*

আবু শুরাইহ্ হতে বর্ণিত আছে, এক সময় তার উপাধি ছিল আবু হাকাম[1] (জ্ঞানের পিতা) রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ؟ قَالَ شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ : شُرَيْحٌ، قَالَ : فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ (سنن أبي داود، الأدب، باب تغيير الإسم القبيح، ح:٤٩٥٥ وسنن النسائي، آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم، ح :٣٥٨٩)

'আল্লাহ্ তা'আলাই হচ্ছেন জ্ঞানের সত্তা এবং তিনিই জ্ঞানের আধার।' তখন আবু শুরাইহ্ বললেন, 'আমার গোত্রের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফায়সালার জন্য আমার নিকট চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' রাসূল ﷺ এ কথা শুনে বললেন, এটা কতোইনা ভাল! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আমি বললাম, 'শুরাইহ্', 'মুসলিম' এবং 'আব্দুল্লাহ্' নামে আমার তিনটি ছেলে আছে।' তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে?' আমি বললাম 'শুরাইহ্'। তিনি বললেন, অতএব এখন থেকে তুমি আবু শুরাইহ্ (শুরাইহের পিতা)"

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০০; আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৩৫৭৯)

---

* একজন তাওহীদবাদী বান্দার আল্লাহ্‌র সাথে তার অন্তরের এবং জিহ্বার (ভাষার) কি ধরণের আচরণ হওয়া উচিত তার বর্ণনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। আল্লাহ্‌র নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কখনও উত্তম আবার কখনও ওয়াজিব।

[1] হাকাম আল্লাহ্‌র নামসমূহের অন্যতম। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জন্ম দেননি এবং নিজেও জন্মগ্রহণ করেননি। ফলে আবুল হাকাম অর্থাৎ হাকামের পিতা নামকরণ উচিত নয়। দ্বিতীয়ত হাকামা অর্থ হচ্ছে যিনি চূড়ান্ত বিচারক এবং যেহেতু বিচার কার্যের একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্‌র, ফলে এরূপ নামকরণ কারও জন্য জায়েয নয়। যদিও মানুষ অধিনস্থ হিসাবে বিচারক হয়ে থাকে। ফলে নবী ﷺ এ নামটিকে অপছন্দ করেন। সুতরাং বলব যে, হাকাম অথবা হাকিম নাম রাখতে তেমন কোন বাঁধা নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্‌র আসমা ও সিফাত [অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর] সম্মান করা। যদিও তার অর্থ বান্দার উদ্দেশ্য না হয়।

২. আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩. উপাধির জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

অধ্যায়-৪৭

আল্লাহ্, কুরআন এবং রাসূল ﷺ সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করা।*

আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ (التوبة :٦٥)

'আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল-তামাশা করছিলাম।'[1] (সূরা তাওবাহ : ৬৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, মুহাম্মদ বিন কা'ব, যায়িদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, [তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে] তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বলল, এ ক্বারীদের [কুরআন পাঠকারীদের], কথায় এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সামনে এতো অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথার মাধ্যম মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর ক্বারী সাহাবায়ে কিরামের দিকে ইঙ্গিত করছিল। আওফ বিন মালিক লোকটিকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, কারণ, তুমি মুনাফিক।' আমি অবশ্যই রাসূল ﷺ-কে এ খবর জানাবো, আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তাঁর চেয়েও অগ্রগামী [অর্থাৎ আওফ পৌছার পূর্বেই ওহির মাধ্যমে রাসূল ﷺ ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন] এ ফাঁকে মুনাফেক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে আসল। তারপর সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মত পরস্পরের হাসি, রং- তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিল, আর সে বলছিল, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।' তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

---

* তাওহীদের দাবীই হল, আল্লাহ্র বিধি-বিধানকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা এবং তার অনুসরণ ও সম্মান করা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্, কুরআন রাসূল ﷺ সম্পর্কিত কোন বিষয় হাসি-তামাশা ঠাট্টা-বিদ্রুপ সম্পূর্ণরূপে তাওহীদের পরিপন্থী ও সম্মান বিরোধী। এজন্যে তা হল বড় ধরণের কুফরী। অনুরূপ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রুপ করাও কুফুরী। কাজেই বড় ধরণের কুফুরী সব মানুষকেই ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়।

[1] অত্র আয়াতের আলোকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্, নবী ও কুরআনের সাথে বিদ্রুপকারী কাফির এবং এক্ষেত্রে তার কোনই ওযর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। অত্র আয়াতে কারীমা মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তাওহীদপন্থীদের দ্বারা শরীয়তের-সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কল্পনাতীত ব্যাপার।

﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (التوبة:٦٥)

'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত [কুরআন] এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে?' (সূরা তাওবা: ৬৫) তিনি তার দিকে [মুনাফেকের দিকে] দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তারা কাফের।

২. এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ, কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

৩. চোগলখুরী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠতার মধ্যে পার্থক্য।

৪. এমন কিছু অজুহাত রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

অধ্যায়-৪৮

আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের নাশোকরী করা অহংকারের প্রকাশ ও অনেক বড় অপরাধ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾ (فصلت: ٥٠)

'দুঃখ-দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নিয়ামত আমারই জন্য হয়েছে।' (সূরা ফুস্সিলাত: ৫০)

প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, এটা আমারই জন্য, এর অর্থ হচ্ছে, 'আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নিয়ামত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার।'

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, 'সে এ কথা বলতে চায়, নিয়ামত আমার আমলের কারণেই অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।'[1]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾ (القصص: ٧٨)

'সে বলে, নিশ্চয়ই এ সম্পদ আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস: ৭৮)

কাতাদাহ (رحمه الله) বলেন, উপার্জনের রকমারি পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছি। অন্যান্য মুফাস্সিরগণ বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার ইলম. মোতাবেকই এ সম্পদের আমি উপযুক্ত। আমার মর্যাদার বদৌলতেই এ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।'[2] মুজাহিদের এ কথার অর্থই উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

---

[1] আলোচিত অধ্যায়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি দাবী করে, সে সব নিয়ামত ও রিযিক প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার ফসল। অথবা যে ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ্র উপর তার প্রাপ্য হক হিসেবেই সে এসব নিয়ামতের হকদার, তাকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, এ রকম ধারণা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অহংকারমূলক কথা। বান্দার আমল নিছক একটি কারণ মাত্র, কখনো এ কারণ আল্লাহ্র হুকুমে ফলপ্রসূ হয় আবার কখনো বিনা কারণেই মানুষের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। সুতরাং সব কিছু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই অনুগ্রহে হয়ে থাকে।

[2] অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, বড় ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারী হবার পর তারা পূর্বের অবস্থাকে অস্বীকার করে ও বলে নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে আমি সম্পদের মালিক হয়েছি ঠিক তেমনই অনেকে চাকুরী ও বড় পদ পেয়ে বলে আমি আমার পরিশ্রমে তা অর্জন করেছি।

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الإِبِلُ وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ

سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

(صحيح البخاري، أحاديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ح:٣٤٦٤ وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر، ح:٣٩٦٤)

'বনী ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিল। যাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, আরেকজন টাক পড়া ও অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফেরেশ্‌তা পাঠালেন। কুষ্ঠরোগীর কাছে ফেরেশ্‌তা এসে জিজ্ঞেস করল, তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? সে বলল, সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক [শরীরের চামড়া]। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেশ্‌তা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিল। এতে সে আরোগ্য লাভ করল। তাকে সুন্দর রং আর সুন্দর ত্বক দেয়া হল। তারপর ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞেস করল 'তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বলল, 'উট অথবা গরু'। [ইসহাক অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দুয়ের মধ্যে সন্দেহ করেছেন।] তখন তাকে দশটি গর্ভবতী উট দেয়া হল। ফেরেশ্‌তা তার জন্য দু'আ করে বলল, আল্লাহ্ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।

তারপর ফেরেশ্‌তা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বলল, 'তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? 'লোকটি বলল, 'আমার প্রিয় জিনিস হল সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি চাই।' ফেরেশ্‌তা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ফলে তার মাথার চাক দূর হয়ে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হল। অতঃপর ফেরেশ্‌তা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়?' সে বলল, 'উট অথবা গরু।' তখন তাকে গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। ফেরেশ্‌তা তার জন্য দু'আ করে বলল, 'আল্লাহ্ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।

তারপর ফেরেশ্‌তা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বলল, 'তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি?' লোকটি বলল, 'আল্লাহ্ যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাব, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।' ফেরেশ্‌তা তখন তার

চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা তাকে বললেন, 'কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়?' সে বলল, 'ছাগল আমার বেশি প্রিয়।' তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হল। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। অবশেষে অবস্থা এ দাঁড়াল যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেল, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেল। একদিন ফেরেশ্তা তার স্বীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠরোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি একজন মিসকিন। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে [আমি খুবই বিপদগ্রস্ত] আমার গন্তব্য পৌছার জন্য প্রথমে আল্লাহ্র অতঃপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ্ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারি।' তখন লোকটি বলল, 'দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে।' ফেরেশ্তা বলল, 'আমার মনে হয় আমি আপনাকে চিনি। আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ও খুব গরীব ছিলেন না? লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করত। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন।' তখন লোকটি বলল, এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশ্তা তখন বলল, 'তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।'

তারপর ফেরেশ্তা টাক-পড়া লোকটির কাছে গেল এবং ইতোপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরণের কথা বলেছিল, তার [টাকওয়ালা লোকাটির] সাথেও সে ধরণের কথা বলল। প্রত্যুত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরণের জবাব দিয়েছিল, এ লোকটিও সেই একই জবাব দিল। তখন ফেরেশ্তা আগের মতই বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।' অতঃপর ফেরেশ্তা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্র অতঃপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি ছাগল আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার এ সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারি।' তখন লোকটি বলল, 'আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আপনার যা খুশি রেখে যান। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বাধা দেব না। তখন ফেরেশ্তা বলল, 'আপনার

মাল আপনিই রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হল। আপনার আচরণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গীদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৬৪)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা ফুস্সিলাতের ৫০নং আয়াতের তাফসীর।

২. ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾-এর অর্থ।

৩. ﴿لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾-এর অর্থ।

৪. বনী ইসরাঈলে তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত এ বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে নিহিত বিরাট উপদেশাবলী।

---

[1] আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ উক্ত তিন ব্যক্তিকেই সুস্থতা দান করেছিলেন; কিন্তু দু'জনই সকল নিয়ামত ও সম্পদকে নিজেদের দিকে সম্পর্কিত করেছিল। আর তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কিত করেছিল আল্লাহ্র দিকে, তাই তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছিলেন ও তার প্রতি তার নিয়ামতকে স্থায়ীকরণের উপায় হচ্ছে যে, বান্দা তার বড়ত্ব বর্ণনা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, সমস্ত অনুগ্রহই আল্লাহ্র হাতে। পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ হচ্ছে যে বান্দা বিশ্বাস করবে যে, সে আল্লাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ্র নিকট সে কোন কিছুই হক্বদার নয় বরং আল্লাহ্ই প্রতিপালক এবং সকল প্রকার ইবাদত, কৃতজ্ঞতা ও মহত্বের উপযুক্ত। অতএব তাঁকে স্মরণ করতে হবে ও নিয়ামতসমূহ তাঁরই দিকে সম্পর্কিত করতে হবে।

অধ্যায়-৪৯

সন্তানাদি পাওয়ার পর আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার করা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ (الأعراف: ١٩٠)

'অতঃপর আল্লাহ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর শরিক গণ্য করতে শুরু করল।'

(সূরা আ'রাফ: ১৯০)

ইবনে হাযম (রাহি.) বলেন, মুফাস্‌সিরীনগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমন: আবদু উমার, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে 'আব্দুল মুত্তালিব' এর ব্যতিক্রম।[1]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আদম (عليه السلام) যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বলল, 'আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে নাকি তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে। তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য কর, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় হরিণের শিং গজিয়ে দিব, তখন সন্তান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই এ কাজ করে ছাড়ব, আমি অবশ্য এ কাজ করে ছাড়ব। শয়তান এভাবে তাদরকে ভয় দেখাচ্ছিল। শয়তান বলল, 'তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রেখ।[2] তখন তাঁরা

---

[1] উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, বান্দা শব্দের নামে সম্বোধন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দিকে হারাম বরং তা সকল নবীর শরীয়তে হারাম ছিল। কেননা এখানে নিয়ামতের সম্পর্ক গাইরুল্লাহ্‌র দিকে হয়ে যায়, তাছাড়াও আল্লাহ্‌র সাথে আদবেরও বরখেলাফ। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আব্দুল মুত্তালিব নামের বৈধতা ও অবৈধতা প্রশ্নে উলামায়ে কিরাম একমত হননি। কেউ কেউ বলেছেন আব্দুল মুত্তালিব নামটি মাকরূহ কিন্তু হারাম নয়। কিন্তু এটা সঠিক নয় এবং এ নামের বৈধতার স্বপক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয় তাও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, নবী (ﷺ)-এর কথা 'আমি মিথ্যুক নবী নই আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।' এটা শুধু তিনি অবস্থার খবর দিয়েছে বৈধ ও অবৈধের বিধান দান করেন নাই। এতে মাখলুকের জন্য উবূদিয়াতের সম্পর্ক নির্ধারণ করেননি। সাহাবায়ে কেরাম যে আব্দুল মুত্তালিবের নামে কারও নাম রেখেছিলেন তা মূলত ভুল বর্ণনা করা হয়েছে বরং তারা নাম রেখেছিলেন মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিব নয়।

[2] উক্ত ঘটনায় আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার অর্থ হল, তাঁরা সন্তানের নাম আব্দুল হারিস রাখলেন। আর হারিস হচ্ছে ইবলিসের নাম এর পূর্বেও ইবলিস তাদের দু'জনকে [আদম ও হাওয়া (আঃ)] দু'দুবার ধোকা দিয়েছিলেন। যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং

শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হল। আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল, তারা উভয়েই শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হল। বিবি হাওয়া আবারও গর্ভবতী হলেন শয়তান তাদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল, এর ফলে তাঁদের অন্তরে সন্তানের ভালবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিল। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিস' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ব নিয়ামতের মধ্যে তাঁর সাথে শরীক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে আয়াতের তাৎপর্য। *(ইবনে আবি হাতেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটি যঈফ। দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর, ২/২৭৪; আলবানী, সিলসিলা যঈফা, হাদীস নং ৩৪২)*

কাতাদাহ থেকে সহীহ্ সনদে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।

মুজাহিদ থেকে সহীহ্ সনদে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, আল্লাহ্র বাণী,

﴿جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا﴾

আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন, 'সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আশংকা তাঁরা [পিতা-মাতা] করেছিলেন।

[এ ছাড়া ইবনে আবি হাতেম এর অর্থ উল্লেখ করেছেন হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকে।]

সালাফে সালেহীনদের নিকটও স্বীকৃত। তারা উভয়ই ইবলিসকে যে শরীক করেছিলেন তা মূলত ইবাদত নয় বরং অনুকরণে যেটা সগীরা গুনাহ্ এবং নবীদের দ্বারা সগীরা গুনাহ্ প্রকাশ পেতে পারে। অতএব এ থেকে এটাও বুঝা গেল যে, প্রত্যেক পাপী শয়তানের অনুসরণ করে থাকে, আর বান্দার দ্বারা যে পাপ হয়ে থাকে তা অনুসরণমূলক শিরকের কারণে হয়ে থাকে। উক্ত ঘটনায় তাঁদের না মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ্র সাথে শির্ক করেছিলেন। আহলে ইলমদের নিকট এ কথা বিদীত যে, নবীদের দ্বারা ছোট্ট পাপ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয় তবে নিশ্চয়ই তারা উক্ত পাপে স্থায়ী থাকেন না; বরং তারা তা থেকে শিঘ্রই ফিরে যান ও আল্লাহ্র নিকট তওবা করেন এবং এ ধরণের পাপের কারণে তাঁদের আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় আরও বেশি হয়ে যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে, সে সব নাম রাখা হারাম।

২. সূরা আ'রাফের ১৯০নং আয়াতের তাফসীর।

৩. আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শির্‌ক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকীকত [অর্থাৎ শির্‌ক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্তান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নিয়ামতের বিষয়।

৫. আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে ও ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালাফে সালেহীন পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অধ্যায়-৫০

আল্লাহ্ তা'আলার আসমাউল হুসনা [সুন্দরতম নামসমূহ]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ (الأعراف: ١٨٠)

'আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে।*[1] তোমরা এসব নামে তাঁকে ডাক। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চল।' (সূরা আ'রাফ : ১৮০)

ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবি হাতিম আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ 'তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করে'-এর অর্থ হচ্ছে তারা শির্ক করে।

ইবনে আব্বাস আরও বর্ণনা করেন, মুশরিকরা 'ইলাহ্' থেকে 'লাত' আর আযীয থেকে 'উয্যা' নামকরণ করেছে।

আ'মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু [শিরকি বিষয়] ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

---

* আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তার জন্য যা ঘোষণা করেছেন তাই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা, অথবা তাঁর রাসূল তার (আল্লাহ্র) জন্য যেসব সুন্দর সুন্দর নামের ঘোষণা দিয়েছেন সেগুলো স্বীকার করে নেয়া। সাথে সাথে এসব সুন্দর নামের মধ্যে যে সুমহান অর্থ ও পরিচয় নিহিত আছে তা অনুধাবন করা এবং এসব নামের দ্বারা আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তার কাছে দু'আ করা। উক্ত আয়াতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হল, আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহে ইলহাদকারীদের থেকে দূরে থাকা।

[1] আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বিকৃতি বা নামগুলোকে স্বীয় উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে ভিন্ন অর্থ প্রবাহিত করাকে আল্লাহ্র নামের এ গুণের ইলহাদ বলা হয়। আল্লাহ্র নামের ইলহাদ-এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যেমন মানুষ আল্লাহ্র নামে উপাস্যদের নাম রাখে। যেমন- তারা নাম রেখেছিল ইলাহ্ শব্দ থেকে লাত আযীয শব্দ থেকে উয্যা ইত্যাদি। আল্লাহ্র নামে ইলহাদের অংশ খ্রিস্টানদের ন্যায় আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা ও গুণাবলী বা এর কিছু অংশ অস্বীকার করা। যেমন- জাহমিয়ারা করে থাকে, তারা আল্লাহ্র কোন নাম ও গুণেই বিশ্বাস করে না, শুধু আল্লাহ্র উপস্থিতি বিশ্বাস করে। ইলাহদের অংশ হচ্ছে, আল্লাহ্র নামের ও গুণের বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে এমন অর্থ প্রকাশ করা যা বৈধ নায়। পক্ষান্তরে সালাফে সালেহীন সুমহান উত্তরসূরীদের আকীদা হল, আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান রাখতে হবে এবং সেগুলোর অপব্যাখ্যা ও রূপক অর্থ করা জায়েয নয়। যেমন- মু'তাযিলা, আশায়ারিয়া, মাতুরিদিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মোটকথা হচ্ছে ইলহান কুফুরী এবং তার কিছুটা হচ্ছে বিদ'আত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্‌র নামসমূহের যথাযথ স্বীকৃতি।
২. আল্লাহ্‌র নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।
৩. সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ।
৪. যেসব মূর্খ ও বেঈমান লোকেরা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।
৫. আল্লাহ্‌র নামসমূহে বিকৃত করার ব্যাখ্যা।
৬. আল্লাহ্‌র নামে বিকৃত ঘটানোর বিরুদ্ধে ভীতিপ্রদর্শন।

অধ্যায়-৫১

'আসসালামু আলাল্লাহি' [আল্লাহ্‌র উপর শান্তি বর্ষিত হোক]* বলা যাবে না।

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সলাতরত ছিলাম। তখন আমরা বললাম,

السَّلاَمُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ

'আল্লাহ্‌র উপর তাঁর বান্দাহ্‌দের পক্ষ থেকে শান্তি হোক, অমুক অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তখন রাসূল (ﷺ) বললেন,

لاَ تَقُولُوا : السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ (صحيح البخاري، الأذان، باب التشهد في الآخرة، ٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠، وصحيح مسلم الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ح : ٤٠٢)

'আল্লাহ্‌র উপর শান্তি হোক, এমন কথা তোমরা বলো না।[1] কেননা আল্লাহ্ নিজেই 'সালাম' (শান্তি)।' *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩১, ৭৩৫, ১২০২, ৬২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২)*

---

* 'আল্লাহ্‌র উপর শান্তি বর্ষিত হোক' এ জাতীয় কথা বললে তাওহীদে ঘাটতি দেখা দেবে, কেননা, আল্লাহ্ কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ এক মহান সত্তা কিন্তু সকল বান্দাই তাঁর মুখাপেক্ষী। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ অর্থঃ 'হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।' (সূরা ফাতিরঃ ১৫)

[1] সাহাবায়ে কিরাম উক্তভাবে আল্লাহ্‌র শানে সালাম অভিবাদন হিসেবে বলে ছিলেন। আর সালাম এ শরীয়তে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি সালাম প্রদানের অর্থ হল, তাঁরা যেন বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম বর্ষিত হোক, এর অর্থ যদিও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সঠিক কিন্তু শব্দগতভাবে তা সঠিক নয়। কেননা, এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি সালামের অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক, আর এ কথা নিঃসন্দেহে বাতিল-ভ্রান্ত ও আল্লাহ্‌র সাথে বেআদবী ও জঘণ্য আচরণ এবং তাওহীদ পরিপন্থী। এজন্যেই নবী (ﷺ) এ ধরণের বাক্য প্রয়োগ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং এ নিষেধ হারাম সূচক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. 'সালাম' এর ব্যাখ্যা
২. 'সালাম' হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।
৩. এ [সালাম] সম্ভাষণ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।
৪. আল্লাহ্‌র ব্যাপারে 'সালাম' প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।
৫. বান্দাহ্‌গণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহ্‌র জন্য সমীচিন ও শোভনীয় নয়।

অধ্যায়-৫২

'হে আল্লাহ্ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ কর।'* প্রসঙ্গে

সহীহ্ হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ (صحيح البخاري، الدعوات، باب ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ح : ٦٣٣٩، ٧٤٦٤ وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح:٢٦٧٩)

'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এ কথা না বলে, 'হে আল্লাহ্, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, 'হে আল্লাহ্, তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা কর।' বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা, আল্লাহর উপর জবরদস্তি করার মত কেউ নেই।'[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৩৯, ৭৪৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৯)*

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ (صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح:٢٦٧٩)

'আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিত। কেননা, বান্দাহকে আল্লাহ্ যা-ই দান করেন না কেন, তার কোনটাই তাঁর কাছে বড় কিংবা কঠিন কিছুই নয়।'[2] *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৯)*

---

* হে আল্লাহ্ তুমি চাইলে আমাকে মাফ কর'- এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত প্রকার বাক্য প্রয়োগকারীর আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা পাবার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই এবং তার মধ্যে বিনীত কোন ভাবও নেই। এটা অহংকারীদের এবং বিমুখতা অবলম্বনকারীদের কাজ। বান্দা তার রবের কাছে মনযোগ ও দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে এবং সে অত্যন্ত বিনীতভাবে তার প্রয়োজন ও ক্ষুধার্তভাব প্রকাশ করবে এবং তাঁর অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও ক্ষমার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হবে।

[1] দৃঢ়প্রত্যয়ই মুখাপেক্ষা ও বিনীতভাবে আল্লাহ্র কাছে চাইবে, অহংকারী ও মুখাপেক্ষীহীনের মত নয়। নবী (ﷺ)-এর বাণী, فإن الله لا مكره له অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীনতা, পরিপূর্ণ মর্যাদাবান ও পরাক্রমশীল হওয়ার জন্য এমন কেউ নেই যে, তাঁকে কেউ বাধ্য করবে। আর এ হল, তাঁর নাম ও গুনাবলীর প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত।

[2] নবী (ﷺ)-এর বাণী, 'ইন্শাআল্লাহ্ আরোগ্য লাভ করবে।' (রোগীদের সামনে) মূলত দু'আ নয়। বরং এটা খবর দেয়ার প্রসঙ্গ অর্থাৎ ইন্শাআল্লাহ্ আরোগ্য লাভ হবে। সুতরাং পূর্বের বিধান থেকে এটি আলাদা হওয়া সুস্পষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. দু'আয় কোন শর্ত নিষিদ্ধ।
২. কোন্ শর্ত করা নিষিদ্ধ তার কারণ বর্ণনা করা।
৩. প্রার্থনা করার বিষয় সংকল্প রাখা
৪. প্রার্থনা করার সময় উৎসাহ থাকা। [অর্থাৎ পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।]
৫. দু'আয় উৎসাহ দেখানোর কারণ ব্যাখ্যা।

অধ্যায়-৫৩

আমার দাস-দাসী বলা যাবে না*

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي مَوْلاَيَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي (صحيح البخاري، العتق، باب كراهية التطاول علي الرقيق، ح:٢٥٥٢ وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب والسيد، ح:٢٢٤٩)

'তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'তোমার রবকে খাইয়ে দাও, তোমার রবকে অযূ করাও।'[1] বরং সে যেন বলে, 'আমার নেতা, আমার মনিব।' তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'আমার দাস, আমার দাসী।' বরং সে যেন বলে, 'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার চাকর।' *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪৯)*

---

* 'আমার দাস-দাসী' বলা যাবে না। কেননা, দাসত্ব তো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। 'যদি কেউ বলে এটা আমার দাস বা দাসী তখন সে দাসত্বের সম্পর্ক নিজের দিকে করল যা আল্লাহ্‌র সাথে আদরের সম্পূর্ণ বরখেলাপ এবং আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতের বড়ত্বের পরিপন্থী, আর মাখলুকের উবূদিয়াত-দাসত্ব যে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য তার বিনাশ সাধন করে। এজন্য অধিকাংশ উলামার নিকট এ শব্দ প্রয়োগ করা নাজায়েয তবে কতিপয় তা মাকরূহ বলেছেন।

[1] রব না বলা প্রসঙ্গে 'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, এ নিষেধাজ্ঞা কি ধরণের কেউ বলেছেন এটা হারাম, আবার কেউ বলেছেন এটা মাকরূহ কেনান, এটা শুধু আদবের কারণে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে যে এটা হারাম। কিন্তু রব এর সম্বোধন এমন বস্তুর দিকে কার যার উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ নেই। যেমন- (رب الدار) অর্থাৎ গৃহের বর বা মালিক সাইয়্যেদ যদিও আল্লাহ্ নিজেই কিন্তু সম্বোধনের সাথে অর্থাৎ আমার সাইয়্যেদ ইত্যাদিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কেননা, এক্ষেত্রে উবুদিয়াত-দাসত্বের ধারণা আসা অসম্ভব কিন্তু আনুপাতিক হারে বান্দার জন্য ও সিয়াদত বা নেতৃত্ব মানা যায়। পক্ষান্তরে সমগ্র মাখলুকের উপর আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব প্রমাণিত।

হে আমার মাওলা প্রসঙ্গ: মাওলা শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে তবে সাইয়্যেদ ও মাওলা শব্দ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েয, কেননা, এখানে আনুপাতিক হারে অর্থ দাঁড়াবে। অর্থাৎ মাখলুকের জন্য এর ব্যবহার নিতান্তই সীমিত ও তার অবস্থান ও মর্যাদা সাপেক্ষে অনুরূপ আল্লাহ্‌র জন্য এর অর্থ হবে তাঁর মহত্ব, অসীমত্ব ও মর্যাদা সাপেক্ষ।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আমার দাস-দাসী বলা নিষিদ্ধ।
২. কোন গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, 'আমার রব [প্রভু]'। এ কথাও যেন না বলে, 'তোমার রব্বকে আহার করাও'।
৩. প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হল, 'আমার ছেলে', 'আমার মেয়ে', 'আমার চাকর' বলতে হবে।
৪. দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হল, 'আমার নেতা', 'আমার মনিব' বলতে হবে।
৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে, শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

অধ্যায়-৫৪

আল্লাহ্'র ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ (سنن أبي داود، الزكاة، باب عطية من سأل بالله، ح :١٦٧٢ وسنن النسائي، الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل، ح :٢٥٦٨)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে চায়, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও।[1] যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দু'আ কর, যার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।' *(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৭২; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২৫৬৮)*

---

* আল্লাহ্র ওয়াস্তে প্রার্থনা করা হলে আল্লাহ্র প্রতি সম্মান রক্ষার্থে প্রার্থনাকারীকে বিমুখ করা বৈধ হবে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি.) সহ অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেণ যখন আল্লাহ্র ওয়াস্তে নির্দিষ্ট কারও নিকট নির্দিষ্ট কিছু চাইবে আর সে তা প্রদান করতে সামর্থ রাখে তখন বিমুখ করা হারাম হবে। আর যখন আল্লাহ্র ওয়াস্তে অনির্দিষ্ট কারও নিকট কিছু চাইবে তখন তাকে দেয়া উত্তম হবে এবং যদি জানা যায় যে উক্ত প্রার্থনাকারী মিথ্যাবাদী কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াস্তে চাই তবে তাকে দেয়া জায়েয।

[1] আল্লাহ্র ওয়াস্তে চাওয়া সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উসীলা। কেউ ডাকলে সাড়া দিতে হবে এটা বিশেষ করে ওলীমার দাওয়াতের ক্ষেত্রে। প্রতিটি দাওয়াতে নয়। তবে সকল দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারলে তা উত্তম হবে। উল্লেখিত হাদীসে এ শিক্ষাও বিদ্যমান যে, কেউ যদি কারো প্রতি সদ্ব্যবহার করে তবে তার প্রতিদানে অপারগতা প্রকাশ না করে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তারপরেও যদি প্রতিদান দেয়া সম্ভব না হয় তবে তার জন্য কমপক্ষে এমন দু'আ করবে যাতে বুঝা যায় যে, সে তার প্রতিদান দিল। অবশ্য এ স্থান অর্জন করতে একমাত্র প্রকৃত পরহেযগার তাওহীদপন্থী ব্যক্তিরাই পারবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান।

২. আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩. [নেক কাজের] আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৪. ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫. ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দু'আ করা।

৬. এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দু'আ করা, যাতে মনে হয় যে, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রাসূল (ﷺ)-এর বাণী حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

অধ্যায়-৫৫

'বি ওয়াজহিল্লাহ্' [আল্লাহর চেহারার ওয়াসীলা] বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না।*

জাবের (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ (سنن أبي داود، الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه عزوجل، ح:١٦٧١)

'বিওয়াজহিল্লাহ্ [আল্লাহ্র চেহারার ওসীলা] দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।'[1] *(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৭১। তবে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। দেখুন, যঈফুল জামে', আলবানী, হাদীস নং ৬৩৫১, ফায়জুল কাদীর, ইবনুল কাত্তান, ২/২২০)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত 'বিওয়াজহিল্লাহ্' দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২. আল্লাহ্র 'চেহারা' নামক সিফাত বা গুণের স্বীকৃতি।

---

* আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আল্লাহ্র চেহারার উসীলায় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া বৈধ হবে না।

[1] চেহারা আল্লাহ্র সত্তাগত গুণাবলীর একটি। যা তাঁর উপযোগী পর্যায়েই সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। কিন্তু তার কাইফিয়াত বা রকম সম্পর্কে শুধু আল্লাহ্ই জানেন তবে তার প্রতি আমরা বিশ্বাস করব কোন প্রকার উদাহরণ ছাড়াই এবং তা অকেজো ধারণা না করা। কেননা আল্লাহ্ বলেন- ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ অর্থাৎ 'তার সাদৃশ্য কেউ নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' আল্লাহ্র নামে বা তার গুণাবলী দ্বারা সামান্যতম ও নিকৃষ্টতম কোন জিনিস চাওয়া বৈধ হবে না। বরং বড় বড় বিষয় যেমন জান্নাত চাওয়া সমীচীন হবে। এ অধ্যায়ে যেন আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর মহত্বের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫৬

বাক্যের মধ্যে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করা*

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا﴾ (آل عمران: ١٥٤)

'তারা বলে, এ ব্যাপারে 'যদি' আমাদের করণীয় কিছু থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' [1] (সূরা আল-ইমরান : ১৫৪)

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ (آل عمران: ١٦٨)

অর্থ: 'যারা ঘরে বসে থেকে [যুদ্ধে না গিয়ে তাদের [যোদ্ধা] ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলত। তবে তারা নিহত হতো না। (সূরা আল-ইমরান : ১৬৮)

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (صحيح مسلم، القدر، باب الإيمان بالقدر والعذعان له ح :٢٦٦٤ ومسند أحمد : ٣٦٦/٢، ٣٧٠)

"যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ কর না। যদি তোমার

---

* গ্রন্থকার (রাহি.) এ অধ্যায় রচনা করেছেন। কেননা, অনেকেই তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে। তাকদীরের উপর আক্ষেপ করে বলে যে, আফসোস যদি এমন করতাম তবে এমন হত না। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ই তো সমস্ত কৃতকর্ম ও তার ফলাফল নির্ধারক। অতএব, সবকিছু তাঁরই ফয়সালাতে ঘটে থাকে।

[1] তারা (মুনাফিকগণ) বলে, যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন কথা রাখা হত তবে আমরা এখানে নিহত হতাম না। 'যদি' শব্দটি যখন অতীতের জন্য ব্যবহার করা হবে তখন তা না জায়েয ও হারাম হবে। কেননা, তা প্রমাণ করে যে, 'যদি' শব্দটি বাক্যে প্রয়োগ করা হর মুনাফিকদের আলামত, তাই ব্যবহার করা হারাম। 'যদি'র ব্যবহার অন্তরকে দুর্বল ও অপারগ করে দেয়; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য 'যদি' ব্যবহার আল্লাহ্র রহমত ও কল্যাণের প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হলে তখন তা বৈধ হবে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতের ক্ষেত্রেই অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয় তবেও নাজায়েয। কেননা, এতে তাকদীরের প্রতি স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পায়।

উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো।' বরং তুমি এ কথা বলো, 'আল্লাহ্ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা, 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪; মুসনাদ আহমাদ, ২/৩৬৬, ৩৭০)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা আল-ইমরানের ১৫৪নং আয়াত এবং ১৬৮নং আয়াতের উল্লেখিত অংশের তাফসীর।
২. কোন বিপদাপদ হলে 'যদি' প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।
৩. শয়তানের [কুমন্ত্রণামূলক] কাজের ক্ষেত্র তৈরিকরণ।
৪. উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।
৫. উপকারী ও কল্যাণমূলক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য কামনা করা।
৬. এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা।

অধ্যায়-৫৭

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ*

উবাই ইবনে কা'ব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا:

'তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ কর তখন তোমরা বল,

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ (جامع الترمذي، الفتن، باب جاء في النهي عن سب الرياح، ح:٢٢٥٢)

'হে আল্লাহ্ এ বাতাসের মধ্যে যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এ বাতাসের মধ্যে যা অনিষ্টকর, তাতে যে অকল্যাণ লুক্কায়িত আছে এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে অদিষ্ট হয়েছে, তা [অমঙ্গল ও অনিষ্টতা] থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'[2]

(জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২২৫২। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।
২. মানুষ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করবে।
৩. বাতাস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট, এ কথার দিক নির্দেশনা।
৪. বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

---

* বাতাসকে গালি দেয়া 'যুগকে' গালি দেয়ার মত। বাতাসকে গালি দেয়া হারাম। কেননা, যেভাবে ইচ্ছা বাতাস নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন স্বয়ং আল্লাহ্, তাই বাতাসকে গালি দাতার গালি প্রকৃতপক্ষে বাতাসের নিয়ন্ত্রকের উপরই বর্তায়। ফলে বাতাসকে গালি দেয়া হারাম। তবে তার ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রবাহের গতি এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

[1] لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, বাতাসের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্রই এবং তাঁরই আদেশের অধীন। এ জন্যে নবী (ﷺ) অপছন্দমূলক বাতাস প্রবাহের প্রাক্কালে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়ার নির্দেশ দেন।

অধ্যায়-৫৮

আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা সম্পর্কে খারাপ ধারণার নিষিদ্ধতা।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (آل عمران: ١٥٤)

'তারা জাহেলি যুগের ধারণার মতো আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, 'আমাদের জন্য কি কিছু করণীয় আছে? [হে রাসূল] আপনি বলে দিন, 'সব বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভূক্ত।'* (সূরা আলি-ইমরান: ১৫৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ﴾ (الفتح: ٦)

'তারা [মুনাফিকরা] আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে,[1] তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত।' (আল-ফাতাহ: ৬)

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.) বলেছেন, ظن -এর ব্যাখ্যা হল, মুনাফিকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, নবী ﷺ-

---

* আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাত ও তাঁর নাম ও গুণাবলীর পূর্ণতার চাহিদা হচ্ছে, তিনি উচ্চতর হিকমত সম্মত কারণ ছাড়া কোন কার্য সম্পাদন করেন না। আর হিকমত হল, উত্তম উদ্দেশ্য সাপেক্ষ কার্যাবলীকে তার যথাস্থানে রাখা। ফলে তাঁর কামালিয়াতের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর ব্যাপারে হক কথা বলা ও সঠিক ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব। অনুরূপ তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাত, রহমত ও ইনসাফের দাবী হল জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় তার ব্যাপারে কোনরূপ খারাপ ও অসম্পূর্ণতার ধারণা না করা যা তাওহীদের মূলনীতির পরিপন্থী বা তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। তারা ধারণা করত যে, আল্লাহ্র কার্যসমূহ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ফলে তারা শিরকে জড়িয়ে পড়ত। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তাঁদের এ কথায় হিকমাত এবং তাকদীরকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

[1] 'তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ্র সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবার্তে নিপতিত'। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.) উল্লেখ করেছেন যে, সালফে সালেহীন এ খারাপ ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা তিন রকম ধারণা করত: **প্রথমটি** তাকদীর তথা ভাগ্যকে অস্বীকার করত, **দ্বিতীয়টি** প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্র হিকমত নিহিত আছে তা অস্বীকার করত, **তৃতীয়টি** আল্লাহ্ যে তাঁর রাসূলকে তাঁর দ্বীনকে এবং তাঁর নেক বান্দাদের সাহায্য করেন তা অস্বীকার করত।

এর উপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহ্‌র ফায়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র হিকমত, তাকদীর, রাসূল ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের উপর আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা 'সূরা ফাত্‌হ'-এ উল্লেখিত মুনাফিক ও মুশরিকরা পোষণ করত। এ ধারণা খারাপ হওয়ার কারণ এটাই যে, আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদার জন্য ইহা শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমূলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাতিলকে হক্বের উপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক্ব অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ফায়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহ্‌র এক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবীদার- এ কথা অস্বীকার করে, সাথে সাথে এ দাবীও করে যে, এসব আল্লাহ্ তা'আলার নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র; তার এ ধারণা কাফিরদের ধারণার সমতুল্য বৈ কিছু নয়। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি এ সব কাফিরদের জন্যই অবধারিত রয়েছে।

অধিকাংশ লোকই নিজেদের (সাথে সংশ্লিষ্ট) বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্‌র প্রতি এ জাতীয় খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।[1]

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান এবং নিজের জন্য কল্যাণকামী, তার উচিত এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তার উচিত নিজ ভ্রান্ত ধারণার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা।

---

[1] আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা থেকে শুধুমাত্র তারাই পরিত্রাণ পায় যারা আল্লাহ্ ও তার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে এবং তাঁর হিকমাত ও হাম্‌দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। যারা আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ জ্ঞান লাভ করেছে, আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে তারা তাদের আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, অনেককে দেখা যায় বাহ্যিকভাবে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে মুক্ত, কিন্তু মনের দিক থেকে তারা পরিস্কার হতে পারেনি। ফলে তাদের আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা জরুরী। এমনকি সে যদি বড় ধরণের বিপদেও আক্রান্ত হয় তবুও ধারণা করতে হবে যে আল্লাহ্ হক্ব এবং তাঁর সমস্ত কার্যাবলী হক্ব।

আল্লাহ্‌র প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা কর, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধিতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে কেউ বেশি, কেউ কম বলে থাকে। তুমি তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ, তুমি কি খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত? কবির ভাষায়-

মুক্ত যদি থাক তুমি এ খারাবি থেকে,
বেঁচে গেলে তুমি এ মহাবিপদ থেকে,
আর যদি নাহি পার ত্যাগিতে এ রীতি,
বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি ॥

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. সূরা আল-ইমরানের ১৫৪নং আয়াতের তাফসীর।
২. সূরা ফাত্‌হ-এর ৬নং আয়াতের তাফসীর।
৩. আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।
৪. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আস্‌মা ও সিফাত [নাম ও গুণাবলী] এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

অধ্যায়-৫৯
তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিচিতি*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) বলেছেন,

والذى نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه، حتى يؤمن بالقدر.

'সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে ইবনে উমারের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারকারীদের) কারও কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে।'[1] অতঃপর তিনি রাসূল (ﷺ)-এর বাণী দ্বারা তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেন,

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان :٨)

'ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর সকল ফেরেশ্‌তা, তাঁর যাবতীয় [আসমানী] কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল (ﷺ) এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখবে। সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮)*

---

* তাকাদীর তথা ভাগ্যের প্রতি ঈমান বলতে বুঝায় যে, প্রত্যেক বিষয়েই আল্লাহ্‌র পূর্ব হতেই জ্ঞান আছে বিশ্বাস করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে তার সবকিছুই তিনি লাওহে মাহ্‌ফুজ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তা বিশ্বাস করা। এ কথা বিশ্বাস করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন এবং তিনি বান্দার সমস্ত কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ্ বলেন, 'আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা' আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাদের কর্মের স্রষ্টা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাকে মু'মিন বলা হবে না, কেননা এক্ষেত্রে অনেক অনেক দলীল রয়েছে। তাকদীরকে অস্বীকার করা কখনও ইসলাম থেকে বহিস্কারের কারণ হয়। যেমন কেউ যদি আল্লাহ্‌র পূর্ব হতে জ্ঞান রাখেন অস্বীকার করে অথবা আল্লাহ্‌র লাওহে মাহ্‌ফুজে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন তা অস্বীকার করে। তাকদীরকে অস্বীকার করা কখনও বিদ'আতের পর্যায় যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী: যেমন- আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা তার সৃষ্টির ব্যাপারে যে ব্যাপকতা কেউ যদি অস্বীকার করে।

[1] ইবনে উমার (رضي الله عنه) এভাবে বলার কারণ হল, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু মুসলমানের নিকট থেকেই সৎ আমলসমূহ কবূল করেন। যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখে না। সে বরং অস্বীকার করে সে নিশ্চয়ই মুসলমান নয়। যদিও সে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। তিনি তাঁর কথার সমর্থনে নবী (ﷺ)-এর উক্ত হাদীস পেশ করেন। তাকদীরের ভাল-মন্দ বলতে বান্দার স্বার্থে ভাল-মন্দের কথা বলা হয়েছে। যদিও আল্লাহ্‌র কর্ম সবই ভাল এবং হিকমতের অন্তর্গত ও অনুযায়ী।

উবাদা বিন সামিত (রাঃ) বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, 'হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোন দিন জীবনে ঘটার ছিল না।' রাসূল (ﷺ)-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ؟ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

'সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, 'লিখ'।[1] কলম বলল, 'হে আমার রব্ব, আমি কী লিখব?' তিনি বললেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ কর।"

হে বৎস রাসূল (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি,

مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي (سنن أبي داود، السنة، باب القدر، ح:٤٧٠٠)

"যে ব্যক্তি [তাকদীরের উপর] বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যুবরণ করল, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' *(সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৭০০)*

ইমাম আহমদের অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ، فَجَرَى فِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (مسند أحمد : ٥/٣١٨)

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। এরপরই তিনি কলমকে লক্ষ্য করে বললেন, লিখ।' কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সে মুহূর্ত থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল। *(মুসনাদ আহমাদ, ৫/৩১৮)*

ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

---

[1] তাকদীরের ব্যাপারে উবাদাহ বিন সামেতের হাদীসের মর্ম হল- তাকদীরের সব কিছু লিখা হয়ে গেছে। তাকদীরের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য হল, মানুষ কার্যাবলী সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বাধ্য নয় বরং তার স্বাধীনতা রয়েছে, সে তার ইচ্ছামত ভাল বা মন্দ কাজ করতে পারে। এ জন্যাই তাকে নেকী করার আদেশ ও গুনাহ থেকে বাঁচার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি বাধ্যই হতো তবে তাকে নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। 'আল্লাহ্ তাকে (কলমকে) বললেন লেখ।' অত্র হাদীস দ্বারা লেখার গুরুত্ব প্রমাণিত হয় এবং 'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে কলম। গবেষক উলামাদের এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হচ্ছে যে, আল্লাহ্ যখন কলম সৃষ্টি করলেন তখন তাকে এ কথা বললেন এমন নয় যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম কলমই সৃষ্টি করেছেন। কেননা তার প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আরশ।

فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ (أخرجه ابن وهب في القدر رقم (٢٦) وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ح:١١١)

'যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।' *(ইবনে ওয়াহব এর আল-কাদর : ২৬ ; ইবনে আবী আসেম এর কিতাবুস সুন্নাহ : হাদীস নং ১১১)*

ইবনু দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, কাতাদাহ (রাহি.) বলেন, 'আমি ইবনে কা'ব-এর কাছে গেলাম। তারপর তাকে বললাম, 'তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। এর ফলে হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তর থেকে উক্ত জমাটবাঁধা কাদা [কথা] দূর করে দেবেন। তখন তিনি বললেন,

لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارَ (سنن أبي داود السنة، باب في القدر، ح:٤٦٩٩ ومسند أحمد : ١٨٥/٥، ١٨٩)

'তুমি যদি উহুদ [পাহাড়] পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্র রাস্তায় দান কর, আল্লাহ্ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর এ কথা জেনে রাখ, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটতে কখনো ব্যতিক্রম হত না। আর তোমার জীবনে যা ঘটার ছিল না, তা কখনো ঘটত না। তাকদীর সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করলে, তুমি অবশ্যই জাহান্নামী হবে।' তিনি বললেন, অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল ﷺ থেকে এ জাতীয় হাদীস-এর কথাই উল্লেখ করলেন। *(সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৬৯৯; মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৮৫, ১৮৯)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরয, এর বর্ণনা।
২. তাকদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে, এর বর্ণনা।
৩. তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই, তার আমল বাতিল।
৪. যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে না সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।
৫. সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।
৬. কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সৃষ্টির পরক্ষণেই কলম দ্বারা তা উক্ত সময়ে তা লিখা হয়ে গেছে।
৭. যে ব্যক্তি তাকদীর বিশ্বাস করে না, তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ দায়িত্ব মুক্ত।
৮. সালফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া।
৯. উলামায়ে কিরাম এমনভাবে প্রশ্নকারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যেত। জবাবের নিয়ম হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পৃক্ত করতেন।

অধ্যায়-৬০

ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম*

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً (صحيح البخاري، اللباس، باب نقض الصور، ح:٥٩٥٣، ٧٥٥٩ وصحيح مسلم،اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، ح:٢١١١)

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অণু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবের দানা তৈরি করুক।'[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৩, ৭৫৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১১)*

আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (صحيح البخاري، اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، ح:٥٩٥٤ وصحيح مسلم، اللباس، تحريم تصوير صورة الحيوان.....، ح:٢١٠٧)

'কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মত ছবি বা চিত্র অংকন করে।'[2] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৭)*

---

* ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাত দ্বারা কোন জিনিসের নির্ধারিত আকৃতি ও পদ্ধতিতে তৈরিকারীকে চিত্র শিল্পী বলে। ছবি অঙ্কন মূলত দু'কারণে হারাম। প্রথমটি হচ্ছে প্রাণীর ছবি অঙ্কন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে সৃষ্টি বিষয়ে সাদৃশ্য বা প্রতিযোগিতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে শিরকের পথ খুলে যায়। কেননা পৌত্তলিকদের মূর্তি পূজার সূচনা ছবি অঙ্কনের মাধ্যমেই হয়েছিল বলে প্রমাণিত। এজন্যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দাবীই হল, চিত্র-ছবি যেন প্রসার ঘটতে না পারে।

[1] 'তারা একটা অণু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক', এ কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সকল চিত্র শিল্পীদের চ্যালেঞ্জ করেছেন। চিত্র অংকনকারীরা তাদের ধারণায় আল্লাহ্রই সৃষ্টির মত সৃষ্টি করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সৃষ্টির মত কেউ সৃষ্টি করতে পারবে না। অতএব, এ জন্যই চিত্রকররা নিজেদের কাজকে আল্লাহ্রই অনুরূপ ধারণা করাতে তারা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে বড় জালেমে পরিণত।

[2] চিত্রাংকন সাদৃশ্য জ্ঞাপন দুই কারণে মহা কুফুরী হয়ে থাকে। প্রথমত: কোন চিত্র শিল্পীদের যদি জানা থাকে যে, তার ছবির পূজা করা হবে তবে উক্ত চিত্র শিল্পী কাফির বলে গণ্য হবে। **দ্বিতীয়ত:** চিত্রকর কোন চিত্র তৈরি করে এ ধারণা রাখে যে, তার বানান চিত্র আল্লাহ্র বানান জিনিস থেকেও উত্তম। উক্ত দু'প্রকার ব্যতীত অন্যভাবে যেমন- হাত দ্বারা অংকন বা খোদাই করে চিত্র বানান কুফুরী নয়, যার ফলে মানুষ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ (صحيح البخاري، البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ...، ح:٢٢٢٥، ٥٩٦٣، ٧٠٤٢ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان....، ح: ٢١١٠)

'প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি [প্রাণীর] চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।"[1] *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১০)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

(صحيح البخاري، اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة...، ح:٥٩٦٣ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان.....، ح:٢١١٠)

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন [প্রাণীর] চিত্র অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে পারবে না।'[2] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১০)*

আবুল হাইয়াজ আসাদী (রাহি.) বলেন, আলী (রাঃ) আমাকে বলেছেন,

أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ (صحيح مسلم، الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ح:٩٦٩)

'আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হল, 'তুমি কোন চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর কোন উঁচু কবরকে [মাটির] সমান না করে ছাড়বে না।'[3] *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৯)*

ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। তবে অবশ্যই কবীরা গুনাহ্ এদের প্রতি অভিশাপ ও জাহান্নামের হুঁশিয়ারী রয়েছে।

[1] 'কিয়ামতের দিন তাকে এ চিত্রে আত্মা দেবার জন্য বাধ্য করা হবে', তবে বুঝা যায় যে উল্লেখিত শাস্তি শুধুমাত্র কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কনের ব্যাপারেই।

[2] 'অথচ আত্মা দিতে সক্ষম হবেন না' কেননা, এটা তো শুধু আল্লাহ্‌রই ক্ষমতা রাখেন।

[3] এ হাদীসে চিত্র ও ছবি বানানো হারামের আরও একটি কারণ দর্শানো হয়েছে তা হল, এটি শিরকের মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত। আর এ হাদীসে রাসূল ﷺ উচ্চ কবর ও চিত্র-ছবিকে এক সাথে বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. চিত্রকরদের ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন।

২. কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী।

৩. সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা। তাই আল্লাহ্ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অণু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরি করে নিয়ে এসো।'

৪. চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫. চিত্রকর যতটা (প্রাণীর) ছবি আঁকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৬. অঙ্কিত ছবিতে রূহ্ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭. [প্রাণীর] ছবি পাওয়া মাত্রই ধ্বংস করার নির্দেশ।

যেমনভাবে উচ্চ কবর শিরকের মাধ্যম হয়ে থাকে অনুরূপ ছবি-চিত্র ও শিরকের মাধ্যম। এজন্যই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রতিমূর্তি ও উচ্চ কবর যেন না থাকে। উঁচু কবর অবশিষ্ট থাকা শিরকের একটি বিরাট মাধ্যম অনুরূপ চিত্র বা ছবি ও অবশিষ্ট থাকা শিরকের একটি বিরাট মাধ্যম।

অধ্যায়-৬১

অধিক কসম খাওয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة: ٨٩)

'তোমাদের শপথসমূহকে হেফাযত করো।' (সূরা মায়িদা : ৮৯)

আবূ হুরাইরা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি:

الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ (صحيح البخاري، البيوع، باب "يمحق الله الربوا ويربي الصدقات"، ح:٢٠٨٧ وصحيح مسلم، المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، ح:١٦٠٦)

'[অধিক] শপথ, সম্পদ বিনষ্টকারী এবং উপার্জন ধ্বংসকারী।'[1] *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৬)*

সালমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشْتَرِيْ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَبِيْعُ إِلاَّ بِيَمِيْنِهِ

(معجم الكبير للطبراني، رقم : ٦١١١)

'তিন প্রকার লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা [কিয়ামতের দিন] কথা বলবেন না, তাদেরকে [গুনাহ্ মাফের মাধ্যমে] পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ জিনাকারী, অহংকারী গরীব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে আল্লাহ[2] বানিয়েছে অর্থৎ কসম করা ব্যতীত সে পণ্য ক্রয়ও করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করে না। *(ত্বাবারানী, ৬১১১)*

---

* অধিক মাত্রায় কসম খাওয়া তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদকে পূর্ণ করতে পেরেছে সে কখনো কসম-শপথের সময় আল্লাহকে সামনে আনে না। যদিও কথায় কথায় অনর্থক কসম খাওয়াতে মাফ রয়েছে, তারপরেও তাওহীদপন্থীর জন্য বেশী বেশী কসম করা থেকে মুখ ও অন্তরকে মুক্ত রাখা মুস্তাহাব।

[1] 'উপার্জন ধ্বংসকারী এটিও একটি শাস্তি, কেননা সে কসম দ্বারা আল্লাহ্র বড়ত্ব বর্ণনার ইচ্ছা করে নি। বরং সম্পদ বিক্রয়ই তার উদ্দেশ্য।

[2] 'যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে আল্লাহ্ বানিয়েছে'; সে ব্যক্তি ঘৃণিত ও কবীরা গুণাহ্গার বলে গণ্য হবে।

ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِه قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ (صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي ﷺ....، ح: ٣٦٥٠ وصحيح مسلم، فضائل، باب فضل الصحابة ثم الذي يدنونهم، ح:٢٥٣٥)

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। ইমরান (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ﷺ) তাঁর পরে দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছি না। অতঃপর তিনি [রাসূল (ﷺ)] বলেন, 'তোমাদের পরে এমন এক কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দেবে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে।'

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ (صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب ﷺ ومن صحب النبي.....، ح:٣٦٥١ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ح:٢٥٣٣)

'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হল, এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হল যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক কওমের আগমন ঘটবে যাদের কারও সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।' [অর্থাৎ কসম ও সাক্ষ্যের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইব্রাহীম নাখয়ী বলেন, আমরা ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন।[1]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. কসম-শপথ রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।
২. মিথ্যা কসম বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষতি টেনে আনে, রোজগারের রবকত (বৃদ্ধি) নষ্ট করে।
৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করে না, তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।
৪. স্বল্প কারণেও গুনাহ্ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।
৫. বিনা প্রয়োজনে কসমকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।
৬. রাসূল ﷺ কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।
৭. সাক্ষ্য না চাইলেও যারা সাক্ষ্য প্রদান করবে এমন লোকের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।
৮. মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সালফে-সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

---

[1] 'আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি দিতেন'- এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের সালফে সালেহীন তাদের সন্তানদের আল্লাহ্র প্রতি সম্মান ও বড়ত্ব প্রদর্শনের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দিতেন।

অধ্যায়-৬২

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিষয়*

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (النحل: ٩١)

"তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।'[1] (সূরা নাহ্ল: ৯১)

বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ছোট হোক বা বড় হোক [কোন যুদ্ধে] যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাক্বওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকত তাদেরকে উত্তম উপদেশ দিতেন এবং বলতেন,

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا

---

* আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মাদারীর অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতিশ্রুতি দেয়া।

[1] 'আল্লাহ্র নামে তোমরা যখন কোন শক্ত ওয়াদা কর তখন তা পুরা কর'- এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, মানুষের মাঝে লেন-দেনের সময় আল্লাহ্র নামে যে কসম খাওয়া হয় তা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্র প্রতি বড়ত্ব ও সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক সে ওয়াদা বা চুক্তি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব এবং উক্ত প্রকার ওয়াদা পূর্ণ না করার অর্থ আল্লাহকে অবজ্ঞা ও হেয় করা।

فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ (صحيح مسلم، الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ح:١٧٣١)

'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তোমরা যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি কর না, বিশ্বাস ঘাতকতা কর না। তোমরা শত্রুর নাক-কান কেট না বা অঙ্গ বিকৃত কর না। তুমি যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। তিনটি বিষয় হচ্ছে, ১. ইসলামের দাওয়াত [তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করো।]; যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। ২. হিজরতের দাওয়াত [তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য অর্থাৎ হিজরত করার জন্য আহ্বান জানাও।] হিজরত করলে তাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মোহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুইনদের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম আহকাম [বিধি- নিষেধ] জারি হবে। তবে 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ ব্যতীত পাবে না। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, 'তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ কর, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ কর। কিন্তু যদি কর দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

কর। তুমি যদি কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ কর, আর দুর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মায় রেখে দাও।[1] তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মায় রেখ না বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মাদারী রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মাদারী রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ কর। আর তারা যদি আল্লাহ্র হুকুমের ব্যাপারে তোমার সম্মতি চায়, তবে তুমি আল্লাহ্র ফায়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি দিও না; বরং তোমার নিজের ফায়সালার ব্যাপারে সম্মতি দিও। কারণ, তুমি জান না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩১)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্র জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মু'মিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।
২. দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।
৩. আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করা।
৪. যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
৫. আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।
৬. আল্লাহ্র হুকুম এবং আলিমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।
৭. সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফায়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহ্র হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

---

[1] 'যে সব শত্রুদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জিম্মাদারীর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে সব অবস্থা থেকে দূরে থাকা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা।' কেননা, এসব অবস্থায় যখন প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্র সম্মানকে ক্ষুণ্ন করা হয়।' অত্র হাদীসে তাওহীদবাদী ও দ্বীনি ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যে তারা যেন এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকে যে, আল্লাহ্র বড়ত্ব প্রদর্শনে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। কেননা, আজকের এ সংশয় ও ফেত্নার যুগে সাধারণ মানুষ তোমার মত সুন্নাত ও তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখবে যে, আল্লাহ্র বড়ত্বের ব্যাপারে তুমি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল, ফলে তোমার দেখাদেখি তারাও আল্লাহ্র প্রতি বড়ত্ব ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শপথ করা, আল্লাহ্র জিম্মাদারীর প্রতিশ্রুতি অথবা সাক্ষ্য দেয়া বা সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা, এ সবের ক্ষেত্রে আলেম-উলামা ও দ্বীনদারদের জন্য সামান্য অসতর্কতার ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঘাটতি বা ক্ষতি দেখা দিতে পারে।

অধ্যায়-৬৩

আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম* করার পরিণতি

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ্ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. (صحيح مسلم، البر والوصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله، ح:٢٦٢١)

"এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করব না।'- এ কথা বলে দেয়ার স্পর্ধা কার আছে?[1] আমি তাকে ক্ষমাই করে দিলাম। আর তোমার [কসমকারীর] আমল বাতিল করে দিলাম।" *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২১)*

আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিল, সে ছিল একজন আবেদ।' আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) বলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁর একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

---

* আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম দু'প্রকার, প্রথমটি আল্লাহ্‌র উপর মাতব্বরী অহংকার ও হঠকারীতার বশীভূত হয়ে, যেন সে মনে করে যে, তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর হক বা বাধ্যবাদকতা রয়েছে এবং সে যেটাকে ভাল মনে করে আল্লাহ্ সেটাই ফায়সালা দিবেন। এটা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী এবং কখনও তাওহীদের মূলনীতিরও পরিপন্থী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করা বিনীতভাবে এবং তাঁর প্রতি ভীতি ও মুখাপেক্ষী হয়ে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ্‌র এমন অনেক বান্দা রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম খেয়ে ফেলেন আল্লাহ্ তাকে মুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের কসমকে পূর্ণ করে দেন) এটা মূলত আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভাল ধারণার ফলশ্রুতিতে এমন হয়ে থাকে।

[1] 'আমি অমুককে ক্ষমা করব না'- এ কথা বলে দেয়ার স্পর্ধা কার আছে?' এখানে অমুককে ক্ষমা করব না বলতে একজন পাপী বান্দার ব্যাপারে বলা হয়েছে যার ব্যাপারে জনৈক আবেদ আল্লাহ্‌র উপর মাতব্বরী করে ও দাম্ভিকতাবশত এ ধারণা করেছিল যে, সে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে এরূপ কামলিয়াত পৌছেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কৃত কর্মেও তার নিজস্ব কর্তৃত্ব চলতে পারে। তাই সে যা আকাঙ্খা করবে তাই মিলবে তা প্রত্যাখান হবে না। অথচ এ ধারণা সরাসরি আল্লাহ্‌র তাওহীদের পরিপন্থী, সুতরাং সে বলেছিল যে আল্লাহ্ তোমাকে কোনদিনও ক্ষমা করবেন না, ফলে আল্লাহ্ উক্ত পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছিলেন ও উক্ত আবেদ ব্যক্তির সমস্ত আমল বাতিল করে দিয়েছিলেন। অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও তাওহীদ পরিপন্থী কার্যকলাপ ভয়াবহ বিপজ্জনক।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন বিষয়ে অহংকারবশত মাতব্বরী করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। [অর্থাৎ মাতব্বরি না করা।]
২. আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।
৩. জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।
৪. এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করতে পারে।
৫. কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

অধ্যায়-৬৪

আল্লাহ্‌র মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির নিকট সুপারিশ কামনা হারাম*

জুবাইর বিন মুতয়িম (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর কাছে একজন আরব বেদুঈন এসে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ﷺ)! আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহ্‌র মাধ্যমে সুপারিশ করছি, আর আল্লাহ্‌র কাছে আপনার মাধ্যমে সুপারিশ করছি।' এ কথা শুনে নবী (ﷺ) বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ এভাবে তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন যে, তাঁর এবং সাহাবায়ে কিরামের চেহারায় রাগতভাব প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন:

وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ (سنن أبي داود، السنة، باب من الجهمية، ح:٤٧٢٦)

'তুমি ধ্বংস হও, আল্লাহ্‌র মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জান? তুমি যা মনে করছ আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহ্‌র মাধ্যমে সুপারিশ করা যায় না।'[1] *(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৬; এ হাদীসটি যঈফ। দেখুন তাখরীজ কিতাবুস সুন্নাহ, আলবানী, হাদীস নং ৫৭৫, ৫৭৬)*

---

* আল্লাহকে উসীলা-মাধ্যম বানানো তাঁর কোন সৃষ্টির নিকট জায়েয নয়, চরম বেয়াদবী ও তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

[1] কোন মাখলুকের কাছে আল্লাহকে উসীলা বানানো আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, কারণ, যাকে উসীলা বানানো হয় তার চেয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে সে ব্যক্তি সম্মানিত হয় যার নৈকট্য লাভের জন্য উসীলা বানানো হয়েছে অথচ আল্লাহ্‌র তুলনায় মাখলুক কতই না তুচ্ছ ও মর্যাদাহীন। এ জন্যই উক্ত বেদুঈনের কথা শুনে নবী (ﷺ) বার বার 'সুবানাল্লাহ্' বলেন এবং সাব্যস্ত করেন যে, এসব কুধারণা ও বিষয় থেকে আল্লাহ্ পূত পবিত্র ও মহান এবং তিনি সমস্ত অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. 'আপনার কাছে আল্লাহ্‌কে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করছি'- এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, রাসূল ﷺ কর্তৃক সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২. সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশের কথায় রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩. نتشفع بك على الله [আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি]- এ কথা রাসূল ﷺ প্রত্যাখ্যান করেন নি।

৪. 'সুবাহানাল্লাহ্'-এর তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন। আশ্চর্য ও প্রতিবাদের সময় এ বাক্য বলতে হয়।

৫. মুসলমানগণ নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন করতেন।

অধ্যায়-৬৫

রাসূল ﷺ কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

আব্দুল্লাহ্ বিন আশ্-শিখ্খির (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ (سنن أبي داود، الأدب باب في كراهية التمادح، ح: ٤٨٠٦ ومسند أحمد/٤/٢٥،٢٤)

'আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম "سيد" [আপনি আমাদের প্রতিপালক] তখন রাসূল ﷺ বলেলেন, "السيد" [আল্লাহ্ই হচ্ছেন প্রতিপালক]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।[1] এরপর তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করতে না পারে।'[2]

(সুনান-ই আবী দাউদ, ৪৮০৬; মুসনাদ আহমাদ, ৪/২৪, ২৫)

আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোক রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আমাদের প্রভু তনয়।'

---

[1] নবী ﷺ যদিও (বনী আদম সম্রাট) তথাপি তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের পথ প্রতিরোদের কারণে তাঁকে সাইয়্যিদ বলা থেকে নিষেধ করেছেন। উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে আস্-সাইয়্যিদ (অর্থাৎ আলিফ লামসহ) বলা মারাত্মক অপরাধ, কেননা, এতে ব্যাপকতার অর্থ বিদ্যমান আছে বলে দেখা যায় অনেক লোক কতিপয় ওলী যেমন সাইয়্যিদ বাদাভীকে আস্সাইয়্যিদ বলে আখ্যায়িত করে এবং তাঁর সম্মানে সীমালংঘন করে।

[2] কারো মুখোমুখি প্রশংসা ও গুণকীর্তন শয়তানী আচরণ এতে অনেক সময় মনের মাঝে অহংকার ও বড়ত্ব জন্ম নিতে পারে, যার ফলে তার জন্য আসবে লাঞ্ছনা, কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহকেই একমাত্র তাওফীক দাতা ও সকল শক্তির উৎস মনে করবে না, নিজের হঠকারীতার কারণে সে অবশ্যই অপমানিত হবে লাঞ্ছিত হবে। ফলে নবী ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, শয়তান যেন তোমাদের উপর বিজয়ী না হতে পারে।

তখন তিনি বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (عمل اليوم والليلة للنسائي، ح:٢٤٨، ومسند أحمد : ٣/١٥٣، ٢٤١، ٢٤٩)

'হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি 'মুহাম্মদ' আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ্ পাক আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্দ্ধে আমাকে স্থান দেবে, এটা আমি পছন্দ করি না।"[1] *(নাসাঈ, হাদীস নং ২৪৮; মুসনাদ আহমাদ, ৩/১৫৩, ২৪১, ২৪৯)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

২. কাউকে 'আপনি আমাদের প্রভু বা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিত, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩. লোকেরা রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, 'শয়তান যেন তোমাদের উপর শক্তিশালী না হয়।' অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধাবন করা।

৪. রাসূল ﷺ-এর বাণী- ما أحب أن ترفعوني فوق منـــزلتي অর্থাৎ তোমরা আমাকে আমার স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করি না। এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

---

[1] তারা নবী ﷺ-কে যে গুণে গুণান্বিত করেছিল প্রকৃত পক্ষে সে গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তিনি শিরকের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য উক্ত কথা বলেন, যাতে করে তার ফলে শির্ক স্থান না পায়। সুতরাং যখন কেউ কারও সম্মান ও বড়ত্ব প্রকাশ করবে তখন শয়তান তাদের উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের অন্তরকে এমন বানিয়ে দিবে যে সম্মান প্রদানকারী শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে যেভাবে তার সম্মান প্রদান বৈধ নয় সে সেভাবে তা প্রদান করবে। তাই কাউকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করলে পর্যায়ক্রমে সেটা শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। ফলে নবী ﷺ বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্দ্ধে আমাকে স্থান দাও, এটা আমি পছন্দ করি না।' এ অধ্যায়টি শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার যাবতীয় মাধ্যমকেও বন্ধ করে দেয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে বর্ণিত।

অধ্যায়-৬৬

আল্লাহ্ তা'আলার মহানত্ব এবং উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الزمر: ٦٨)

'তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (সূরা যুমার: ৬৭)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন ইহুদী পণ্ডিত রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমরা [তাওরাত কিতাবে] দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ পাক সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজীকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।' এ কথা শুনে রাসূল (ﷺ) ইহুদীয় পণ্ডিতের কথার সমর্থনে এমনভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াতটুকু পড়লেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (الزمر: ٦٨)

'তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করতে পারেনি। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (সূরা যুমার: ৬৭)

মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, 'পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে থাকবে, তারপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমিই রাজাধিরাজ, আমি আল্লাহ্।'

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে, 'সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইবনে উমার (রাঃ) মারফু হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন,

يَطْوِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمٰوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ (صحيح مسلم، صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار، ح:٢٧٨٨)

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সেগুলোকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, 'আমি হচ্ছি শাহানশাহ্ (মহারাজ)। অত্যাচার আর জালিমরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?' *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৮৮)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন,

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُوْنَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ إِلاَّ كَخَرْدَلَةٍ فِيْ يَدِ أَحَدِكُمْ (تفسير ابن جرير للطبري : ٣٢/٢٤)

'সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ্ পাকের হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারও হাতে একটা সরিষার দানার মত।' *(তাফসীর ইবনে জারীর ত্বাবারী, ২৪/৩২)*

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِيْ الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِيْ تُرْسٍ، قَالَ : وَقَالَ أَبُوْ ذَرٍّ (رضي الله عنه) : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : مَا الْكُرْسِيُّ فِيْ الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ. (تفسير ابن جرير للطبري، ح:٤٥٢٢ والأسماء والصفات للبيهقي، ح : ٥١٠)

'কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্য নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের [মুদ্রার] মতো।' তিনি বলেন, আবু যর (رضي الله عنه) বলেছেন, 'আমি রাসূল (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূ-পৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো।' *(তাফসীরে ত্বাবারী, হাদীস নং ৪৫২২; বায়হাক্বী, হাদীস নং ৫১০)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِيْ تَلِيْهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ (أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، ح:٢٦ وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ح:٥٩٤، والطبراني في المعجم الكبير، ح : ٨٩٩٧)

'দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। এমনিভাবে সপ্তম আকাশ ও কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ, আর আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সমুন্নত হয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই।' *(দারিমী, হাদীস নং ২৬; ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ৫৯৪; ত্বাবারানী, হাদীস নং ৮৯৯৭। এ হাদীসটি ইবনে মাহ্দী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যির্র হতে এবং যির্র আব্দুল্লাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবি ওয়ায়েল হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন।)*

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَكَثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الْعَرْشُ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاَهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ (سنن أبي داود، السنة، باب في الجمعة، ح: ٤٧٢٣ ومسند أحمد : ١/٢٠٦، ٢٠٧)

'তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-ই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, 'আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো' বছরের পথ। এক আকাশের ঘনত্বও [পুরু ও মোটা] পাঁচশ বছরের পথ। সপ্তম আকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ্ তা'আলা এর উপরেই সমুন্নত রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকাণ্ডই তাঁর অজানা নয়।' *(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৩; মুসনাদ আহমাদ, ১/২০৬, ২০৭)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১. ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾-এর তাফসীর।

২. এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের চর্চা রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকারও করত না এবং অপব্যাখ্যাও করত না।

৩. ইহুদী পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বলল, তখন রাসূল ﷺ তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও নাযিল হল।

৪. ইহুদী পণ্ডিত কর্তৃক আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল ﷺ-এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

৫. আল্লাহ তাআলার দু'হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ। আকাশ মণ্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র জমিন তাঁর অপর হাতে নিবদ্ধ থাকবে।

৬. অপর হাতকে বাম হাত বলে নামকরণ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৭. কিয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তিও উল্লেখ।

৮. 'তোমাদের কারও হাতে একটা সরিষা দানার মত' রাসূল ﷺ-এর এ কথার তাৎপর্য।

৯. আকাশমণ্ডলীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১০. কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১. কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২. প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩. সপ্তামাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪. কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫. আরশের অবস্থান পানির উপরে।

১৬. আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপরে।

১৭. আকাশ ও যমীনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮. প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব [পুরো] পাঁচশ বছরের পথ।

১৯. আকশমণ্ডলীর উপর যে সমুদ্র রয়েছে তার উর্দ্ধদেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ।

গ্রন্থখানির মহামতি প্রণেতা মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আত্-তামীমী (রাহি.) অত্র অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এ বইটির ইতি টেনেছেন যা মূলত অতি উত্তম ও মহান পন্থায় সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এ অধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব, তার মর্যাদা, জালালাত এবং তাঁরই মহাশক্তির যে বর্ণনা রয়েছে সে ব্যাপারে যে জ্ঞান লাভ করবে সে মহান রবের একান্ত বিনয়ী ও প্রকৃত আনুগত্যে নিজেকে নিবেদিত করবে। এ বাস্তবতার উপর অনেক প্রমাণাদি এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা, তাঁর এ সব মহৎ ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীই হচ্ছে, তিনি যে একক মা'বূদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।' আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, 'তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা নিরূপণ করতে পারে নি' অর্থাৎ আল্লাহ্ যে মর্যাদা ও বড়ত্বের অধিকারী বান্দা তা তাঁকে দিতে পারে নি অন্যথায় তারা তাঁর ব্যতীরেকে অন্য কারও ইবাদত বা উপাসনা করত না। যখন তুমি তোমার পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় রবের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে তখন জানতে পারবে যে, তিনি মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী আরশের উপর উন্নীত। এ প্রশস্ত ও বিশাল জগতে তাঁরই আদেশ ও নিষেধ বলবৎ রয়েছে, এ জগতে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অফুরন্ত রহমত ও নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। যার থেকে ইচ্ছা বালা-মুসিবত দূর করেন। তিনিই যাবতীয় অনুগ্রহ ও অবদানের মালিক। তুমি জেনে রাখ আকাশ মণ্ডলীতে তাঁরই কর্তৃত্ব এবং আকাশমন্ডলী ফেরেশ্তারাজী তাঁরই ইবাদতে মশগুল ও তাঁরই দিকে তাদের যাবতীয় প্রবণতা। তাঁর বিশাল রাজত্ব আকাশমণ্ডলীতে তাঁর পুরা কর্তৃত্ব বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও তোমার মত এক নগণ্য ও তুচ্ছের প্রতি সম্বোধন করে ইবাদতের আদেশ করেন, এতে কি তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে না? তেমনি তোমাকে তাক্বওয়া অর্জনের হুকুম দেন, যদি তোমার জ্ঞান থাকে তবে তুমি এতে ধন্য। তুমি যদি আল্লাহ্ তা'আলার হক বুঝতে পার এবং তাঁর উচ্চ-গুণাবলীর জ্ঞান হয় তবে তুমি অবশ্যই তাঁর বশ্যতা ও আনুগত্য প্রকাশ না করে থাকতে পারবে না। ফলে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারলে তুমি নিজেকে ধন্য মনে করবে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা চালাবে এবং যখন তুমি তাঁর কালাম তেলওয়াত করবে তখন দেখবে যে মহান আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমার সেই আগের সম্মান, মর্যাদা ও বড়ত্বের ব্যাপারে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। হৃদয়ে ঈমানের দৃঢ়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আল্লাহ্র বড়ত্ব বর্ণনা এবং তাঁর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বিশাল রাজত্ব ও কর্তৃত্বে ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করা। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন।

কিতাবুত তাওহীদ ও এর ব্যাখ্যা

'আন্-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী'র

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের সমাজ থেকে শির্কের মূলোৎপাটনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
- সহীহ্ আক্বীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত বই, প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ করা।
- সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের বিক্ষিপ্ত মেধাগুলোকে একত্রিত করে ইসলামের মূল স্রোত অভিমুখে ধাবিত করা।
- ইসলামকে সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য করে প্রকাশের নিমিত্তে মেধার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আন-নূর ইসলামিক লাইব্রেরী